প্রশাসনে সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব: বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি সমীক্ষা

এম.ফিল. থিসিস

সৈয়দা সোহেলা আফরোজ বেগম

Dhaka University Library
400912

400912

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

২০০৩

M. Phil
~~Ph. D.~~

GIFT

400912

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনে সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব: বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি সমীক্ষা

এম.ফিল. থিসিস

সৈয়দা সোহেলা আফরোজ বেগম

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. এম. নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

400912

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

জুন, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সৈয়দা সোহেলা আফরোজ বেগম কর্তৃক "প্রশাসনে সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব: বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি সমীক্ষা" শীর্ষক এম.ফিল. থিসিসটি আমার তত্ত্বাবধানে সঠিকভাবে প্রস্তুত হয়েছে। এ শিরোনামের উপর থিসিস কোথাও কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত বা প্রকাশিত হয় নি। গবেষণার কাজ সন্তোষজনক।

(অধ্যাপক ড. এম. নজরুল ইসলাম)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

400912

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "প্রশাসনে সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব: বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি সমীক্ষা" শীর্ষক থিসিসটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করে নি। এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ থিসিসটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর বা প্রকাশের জন্যে আমি উপস্থাপন করি নি।

জুন, ২০০৩
ঢাকা

(সৈয়দা সোহেলা আফরোজ বেগম)
এম.ফিল. গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

"সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব" বিষয়ক এম.ফিল. গবেষণা ও এ গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সম্পন্ন এই থিসিসটি রচনায় আমি অনেকের কাছে ঋণী। বিশেষ করে, এম.ফিল. গবেষণা ও থিসিস রচনার কাজ সম্পন্ন করতে যিনি পথিকৃতির ভূমিকা পালন করেছেন তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. এম নজরুল ইসলাম। বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন ও শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমাকে অকৃপণভাবে সময় দিয়েছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক ড. শামসুল হুদা হারুন, অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী, অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান, অধ্যাপক ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গির, অধ্যাপক এম সাইফুল্লাহ ভূইয়াঁ, অধ্যাপক ড. ডালিম চন্দ্র বর্মন, অধ্যাপক নূরুল আমিন বেপারী, অধ্যাপক ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী, ড. মিসেস দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন সহ আরো অনেকের প্রতি, যাদের ক্লাশভিত্তিক মূল্যবান লেকচার ও আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে আমার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে।

উপরি উল্লিখিত আমার শিক্ষকগণ ছাড়াও আমি ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব জনাব মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ, সাবেক সচিব ড. এ এম এম শওকত আলী, সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাম মোহাম্মদ আবুল হোসেন, বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ সরকার, ঢাকা জেলার বর্তমান ডেপুটি কমিশনার জনাব সৈয়দ নকীব মুসলিম, বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত উপসচিব ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিঞা, অর্থ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত উপসচিব জনাব গোলাম মুস্তাকীম সহ আরো অনেককে প্রশাসনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যাদের মূল্যবান মতামত ও উপাত্তের যোগান আমার এই থিসিসটি সম্পন্ন করতে দারুণভাবে সহায়ক হয়েছে।

থিসিসটি রচনা পূর্ববর্তী গবেষণাকর্ম পরিচালন পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলাদেশ সচিবালয় লাইব্রেরি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস এবং বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি। এ সকল লাইব্রেরির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমার থিসিসটি কম্পিউটারে কম্পোজ করে দেয়ার জন্য জনাব মোঃ ওয়াসিমুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার এম.ফিল. গবেষণা ও এই থিসিসটি রচনায় সর্বতোভাবে যিনি আমাকে অনুপ্রেরণা যোগনসহ নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তিনি আমার স্বামী অধ্যাপক ড. সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ। বস্তুত, তাঁর অনুপ্রেরণা ও সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতিরেকে আমার এ গবেষণা ও থিসিস রচনার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর হতো না। এছাড়াও, আমার ছেলে হাসিব আহমেদ, মেয়ে সাজিয়া আহমেদ ও তার স্বামী রিয়াজ হামিদুল্লাহ সহ পরিবারের অন্যান্য সকলেই আমার এ কাজে সবসময় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

উপরি উল্লিখিত সকলের কাছেই আমি ঋণী এবং শ্রদ্ধার সাথে তাদের প্রতি জানাই আমার কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ।

জুন ২০০৩
ঢাকা

সৈয়দা সোহেলা আফরোজ বেগম
এম.ফিল. গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

প্রস্তাবনা ১

প্রথম ভাগ : তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ

প্রথম অধ্যায়
সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (১৬০১-১৯৪৭) ২১

তৃতীয় অধ্যায়
পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস (১৯৪৭-১৯৭১) ৪৬

দ্বিতীয় ভাগ : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

চতুর্থ অধ্যায়
রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো ৬৩

পঞ্চম অধ্যায়
সিভিল সার্ভিস: সংস্কার পরবর্তী কাঠামো ও সমস্যাবলী ৭৪

ষষ্ঠ অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশমালা ১০১

তৃতীয় ভাগ : পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট 'ক'
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসনিক : প্রশাসনিক)
এসোসিয়েশন কর্তৃক ১৯৮১ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে
পেশকৃত স্মারকলিপি ১১১

পরিশিষ্ট 'খ'
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস সমন্বিত কমিটি কর্তৃক
১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে পেশকৃত স্মারকলিপি ১২৫

পরিশিষ্ট 'গ'
সিনিয়র সার্ভিসেস পুলের কাঠামো পর্যালোচনা ও বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস
পদোন্নতির অপ্রতুল প্রত্যাশার সমাধান সম্পর্কিত ১৯৮৯ সালের জুন
মাসে সরকারের কাছে পেশকৃত মতিন কমিটির সুপারিশমালা ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট 'ঘ'

১৯৯১ সালের ১৪ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর নিকট
বিসিএস সমন্বয় কমিটি কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশমালা ১৩৮

চতুর্থ ভাগ : নির্বাচিত গ্রন্থ, রাচনা ও সরকারি প্রকাশনা ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

উন্নয়নশীল দেশসমূহে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম সাফল্যমণ্ডিত করার পূর্বশর্ত হচ্ছে - প্রতিটি দেশে একটি সুসংগঠিত সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থার অবস্থান। এই সিভিল সার্ভিস কাঠামোতে দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে সতত দেশের উন্নয়ন কর্যক্রমে সম্পৃক্ত হবে। কিন্তু, একথা জোর দিয়ে বলা চলে না যে, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে তার ঈপ্সিত উন্নয়ন ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সুগঠিত একটি জাতীয় সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হয়েছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পেশাগতভাবে সম্পৃক্ত সাধারণজ্ঞ (Generalist) ও বিশেষজ্ঞ (Specialist) কর্মকর্তাগণ তাদের স্ব স্ব গোষ্ঠি স্বার্থ উদ্ধারে এক নিরবচ্ছিন্ন আন্তঃদ্বন্দ্বে লিপ্ত রয়েছে। মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এই আন্তঃক্যাডার দ্বন্দ্বের ফলে বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

স্বাধীনতা উত্তর সরকারগুলি বিভিন্ন সময়ে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে কমিশন ও কমিটি গঠন করে আসছে। বিশেষ করে, সিভিল সার্ভিসের আন্তঃক্যাডার দ্বন্দ্ব অবসানই ছিল এইসব সংস্কার প্রচেষ্টার মোক্ষম উদ্দেশ্য। সিভিল সার্ভিসের উচচতর পর্যায়ে সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১৯৭৯ সালে সিনিয়র সার্ভিসেস পুল বা এসএসপি নামে একটি উচচতম সার্ভিস ক্যাডার গঠন করা হয়। অতপর ১৯৮১ সালে দেশের সার্বিক সার্ভিস কাঠামোকে পূনর্গঠিত করে নির্দিষ্ট কয়েকটি কার্যক্রম ক্ষেত্র (functional areas) ভিত্তিক ২৮টি ক্যাডার সমন্বয়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বা বিসিএস প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু এতসব সংস্কারের পরেও সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে নাই। উপরন্ত, এসএসপিতে সাধারণজ্ঞদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে আত্মীয়করণের ফলে প্রশাসনের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অর্থাৎ সচিবালয়ে সাধরাণজ্ঞদের গতানুগতিক আধিপত্যের কমতির কোন লক্ষণই পরিলক্ষিত হয় নাই। এর ফলশ্রুতিতে বিশেষজ্ঞরা দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। পরে, ১৯৮৯ সালে সরকারিভাবে এসএসপি ব্যবস্থাটির অবিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। ফলে প্রশাসনের উচচতর পর্যায়ে কর্মকর্তা নিয়োগের সমস্যাটি থেকেই যায়। বিশেষ করে, প্রশাসনের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ ও পদোন্নতি আবারও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

এহেন পরিস্থিতিতে তাই দেখা যায়ে যে, বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সময়ে কর্ম-বিরতিসহ নানান প্রতিবাদী কর্মসূচী গ্রহণ করে আসছে। অপরপক্ষে, সরকারও একের পর এক কমিশন ও কমিটি গঠন করে চলেছে। কিন্তু এ যাবৎ এই আন্তঃক্যাডার দ্বন্দ্বের অবসানের কোন লক্ষণই দেখা যাচেছ না। তবে স্বীকার করতেই হবে যে, এই দ্বন্দ্বের অবসান না হওয়ার কারণে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দারুণভাবে ব্যাহত হচেছ। দাতা দেশসমূহও এই

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যার আশু সমাধানের জন্য সরকারের উপর অনবরত চাপ সৃষ্টি করছে বলে শোনা যাচ্ছে। সুতরাং বাংলাদেশের প্রশাসনে স্বাধীনতাপূর্ব সময় থেকে বহাল সাধরণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্বকে নিঃসন্দেহে একটি জটিলতম সমস্যারূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

এই উপলব্ধি হতেই বর্তমান থিসিসটির লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে এম.ফিল কোর্সে ভর্তির শর্ত পূরণের অংশ হিসেবে পেশকৃত গবেষণা প্রস্তাবে 'সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব' সম্পর্কিত সমস্যাটি গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করে। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত, ধরন ও এর অন্তর্নিহিত কারণসমূহ অনুসন্ধান করা। এরই প্রেক্ষিতে গবেষক তার নির্বাচিত বিষয় ভিত্তিক গবেষণা কর্মটিকে ঈপ্সিত গবেষণা লক্ষ্য অর্জন প্রয়াসে নির্দিষ্ট চারটি অনুসন্ধান ক্ষেত্রে বিন্যস্ত করে। প্রথমত, দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে (১৭৫৭-১৯৪৭) ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বা আইসিএস এবং অন্যান্য সার্ভিস ক্যাডারসমূহের উৎপত্তি ও আন্তঃক্যাডার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত সম্পর্কে ধারণালাভসহ প্রাসঙ্গিক উপাত্ত সংগ্রহ। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১) সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা, আইসিএস-এর উত্তরসূরি সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান বা সিএসপি ক্যাডারের আইনগত ভিত্তি, আন্তঃক্যাডার দ্বন্দ্বের ধরন ও প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে কেতাবি অনুশীলনসহ প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত আহরণ। তৃতীয়ত, স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্বের অবসান লক্ষ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থার কাঠামোগত সংস্কার ও ফলাফল অনুশীলনসহ প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির অনুসন্ধান। চতুর্থত, সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা এবং দ্বন্দ্বের সাথে সম্পৃক্ত চাকুরি সংগঠনসমূহের (Service Association) মতামত সংগ্রহের জন্য জরিপ পরিচালন।

উপরি উল্লিখিত পরিকল্পনা অনুযায়ীই গবেষণা কর্মটি শেষ পর্যন্ত সমপন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত দুইটি গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমত, সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ এবং ব্রিটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এই দ্বন্দ্বের উৎপত্তিসহ এর প্রকৃতি, ধরন ও বিস্তার সম্পর্কিত সরকারি প্রকাশনা, মৌলিক গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক রচনা ও পুস্তকাদি অধ্যয়ন (Literature Review) করা হয়। দ্বিতীয়ত, এই দ্বন্দ্বের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা (Empirical Study) পরিচালনা করা হয়। এই পর্যায়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর কর্মচারী সংগঠনের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও দেশের নীতি নির্ধারণী কর্তাব্যক্তিসহ এই বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের মতামত সংগ্রহেরও চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পন্ন থিসিসটিতে উপস্থাপিত পূর্বাপর আলোচনা দুইটি প্রধান ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম ভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তিনটি অধ্যায়। প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায়ে মূলত সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব বিষয়ক বিশ্লেষণমূলক তাত্ত্বিক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগ পূর্ব উপমহাদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পনির শাসনামলে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বা আইসিএস-এর উৎপত্তি, বিকাশ, আইসিএসদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, সিপাহি বিদ্রোহ উত্তর ব্রিটিশ রাজ আমলে আইসিএস-এর ভারতীয়করণ, প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস প্রবর্তণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রায় পুরোটা জুড়েই আইসিএসদের প্রসঙ্গ প্রধান্য পেয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মূলত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো ও এ কাঠামো অন্তর্গত সাধারণজ্ঞ সিভিল সার্ভিস ক্যাডার বা Civil Service of Pakistan (সিএসপি) সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে আইসিএসদের উত্তরসূরি সিএসপিদের ক্ষমতা, দায়িত্বাবলী ও অবস্থান সম্পর্কিত প্রসঙ্গগুলিই এ অধ্যায়ের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

থিসিসের দ্বিতীয়ভাগের আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশ সম্পর্কিত। এই ভাগে তিনটি পৃথক অধ্যায় রয়েছে, যথা চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম অধ্যায় ও ষষ্ঠ অধ্যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক বা স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত সরকারি প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রশাসনযন্ত্রের বিভিন্নদিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নতুন সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে, এ অধ্যায়ে ১৯৭৬ সালে গঠিত সার্ভিসেস ও বেতন কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সালে সিনিয়র সার্ভিসেস পুল (এসএসপি) ও ১৯৮১ সালে একীভূত "বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস" ব্যবস্থা প্রবর্তণ এবং ১৯৮৯ সালে এসএসপি-এর বিলুপ্তি ও তৎপরবর্তী উদ্ভূত সমস্যাবলী সম্পর্কিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। সবশেষে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে থিসেসটির পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে অনুশীলনকৃত বিষয়াবলীর মূল প্রসঙ্গগুলি পূনরাবৃত্তিসহ সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সমস্যাটি সমাধানকল্পে লেখক নিজেস্ব কিছু মতামত ও সুপারিশ পেশ করতে প্রয়াসী হয়েছে।

উল্লিখিত অধ্যায়গুলি ছাড়াও থিসিসের শেষ পর্বে চারটি পৃথক পরিশিষ্ট ও নির্বাচিত পুস্তক, রচনা ও সরকারি প্রকাশনাসমূহের একটি তালিকাও সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতিটি অধ্যায়ের শেষ অংশের ঠিক পরেই তথ্যনির্দেশও সংযোজন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম ভাগ

তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ভূমিকা

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড ও এর দৈনন্দিন প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংগঠনের প্রয়োজন অপরিহার্য। ক্ষুদ্র হোক বৃহৎ হোক যে কোন কাঠামোতে সংঘবদ্ধ কোন গোষ্ঠীর কার্যাবলী সম্পন্ন করার একমাত্র মাধ্যম হলো সংগঠন। যুক্তিসঙ্গত ও সুপরিকল্পিত এইরূপ গোষ্ঠীগত কার্য-প্রক্রিয়ার রূপান্তর ঘটে সাংগঠনিক কাঠামোতে। এই সাংগঠনিক কাঠামো এমনই একটি ব্যবস্থা যেখানে কম বা অধিক সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত থাকেন। বৃহৎ সংগঠনে নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর না হলেও সম্মিলিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন লক্ষ্যে সচেতনভাবে এদের কর্তৃত্ব আদেশ পারস্পারিক কর্মরত সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। সংগঠনের কাঠামো ও কার্যক্রম সম্পর্কিত কয়েকটি আবশ্যক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে এ সম্পর্কে আরো সচ্ছ ধারণা লাভ করা যেতে পারে। যেমন, (ক) সংগঠনের এক বা একাধিক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে; (খ) এর উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যাবলী যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত; (গ) উদ্দেশ্য/উদ্দেশ্যাবলী অর্জন লক্ষ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ স্থাপন ও কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা অর্জন; (ঘ) সংগঠনের সদস্যবর্গের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন; (ঙ) সংগঠনের উদ্দেশ্য/উদ্দেশ্যাবলী ও কার্যপদ্ধতি জটিল; ও (চ) সংগঠনের প্রয়োজন সর্বকালের এবং এর অবস্থান সার্বজনীন[১]।

John D. Millett রাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার নির্বাহী বিভাগভুক্ত অঙ্গ-সংগঠন লোক প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টিকারী তিন ধরনের উপাদান চিহ্নিতকরণে প্রয়াসী হয়েছেন। এই তিন ধরনের উপাদনগুলো হচ্ছে: (ক) Political বা রাজনৈতিক; (খ) Technical বা প্রায়োগিক; এবং (গ) Personal বা ব্যক্তিগত। লোক প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামোর রূপরেখা কি ধরনের হবে এই বিষয়টি অবশ্যই নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের ধ্যাণ-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও গৃহীত নীতির আলোকে। শাসন বিভাগ, আইন সভা, নাগরিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর (Interest Groups) সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা ও প্রভাবে নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের কাঠামো, অবস্থান ও বিশেষায়িত কর্মকাণ্ডের ধরণ। এই প্রসঙ্গে Millett-এর বক্তব্য হচ্ছে: "The organizational pattern of public agencies provides a basis of work

Dhaka University Institutional Repository

specialization and structural status acceptable to the legislature, the executive, interest groups, and the citizenry at large"[২]। দ্বিতীয়ত, ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষাপটে অধুনা লোক প্রশাসন সংস্থাসমূহকে এমন অনেক জটিল কর্ম সম্পাদন করতে হয় যে জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি, সেবার মানোন্নয়ন ও উন্নতর কারিগরি নৈপূণ্য প্রদর্শন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সংস্থাসমূহের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ এক ধরনের রক্ষণশীল মনমানসিকতার বশবর্তী হয়ে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক সংস্কার সাধনে আগ্রহী হয় না। যদিও সংস্থাসমূহের বাইরে অবস্থানকারী সমালোচকসহ অনেকেই কর্মরত ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাঠামো ও কার্যগত সংস্কার সাধনের জন্য ক্রমাগতভাবে আহবান জানান। তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিই হচ্ছে সংগঠন এবং প্রায় প্রতিটি সংগঠনেই স্বাভাবিক ধারায় ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টিতে হয় এক সামাজিক পরিবেশ। প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে তার নিজস্ব আবেগ-অনুভূতি, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা-চেতনা। এমন ভাবা নিতান্তই যুক্তিহীন যে সংগঠনে কর্তৃত্ব-আদেশে ব্যক্তিবর্গ যন্ত্রের মত কাজ করে যাবে। অতএব, প্রতিটি সংগঠনের কাঠামোগত মর্যাদা, কর্মকাণ্ডের ধরণ ও সেবার মান কর্মরত ব্যক্তিবর্গের ইচ্ছা, চিন্তা ও ধ্যাণধরণা দ্বারা প্রভাবিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। Millett-এর এ সম্পর্কিত প্রাসংঙ্গিক আলোচনার নিম্নোক্ত উদ্ধৃত অংশটি উল্লেখ্য:

> ..... organizational structure is influenced by the reaction of those who comprise its components. Organization is people working together. Organization is a social environment. It is accordingly a structure of anticipated individual behaviour. But the individual is not an automation, to be manipulated at will by some higher authority. He has his own aspiration, ideas, and emotion. As such, he is much concerned in arrangements, since those may vitally influence his own life and interpersonal relationships.[৩]

সংগঠন সম্পর্কে চলমান ধারণা

Classical বা সনাতন সংগঠনতত্ত্ববাদীদের মত অনুসারে সংগঠন বলতে ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ, কর্মের বিভক্তিকরণ ও কার্যবিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্মিলিত কার্য-সম্পাদন পদসোপান (Hierarchy) নীতি অনুযায়ী একটি যুক্তিসংগত ও পরিকল্পিত কাঠামো ও কর্মব্যবস্থাপনাকে বুঝায়। অন্যকথায় সংগঠন হচ্ছে স্বতন্ত্র কার্য

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগগুলোকে সুসংবদ্ধভাবে একটি সমন্বিত একক কাজে একত্র করার প্রক্রিয়া বিশেষ। সনাতন মতবাদ অনুযায়ী সংগঠনের অর্থ হচ্ছে কাঠামোগত বিন্যাস। একটি সামগ্রিক কাজকে বিভিন্ন এককে (unit) ভাগ করা এবং এককভুক্ত কাজের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই এককের কার্যসম্পাদনকে সমন্বিত করাই এই কাঠামোতগত বিন্যাসের উদ্দেশ্য। প্রাথমিক পর্যায়ে সংগঠনতত্ত্ববাদীদের ব্যাখ্যাত সংগঠনকে 'যান্ত্রিক' ও 'কারিগরি' প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে প্রশাসনিক সংগঠনকে মনস্তত্ত্ববিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ববিদ্যা, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি, অংকশাস্ত্র ও জীববিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের সূচনা হয় এবং ইতোমধ্যেই এ সম্পর্কে অনেক গবেষণালব্ধ পুস্তক রচিত হয়েছে। এগুলো ব্যবহারিক, যোগাযোগ, দলীয় ও সিদ্ধান্ত তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই মতবাদগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। (১) যান্ত্রিক অথবা গঠনগত (২) মানবিক ও সামাজিক মনোবিজ্ঞানতত্ত্ব।[৪]

গঠন ও প্রকৃতগত দিক থেকে সনাতান সংগঠন মতবাদ ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। কেননা, এর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে আদেশ কাঠামো; কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। এই মতবাদ অনুযায়ী অধীনস্থ কর্মচারীদের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র হিসেবে মনে করা হত। উপরিউক্ত তত্ত্ব দুটি মূলত মৌলিক অনুমানের (Assumption) উপর নির্ভরশীল। এই অনুমান হলো (১) কতকগুলো বৈজ্ঞানিক নীতিদ্বারা সংগঠনের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করা, এবং (২) পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ।[৫]

বিংশ শতাব্দীর তিন দশকের মাঝামাঝি সময়ে জেনারেল মটরস কোম্পানীতে কর্মরত দু'জন নির্বাহী কর্মকর্তা জেমস্ ডি. মুনি (James D. Mooney) ও এলেন সি. রেলী (Alan C. Reiley) তাঁদের ব্যাখ্যাত সংগঠনতত্ত্বে চারটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন নীতির প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। এই নীতিগুলো হলো: (ক) সমন্বিত নীতি, (খ) পদসোপান নীতি, (গ) বৃত্তীয় নীতি, এবং (ঘ) নির্দেশক ও উপদেষ্টা বিভাগ।[৬] এই নীতি চারটি সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

(ক) সমন্বিত নীতি (Coordinative Principle): সংগঠনের প্রথম ও সর্বজনীন নীতি হিসেবে স্বীকৃত 'সমন্বিত নীতি' সংগঠনের মৌল লক্ষ্য অর্জনে কর্মের ঐক্য সাধান ঘটায়। সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের চাহিদা পূরণে এ নীতি সহায়ক হয়। কিন্তু শুধুমাত্র কর্তৃত্বভিত্তিক (Authority-based) পদের বিন্যাসই সংগঠনে সামগ্রিক সংযোগ সাধন যথেষ্ট নয়। বরং সাংগঠনিক দর্শন, চেতনা ও নৈতিকতা বোধের সফল সম্মিলনই ফলপ্রসূ সংযোগ সাধনে সক্ষম।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) পদসোপান নীতি (Scalar Principle): পদসোপান নীতি বলতে বুঝায় মূলতঃ সংগঠনের বিভিন্ন স্তর ভিত্তিক পদের মধ্যে কর্তৃত্বের (Authority) সুষম বন্টন (যাকে আমাদের পরিভাষায় 'কর্মপিরামিড' হিসেবেও অভিহিত করা যেতে পারে)। এই নীতির প্রক্রিয়াগত অনুষঙ্গগুলো হলো: (১) নেতৃত্ব, (২) কর্তৃত্বসহ কর্মদায়িত্ব বন্টন, এবং (৩) কার্যক্রম সুনির্দিষ্টকরণ। প্রকৃত অর্থে পদসোপান নীতি বলতে বুঝায় উচচ পর্যায় থেকে ক্রমধারায় নিম্নপর্যায়ে সংগঠনে কর্তৃত্বের বিভাজন এবং সংগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে/অংশে সুনির্দিষ্টভাবে কাজ বা দায়িত্ব ঠিক করা। এ বিবেচনায় পদসোপান নীতি বৃত্তীয় নীতি (Functional Principle) থেকে ভিন্ন।

(গ) বৃত্তীয় নীতি (Functional Priniciple): বৃত্তীয় নীতি বলতে প্রকৃত অর্থে বুঝায় "কাজের বিশেষায়িতকরণ"। একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই নীতিকে পরিষ্কারভাবে বুঝানো যেতে পারে। যেমন, সামরিক বাহিনীতে 'জেনারেল' এবং 'কর্নেল'দের কর্তৃত্বগতভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। যার জন্য এ দু'টি পদ দু'টি স্তরে কর্তৃত্ব বিভাজনকে নির্দেশ করছে। তাই কার্যক্রমগতভাবে বিভাজিত একজন 'ইনফ্যান্ট্রি' অফিসার এবং একজন 'আর্টিলারী' অফিসারের কাজ ভিন্ন প্রকৃতির। কারণ সামরিক বাহিনীতে এ দু'টি শ্রেণীর পদের বিভক্তিকরণের ক্ষেত্রে একটি নির্দেশ করে কর্তৃত্বগত পদসোপান এবং অন্যটি নির্দেশ করে ভিন্নতর কর্মের বিন্যাস।

(ঘ) নির্দেশক ও উপদেষ্টা কর্মকর্তা (Line and Staff): ইংরেজি শব্দ Line বলতে সাধরণতঃ সংগঠনে শীর্ষপদে কর্মরত কর্মকর্তাদেরকে বুঝায় যারা সংগঠনের কর্তৃত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অধঃস্তনদের বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদানসহ সংগঠনের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়ন লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরাসরি ভূমিকা রাখেন। পক্ষান্তরে, উর্ধ্বতন নির্দেশক কর্মকর্তাদেরকে নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য Staff বা উপদেষ্টা কর্মকর্তাদের আবির্ভাব। বিশেষ জ্ঞান ও বিশেষায়িত দক্ষতার ভিত্তিতেই উপদেষ্টাদের নিয়োগ করা হয়। তবে সংগঠনকে পাশাপাশি দু'টি সংগতিহীন ধারার অংশে বিভক্ত করাটা সমীচীন হবে না। নির্দেশক ও উপদেষ্টা কর্মকর্তাদের সমন্বিত ঐকবদ্ধ প্রয়াসেই সংগঠনের উদ্দেশ্যাবলীর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব।[৭]

চলমান সংগঠন মতবাদ অনুযায়ী সকল সংগঠনই 'শ্রম বিভাজন' নীতি দ্বারা পরিচালিত এবং এই নীতির সঙ্গে পদসোপান নীতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। শ্রম বিভাজান নীতি অনুসারে সকল সংগঠনেই দুটি অংশের অস্তিত্ব বিরাজমান। এ অংশ দু'টি হচেছ নির্দেশক একক ও উপদেষ্টা একক (unit)। নির্দেশক অংশে পদসোপান নীতি অনুসারে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত সবাই একজন প্রধান কর্যনির্বাহীর নিয়ন্ত্রণে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। অন্যদিকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি প্রণয়ন বিষয়ে সাহায্য করার জন্য উপদেষ্টা এককের সৃষ্টি। বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতেই উপদেষ্টাদের নিয়োগ করা হয়। এই নীতি অনুসারে প্রশাসনিক ও বৃত্তিগত কার্যবলীকে বিভিন্ন ধরণের সাংগঠনিক একক, যেমন 'মন্ত্রণালয়', 'বোর্ড' বা 'কমিশন' কাঠামোতে বিভক্ত করা হয়। এ ধরণের প্রত্যেকটি সংস্থার নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্যও বিশেষ ধরণের লোক নিয়োজিত রয়েছে। প্রায়োগিক সভ্যতার ক্রমবর্ধমান উন্নতি, যন্ত্রের উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং সামাজিক ব্যবস্থায় বিবর্তনের ফলে শ্রম বন্টন নীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বিশেষায়িত নৈপূণ্য শুধু আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ও ব্যবহারের জন্যই বিকাশ লাভ করে নাই। পক্ষান্তরে জটিল ও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত নীতিসমূহের উদ্ভাবন ও এদের প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেও এরূপ নৈপূণের স্ফুরণ হয়েছে। কারণ বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগে নানারকম প্রযুক্তিগত শিক্ষণীয় বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে। যেমন প্রকৌশল, ঔষধ, রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, আইন শিক্ষা, নৌ বিভাগ ইত্যাদি। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানান পেশা। এইরূপ পেশাসমূহের উৎকৃষ্টতা তাই একান্তভাবে নির্ভর করে জ্ঞান ও নৈপূণের যৌথ সমন্বয়ের মধ্যে।[৮]

নির্দেশক ও উপদেষ্টা কর্মকর্তা

রাষ্ট্র বা তদন্তর্ভুত সংগঠনের মৌলিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাথমিক বা মৌলিক বিভাগের প্রয়োজন হয়। যে কোন প্রশাসন ব্যবস্থায় সাংগঠনিক উপাদান হলো প্রাথমিক বিভাগসমূহ। কিন্তু সময়ের সাথে দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিভাগের পক্ষে সকল প্রকার দায়িত্ব পালন সম্ভব হয়ে উঠছে না। বিশেষ করে বিশেষীকরণ, অর্থনৈতিক মিতব্যয়িতা, বৃহদাকার ও জটিল সংগঠনের প্রয়োজনে সহায়ক বা উপদেষ্টা বিভাগের সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রথমিক বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত যাকে নির্দেশক কর্মকর্তা এবং সহায়ক/উপদেষ্টা বিভাগের দায়িত্বে থাকে উপদেষ্টা কর্মকর্তা।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় পদসোপানের শীর্ষ স্তরে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাকে নির্দেশক কর্মকর্তা বা সাধারণজ্ঞ বলা হয়ে থাকে। সাধারণজ্ঞ এই শীর্ষ কর্মকর্তার অধিনস্থ পদসোপানের নিম্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদেরকেও সাধারণজ্ঞ বলা হয়। 'নির্দেশক' বলতে কর্তৃত্বকে বোঝায়। এই প্রসংঙ্গে Pfiffner ও Sherwood বলেন: "The line activitities are those associated with order-giving in the line of command, on the on hand, and with direct labor or production work on the other"[৯]। অন্যদিকে উপদেষ্টা কর্মচারীদিগকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (১) সাধারণ উপদেষ্টা কর্মচারী

Dhaka University Institutional Repository

(General staff), (২) প্রায়োগিক কর্মচারী (Technical staff) এবং (৩) সমন্বয়কারী ও সহায়ক কর্মচারী (Coordinating and auxilliary staff)।[১০] উপদেষ্টা কর্মচারীদের শ্রেণীকরণ সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

সাধারণ উপদেষ্টা কর্মচারী ঃ সংগঠনের প্রধান কার্যনির্বাহী ও উর্ধ্বতন নির্দেশক কর্মকর্তাকে এরা নীতি নির্ধারণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কার্যের মাধ্যমে সাহায্য করে থাকেন।

প্রায়োগিক কর্মচারী ঃ এরা শুধু প্রায়োগিক বিষয়েই নির্বাহীকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। প্রধান কার্যনির্বাহী তাঁর অধীনে কিছুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ যেমন প্রকৌশলী, বৈজ্ঞানিক, পরিসংখ্যানবিদ ও অর্থনীতিবিদ নিয়োগ করেন এবং এরা নিজ নিজ বিষয়ে প্রধান নির্বাহীকে উপদেশ দেন বা তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত পেশ করেন। এদের কাজের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় যেমন - (ক) সংগঠনের বিভিন্ন এককের উপর এদের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। এরা শুধু উপদেশ দেন কিন্তু কোন নির্দেশ দিতে পারেন না। (খ) এরা নিজ নিজ প্রায়োগিক বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

সমন্বয়কারী ও সহায়ক কর্মচারী ঃ এরা বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমন্বয়ের লক্ষে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালনসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করেন।[১১]

উপরিউক্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে ২নং শ্রেণী অর্থাৎ প্রায়োগিক কর্মচারীদিগকেই বিশেষজ্ঞ হিসাবে অভিহিত করা হয়।

সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ কার্যাবলী

প্রশাসনে কেন্দ্রীয় পদসোপান সাধরণজ্ঞ বা নির্দেশক কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত হয়। সাধারণজ্ঞ 'রাজনৈতিক' ও 'প্রশাসানিক' দুই পর্যায়েই থাকতে পারেন। প্রথম পর্যায়ে থাকেন মন্ত্রী, সচিব ও বিভাগীয় প্রধান। এরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাহচার্যে দায়িত্ব পালন করেন। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থায়ী অন্যান্য সরকারী কর্মচারীগণ যারা মধ্যস্তরীয় ব্যবস্থাপনা কার্যে নিয়োজিত থাকেন তাদেরকে বুঝায়। হোয়াইটের (L.D. White) মতে সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আইন ও রাষ্ট্রীয় নীতসমূহের বাস্তবায়ন। এছাড়াও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, দায়িত্ব গ্রহণ, নীতির ব্যাখ্যা ও কার্যকরণ, পরিকল্পনা গ্রহণ, উৎপাদন ও দক্ষতা অর্জন ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে থাকেন। প্রশাসনিক স্তরে সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তাগণ ক্ষমতাসীন

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক নেতা কর্তৃক অনুমোদিত নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করেন। হোয়াইট নির্দিষ্টভাবে এদের পাঁচ ধরণের কাজের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন - মন্ত্রীদের উপদেশ প্রদান, কর্মসূচী প্রণয়ন, উৎপাদন, সংগঠন ও কার্যপদ্ধতি বিশ্লেষণ, এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।[১২]

হোয়াইট সংগঠনে একজন উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তার কাজ বলতে পরিকল্পনা গ্রহণ, উপদেশ প্রদান এবং সাধরণজ্ঞ বা নির্দেশক কর্মকর্তাকে সর্বোতভাবে সাহায্য প্রদানকে বুঝিয়েছেন। প্রশাসনে বিশেষজ্ঞদের কাজ হলো ঘটনা বিশ্লেষণ, প্রশাসনিক সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা, সমস্যা সমাধানে কার্য পদক্ষেপের বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থার আপেক্ষিক সুবিধা, অসুবিধা নির্ণয়, সুপারিশ প্রণয়ন ও নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের সন্ধান করা।[১৩] Pfiffner ও Sherwood একজন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তার নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজের কথা কথা উল্লেখ করেছেন: (১) সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তাকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান; (২) সমন্বয় সাধান; (৩) ঘটনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ; (৪) বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন; (৫) কর্তৃত্বের কোনরূপ অবমাননা না ঘটিয়ে সর্বোতভাবে সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তাকে সাহায্য এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে থেকে কার্যসম্পাদন করা; এবং (৬) সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তা কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা মোতাবেক দায়িত্ব পালন করা।[১৪]

অধ্যাপক এফ এফ রিড্‌লে (F.F. Ridley) ইংল্যান্ডের চলমান প্রশাসনিক কাঠামোর আলোকে উপস্থাপিত সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের কার্যাবলীর তুলনামূলক এক বিশ্লেষণে উল্লেখ করেন যে, মন্ত্রীগণকে পরামর্শ দান, প্রশাসনিক নীতিসমূহ প্রণয়ন এবং প্রশাসন যন্ত্রের উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণসহ সরকারী বিভাগসমূহের আর্থিক লেনদেন তত্ত্বাবধান ইত্যাদি সাধরণজ্ঞ কর্মকতার দায়িত্বলীর প্রধান অংশ। অপরপক্ষে, সাধরণজ্ঞ কর্মকর্তার আর্থিক ও প্রশাসনিক সার্বিক নিয়ন্ত্রণাধীনে কর্মরত অবস্থায় সাধারণজ্ঞকে নীতি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানসহ সরকারী সেবামূলক সংস্থাসমূহের বিশেষজ্ঞ অংশের দায়িত্বলী সুসম্পন্ন করাই হচেছ বিশেষজ্ঞদের দায়িত্বাবলী। এক্ষেত্রে অধ্যাপক রিড্‌লের প্রাসংগিক আলোচনার উদ্ধৃত অংশটি উল্লেখ করা যেতে পারে:

> To the generalist is assigned responsibility for advising Ministers, the formulation of administrative policy, control of the governmental machine and, of great importance, financial control. The role of the professional is to carry out the work of the various specialist branches of the service, under the ultimate financial and

Dhaka University Institutional Repository

administrative control of the generalist, and to advise the generalist on policy matters.[১৫]

সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের পরিধি

সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তা সংগঠনে এর উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যবলী বাস্তবায়নে সার্বিকভাবে দায়িত্বে থাকেন। তিনি একচেটিয়া আদেশ ও কর্তৃত্বের অধিকারী। বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তাকে এইরূপ উদ্দেশ্য/উদ্দেশ্যবলী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় উপদেশ ও সুপারিশ পেশের মাধ্যম সহায়তা করেন। সেনা বাহিনীতে এ দুইয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রশাসন বিষয়ে লেখকগণ সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সম্পর্ক কেবল সংগঠনের আনুষ্ঠানিক (formal) বিষয় হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অধুনা প্রশাসন পণ্ডিতগণ সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যেকার সম্পর্ক সনাতন নিয়মে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী নন। প্রশাসনবিদ ডিমক (Marshall E. Dimock) কর্তৃত্বকে আদেশের পরিবর্তে 'প্রভাব' বলে গণ্য করেন। তবে সাম্প্রতিককালে এই ধারণাটি পূর্বের মত সর্বাত্মক নয়। বর্তমানে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে সাধারণজ্ঞ-বিশেষজ্ঞ আন্তঃ সহযোগীতা ও দলভিত্তিক মনোভাবের উপর।

সকল প্রশাসনিক স্তরেই আজ নির্দেশক ও উপদেষ্টামূলক কাজের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অধিকতর শ্রমবিভাজন ও বিশেষীকরণের ফলে প্রশাসনে বিশেষজ্ঞের কাজ একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে এবং এর ফলে তারা এমন অনেক কাজ করছেন যা একচেটিয়াভাবে সাধারণজ্ঞের এখতিয়ারভুক্ত ছিল। এরা শুধু উপদেশই প্রদান করছেন না, অনেক ক্ষেত্রে নির্দেশনার কাজও করছেন। বাস্তবে অনেক প্রশাসনিক বিষয়ে এরূপ দুইয়ের সংমিশ্রণ দেখা দিয়েছে এবং এ নিয়ে সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছে।

আধুনিক সংগঠনের আয়তন ও জটিলতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির ফলে উপদেষ্টামূলক কাজেরও বিস্তৃতি ঘটেছে। উপদেষ্টারা শুধুই যে উপদেশ দিয়ে কার্যনির্বাহীকে সন্তুষ্ট রাখছেন বা তথ্য বা ঘটনা সংগ্রহ অথবা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত থেকে সাধারণজ্ঞকে সাহায্য করছেন তা নয়। এরা অধুনা সাধারণজ্ঞের ভূমিকাও পালন করছেন। কেননা, একটি সংগঠনে একজন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন সময়ে সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রাণালয়ের সচিবকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে উপদেষ্টা কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। আবার তার অধিদপ্তরের কাজের ক্ষেত্রে নির্দেশক কর্মকর্তা বা সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এবং এইরূপ

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা পালনে তিনি তার অধিনস্থদেরকে নির্দেশক কর্মকর্তা হিসাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। এইরূপ দ্বৈত ভূমিকা পালনের কথা সাধারণজ্ঞদের ক্ষেত্রেও বলা যায়। যেমন, মন্ত্রণালয়ের সচিব যখন তার মন্ত্রীকে সিদ্ধান্ত প্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন তখন তিনি একজন উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। আবার সচিব যখন তার অধিনস্থদের মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ করেন তখন তিনি একজন সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তা।

বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাকে সাধরণজ্ঞ কর্মকর্তা অনেক সময় সন্দেহের চোখে দেখেন এই ভেবে যে, বিশেষজ্ঞ তাদের ক্ষতি করতে পারেন। এরা নিজেদের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে নির্দেশক কর্মকর্তার কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করার প্রবণতা দেখান। বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রণীত কোন পরিকল্পনা সাধারণজ্ঞ কর্তৃক বাস্তবায়ন কালে ব্যর্থ হলে বিশেষজ্ঞ সে দোষ সাধারণজ্ঞ-এর উপর চাপিয়ে দেন। অপরদিকে, সাধারণজ্ঞ মনে করেন যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি বর্জিত বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা কর্তৃক এরূপ পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে এবং তা বাস্তব সমস্যার আলোকে প্রণীত হয় নি বলেই তা সফল হয় নি।

প্রকল্প নির্মাণ, পরিকল্পনা গ্রহণ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের কাজ। তথাপি এরা আসল সমস্যা বা বাস্তবতা থেকে দূরে থাকেন। তাই সাধারনজ্ঞ মনে করেন সামগ্রিক পরিকল্পনার দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দেয়া কোনভাবেই সঙ্গত নয়। কেননা, সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তা পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদী তাৎপর্য, প্রতিক্রিয়া ও ভুল-ত্রুটি সহজেই ধরিয়ে দিতে পারেন, বিশেষজ্ঞগণ তা সহজে পারেন না।[১৬]

সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব

দ্বন্দ্ব একটি সামজিক ও মনস্তাত্বিক সংঘাত পরবর্তী ঘটনা। যখন কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আচরণ করতে সমর্থ হয় না তখনই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ হলে অথবা একই সঙ্গে দুটি কাজ সম্পন্ন করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা করা যাচ্ছে না - এরূপ পরিস্থিতিতেও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্বের ধরণ বিভিন্ন প্রকার। যেমন, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, সাংগঠনিক দ্বন্দ্ব ও আন্তঃ সাংগঠনিক দ্বন্দ্ব। সাংগঠনিক দ্বন্দ্বকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, (ক) আভ্যন্তরীণ ও (খ) বাহ্যিক দ্বন্দ্ব। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দুটি কারণে সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত, আনুষ্ঠানিক সংগঠনে কাঠামোগত সমস্যাকে কেন্দ্র করে; দিতীয়ত, সমন্বয় ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করে। এছাড়া ব্যক্তি উদ্দেশ্য বনাম সাংগঠনিক উদ্দেশ্য এবং বিশেষজ্ঞ ও পদসোপান ভিত্তিক কর্তৃত্বের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনে বিশেষজ্ঞ ও পদসোপান ভিত্তিক কর্তৃত্বের ভূমিকাই আধুনিক সংগঠনে দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি রচনা করে। সংগঠনে মৌল আচরণ পদ্ধতির পারস্পারিক ক্রিয়া থেকে সাংগঠনিক অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এছাড়া কারিগরী পরস্পর নির্ভরশীলতা নির্ধারণকারী উপাদান, যেমন কর্তৃত্ব, মর্যাদা, অধিকতর বিশেষায়ণ এবং যোগ্যতা বন্টন ব্যবস্থা হতেও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। মেলভিল ডালটন (Melville Dalton) সাধরণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য তিনটি বিশেষ কারণকে নির্দেশ করেছেন - (১) বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টা কর্মকর্তাদের দৃশ্যমান উচচাকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিতান্ত্রিক আচরণ; (২) সংগঠনে বিশেষজ্ঞদের অবস্থান ও অবদানের প্রতি স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত প্রচেষ্টা হতে উদ্ভূত সমস্যাদি; এবং (৩) যে বাস্তবতা হতে সৃষ্ট মনোঃকষ্ট তা হচেছ সংগঠনে উচচ পর্যায়ে আসীন বিশেষজ্ঞদের উপযুক্ত পদাধিকার লাভ একন্তভাবেই সাধারণজ্ঞদের সম্মতির উপরে নির্ভরশীল।[১৭]

দ্বন্দ্বের উপরিউক্ত প্রেক্ষপটে আমাদের আলোচনা শুধুমাত্র সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর বা নির্দেশক ও উপদেষ্টা কর্মকর্তাদের পরস্পর নির্ভরশীল বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি

সংগঠন বা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে চাকরীপূর্ব যোগ্যতা ও পরবর্তীতে অর্জিত অভিজ্ঞতা অনুসারে এক একজন বিশেষজ্ঞ। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষ নিজেকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে গড়ে তুলেছে এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে মানুষের জ্ঞান বাড়ছে। ফলে সত্যিকার অর্থে সাধারণজ্ঞ বলতে কেউ নেই। তবে সাধারণজ্ঞ বলতে যা বোঝায় তা হচেছ গতিশীল সমাজে সংগঠনে সমন্বয়কারী এবং ক্রমবর্ধমান জটিলতার মধ্যে যিনি ভারসাম্য রক্ষা করেন। প্রশাসকদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছেন যাঁরা অন্যদের তুলনায় সাধারণ কাজের জন্য বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন এবং এরাই হলেন সাধারণজ্ঞ। এপলবির (Paul Appleby) মতে সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক নয়, আপেক্ষিক - "'Specialist' and 'generalist' are relative - not absolute - terms"।[১৮]

সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ এই দুই শ্রেণীর সম্পর্ক লোক প্রশাসনে একটি সমস্যা হিসাবে গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বস্তুত এই সমস্যা প্রশাসনিক কাজের দ্রুত বিশেষায়নের ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হয়েছে। সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের মধ্যে দ্বন্দ্ব মূলত ক্ষমতা, সম্মান, বেতন এবং পদ মর্যাদাকে কেন্দ্র করেই উদ্ভূত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অভিযোগ আনা হয়। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর দক্ষতা বা বিশেষ জ্ঞান থাকার জন্য তারা এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, পেশাদারী মনোভাব যত বাড়বে প্রশাসনিক যোগ্যতার তত অভাব ঘটবে এবং সংকীর্ণ গোড়ামিটাও অব্যাহত থাকবে। বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক সাধারণ দায়িত্ব নিয়ে যত উচ্চ পদেই এরা সমাসীন থাকুন না কেন স্ব স্ব পেশাগত আনুগত্য সহজে ছাড়তে পারেন না। একজন বিশেষজ্ঞ কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে উদ্দেশ্যের চেয়ে পদ্ধতিগত দিক নিয়েই অতি ব্যস্ত থাকেন। উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারণ শুধুই কলা-কৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা কেন্দ্রীক নয়। এর সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক তাৎপর্যও জড়িত থাকতে পারে। এ পর্যায়ে নীতি কার্যকর করার জন্য কোন একটি দিকে প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা অপেক্ষা বহুমুখী অভিজ্ঞতারই প্রয়োজন বেশী।[১৯]

সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বিশেষজ্ঞ তার মতামত বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্ধ হয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন যে একমাত্র তিনিই কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে ভাল বোঝেন। পেশাগত কারণে তিনি শুধু পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যসমূহকে প্রাধান্য দেন এবং এরূপক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মানবিক উপাদনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। এ প্রসঙ্গে এটা অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রশাসন রাজনীতির একটি অংশ এবং বৃহত্তর সমাজের একটি দিক।

পেশাগত কারণে বিশেষজ্ঞ এক ধরণের খুঁত খুঁতে স্বভাব অর্জন করেন। ফলে সমন্বয় দক্ষতা তাদের কর্ম প্রচেষ্টায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু এই অধ্যায়ের প্রথানাংশের আলোচনা হতে আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সমন্বয় এবং সমন্বয়ের অবস্থান প্রশাসনের কেন্দ্রস্থলে।

বিশেষজ্ঞ কোন একটি বিষয় বা ঘটনাকে সামগ্রিক ঘটনার একটি অংশ বলে বিবেচনা করতে পারেন না। বরং ঘটনাকে একটি বিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে বিশ্লেষণ করেন। কারণ পেশাগত মনোভাব থেকেই তার মধ্যে একটি একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে। কিন্তু প্রশাসনে কোন কার্যই বিচ্ছিন্ন নয়। প্রতিটি কার্যকে একটি বিশেষ সমস্যা হিসাবে মনে করা হলেও বাস্তব দৃষ্টিতে প্রতিটি সমস্যাই ব্যাপক ও গভীর সমস্যা জালের মধ্যে আবদ্ধ। কোন নীতিকে বাস্তবায়ন করতে হলে ছোটখাট সমস্যার সঙ্গে বড় সমস্যার কি অন্তর্নিহিত সম্পর্ক তা জানা প্রয়োজন। তা ছাড়া প্রশাসনে বিভিন্ন গোষ্টিগত স্বার্থ জড়িত থাকতে পারে। উপর্যুক্ত কারণেই একজন বিশেষজ্ঞ তার মতামতের প্রধান্য দাবী করতে পারেন না।[২০]

সরকারী নীতি প্রণয়ন যুক্তিভিত্তিক ঘটনা বা তথ্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু উপাত্ত বা তথ্যই সিদ্ধান্ত প্রণয়নের একমাত্র উপাদান নয়। কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য শুধু বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না বরং

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষিণপ্রাপ্ত অথচ বিশেষজ্ঞ নন এরূপ প্রশাসকের সমালোচনামূলক মতেরও প্রয়োজন হয়। অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা জনসাধারণের প্রত্যাশা, প্রতিক্রিয়া এবং চেতনা পুরোপুরিভাবেই অনুভব করেন।

বর্তমানে অনেক বিশেষায়িত সংস্থা সাধারণজ্ঞ প্রশাসক কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষায়িত সংস্থার কাজের মধ্যে কিছু কারিগরী বিশিষ্ট্যতা থাকলেও প্রশাসককে একটিমাত্র সঠিক পদ্ধতিই অনুসারণ করতে হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। কর্মসূচী যাই থাকুক সেটা কার্যকরী করার জন্য কোন একটিমাত্র প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা অপেক্ষা বহুমুখী অভিজ্ঞতারই প্রয়োজন বেশী।[২১]

ভাবের আদন প্রদান বা যোগাযোগ স্থাপন ক্ষেত্রেও একজন বিশেষজ্ঞ সফল হতে পারেন না। কারণ তিনি তার নিজস্ব বিষয়ে যত বেশী বিশেষজ্ঞ হোন না কেন নিজস্ব বিষয় সম্পৃক্ত বিভাগ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক তত অভিজ্ঞ নাও হতে পারেন। এপলবির মতে, কোন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সাধারণ নীতি নির্ধারণে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাথে ভাবের আদান প্রদানের চেষ্টা না করাটাই বাঞ্ছনীয়। বরং বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত বিভাগের উপর দিকে এমন সব লোক থাকা দরকার যারা বিশেষজ্ঞ অপেক্ষা সাধারণভাবে নিজেদের বক্তব্য পেশ ও দায়িত্ব পালনে অধিকতর দক্ষ থাকেন। এ প্রসংঙ্গে এপলবি বলেন, "..... no expert *as an expert* should ever try to communicate with anyone responsible for general policy. Rather there should be efforts to develop will-filled-in hierarchies of specialists in the principal areas of specialism with persons in the upper levels of such hierarchies being more experts in exposition than in the particular subject and fucntion"।[২২]

উপরিউক্ত যুক্তি প্রদর্শন করে সাধারণজ্ঞরা বিশেষজ্ঞদেরকে নীতি নির্ধারক হিসেবে অনুপযুক্ত প্রমাণ করতে চেয়েছেন। অপর পক্ষে বিশেষজ্ঞরাও যুক্তির মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত যুক্তি খণ্ডন করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য

প্রশাসনিক পদসোপানের উর্ধ্বতন পদসমূহের অধিকাংশই সাধারণজ্ঞরা অধিকার করে আছেন এবং বিশেষজ্ঞদেরকে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। দেশের সর্বোচচ সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিত্ব তূলনামূলকভাবে কম। একজন বিশেষজ্ঞের আগমনকে সাধারণজ্ঞ শুভ দৃষ্টিতে দেখেন না। সাধারণজ্ঞের বিভাগীয়

Dhaka University Institutional Repository

শীর্ষ মর্যাদা এবং কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা থাকার জন্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে সচেতন ও সজ্ঞানে তাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্র হতে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

সকল বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তি বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদের প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব রয়েছে এ কথা ঢালাও ভাবে সত্য নয়। একজন সাধারণজ্ঞের বিশেষ ক্ষেত্র সম্পর্কিত যোগ্যতা অধিকতর শ্রেয় নয়। বরঞ্চ কোন একটি জ্ঞান বা দক্ষতা যার যত বেশী থাকবে সে ব্যাপারে তার ভিত্তিমূল তত দৃঢ় হবে। এবং উক্ত বিষয়ে কর্মসূচী বাস্তবায়নে তিনি ততটা সফল হবেন।

নীতি প্রণয়ন, পরিরচলনা এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসকরা যে কলাকৌশলগত ও বিজ্ঞান বিষয়ে তথ্য এবং পরিসংখ্যান ব্যবহার করেন তার জন্য তাদেরকে বিশেষজ্ঞের উপরই নির্ভর করতে হয়। এসব তথ্য প্রয়োগের ফলে কি ফল হতে পারে এবং জনগণের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে তা জানার জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্যের প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞের সাহায্য ও সমর্থন না পেলে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আধুনিক সমাজের জটিল সমস্যার গভীরে প্রবেশ করা এবং সেসব বিষয়কে সুনিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়। একটি বৃহদাকার জটিল সংস্থার বিশেষজ্ঞরা কলাকৌশলগত সংগঠনের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি পূর্ণ সজাগ থাকেন এবং পেশাগত দিক থেকে এর উন্নয়নের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

এমন কোন সার্বজনীন প্রমাণাদি নেই যে বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের পেশাগত ও কর্মপরিধির কারণে সীমাবদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রেই পরিদৃষ্ট হয় যে বিশেষজ্ঞ একজন সাধারণজ্ঞের চেয়ে অনেক বেশী কল্পনা প্রবণ ও অধিকতর সমাজ চেতনা সম্পন্ন। এটাও বলা যুক্তিসঙ্গত নয় যে বিশেষজ্ঞদের চিন্তধারায় মানবিক উপদানের স্পর্শ নেই। বিশেষজ্ঞ তার সংগঠনের দায়িত্ব পালন কালে সমাজের ব্যক্তি কল্যাণ সাধনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বস্তুত বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সৃজনশীল ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে মানব কল্যাণেই নিয়োজিত করেন।

কার্যগত বিশেষজ্ঞ তার সংগঠনে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে অতি সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। তিনি কারিগরী সংক্রান্ত সমস্যার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত বলে সমস্যা অতি সহজেই নির্ণয় করতে পারেন।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব অনেক ক্ষেত্রেই মনস্তাত্বিক ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত। এ দুই শ্রেণীর ব্যক্তিত্বের উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের কারণেই এদের মধ্যে সংঘাতপূর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এদের মধ্যে মনস্তাত্তিক সমস্যা উদ্ভূত হয়। সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তা তাদের কাজকে বেশী গুরুত্ব দেন এবং বিশেষজ্ঞের কাজকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন। এতে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তার মধ্যে অনিশ্চয়তা এবং আক্রোশমূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে বড় বড় সংগঠনে অনেক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যারা তাদের বিশেষ জ্ঞান সম্পর্কে অতিবেশী অহমিকা প্রকাশ করেন এবং তারা সংগঠনের 'মানব সম্পর্ক' বিষয়টির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না। তারা যদিও সংগঠনের মধ্যে অবস্থান করেন কিন্তু তারা সংগঠনের কেউ নন এরূপ মনোভাব প্রকাশ করে থাকেন।

সাধরণজ্ঞ কর্মকর্তারা অনেক সময় এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন যে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তারা তাদের কর্মে ও কর্ম পদ্ধতিতে অনেক ত্রুটি বের করবেন। কেননা বিশেষজ্ঞের প্রধান কাজই হলো প্রতিটি কর্মের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা এবং তা উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করা। সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তারা প্রচলিত কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন অনায়াসে গ্রহণ করতে রাজি নন। সাধারণত সাধারণজ্ঞরা সনাতনকে আঁকড়ে থাকে বলেই অনেক ক্ষেত্রে তারা বিশেষজ্ঞদের 'যুক্তিহীন উদ্ভাবক' বলে সন্দেহ করেন।

প্রকৃতপক্ষে দুইয়ের দায়িত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের বাঁধন সুদৃঢ় হতে পারে। যখন কোন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা সাধারণজ্ঞকে উপদেশ দেন তখন সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তাকে বুঝতে হবে যে তার কর্তৃত্বের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা না করে বরং সহায়তার জন্যই তিনি উপদেশ দিচ্ছেন। সাধারণজ্ঞ অনেক সময় তার কর্তৃত্বকে বড় করে দেখেন এবং বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তার উপদেশকে অবাস্তব বলে বা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সাধরণজ্ঞ কর্মকর্তার উচিত উপদেশ বা মতামত মনোযোগ এবং ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করা। প্রশাসনিক সংগঠনে জটিল ও বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন কর্ম সম্পাদনের প্রয়োজনেই এরূপ উপদেষ্টার নিয়োগ করা হয়। যেখানে এদের প্রয়োজন রয়েছে সেক্ষেত্রে (প্রায়োগিক বিষয়ে) বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করেই সাধারণজ্ঞের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করা উচিত। বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা এক প্রকার শুন্যতার মাঝে কাজ করেন। ফলে সাধরণজ্ঞকে কিরূপ জটিলতার মাঝে কাজ করতে হয় এরা তা সহজে বুঝেন না এবং কোন সুপারিশ গ্রহণের সময় মূল ঘটনা তলিয়ে দেখেন না। সূক্ষ্ম বিবেচনা জড়িত প্রশ্নও এরা এড়িয়ে যান। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণজ্ঞের করণীয় হবে বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত প্রস্তাবসমূহের উপর সামগ্রিকভাবে নির্ভর না করে সেটাকে ভিত্তি হিসেবে ধরে অন্যান্য বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে সিদ্ধান্ত নেয়া।

সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তা যদি দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন এবং উপদেষ্টা কর্মকর্তাকে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশংসা করেন বা তাদের প্রাপ্য সম্মান দেন তা হলে তারা নিজ নিজ কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করবেন। তারা যদি পরস্পরের ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করেন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হন তা হলে তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সমঝোতার পরিবেশ গড়ে উঠবে।

এছাড়া, সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে এ দুই শ্রেণীর মধ্যেকার বেতন, পদোন্নতির সুযোগ, সম্মান ও চাকুরীগত সুযোগ-সুবিধার ব্যবধান দূর করতে হবে। কারিগরী ও কৌশলগত বিভাগের বিশেষজ্ঞদের কর্তৃত্বকারী পদে নিয়োগ করা হলে তারা তাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার পরিপূর্ণ প্রয়োগ করার সুযোগ লাভ করবেন। সর্বশেষে বলা যায়, সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ প্রত্যেকেরই স্ব স্ব অবদান ও প্রচেষ্টাকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে প্রশাসনে এই দুই শ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব হিংসা ইত্যাদির অবসান হবে এবং সংগঠন তার সর্বাধিক লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে।

তথ্য নির্দেশ

১। শামছুর রহমান, *আধুনিক লোক প্রশাসন* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৯৩) পৃঃ ১২০, ১২৩, ১২৭, ১৩৫।

২। John D. Millett, "Concepts of Organization", in F.M. Marx, ed., *Elements of Public Administration*, (Englewood Cliffs, N.S.: Prentice-Hall, 1959), p.130।

৩। প্রাগুপ্ত, পৃ: ১৩০-৩১।

৪। শামছুর রহমান, প্রাগুপ্ত, পৃ: ২২২।

৫। প্রাগুপ্ত, পৃ: ১২৩।

৬। James D. Mooney and Alan C. Reiley, *The Principles of Organization*, (New York: Harper and Borthers, 1939), p. 25।

৭। John M. Pfiffner and Frank P. Sherwood, *Administrative Organization*, (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1960), p. 30।

Dhaka University Institutional Repository

৮। শামছুর রহমান প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৫।

৯। Pfiffner and Sherwood, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭২।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৯।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৯-৮১।

১২। Leonard D. White, *Introduction to the Study of Public Administration*, (New Delhi: Eurasia Publishing House, 1968), p. 210।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২-৩৪।

১৪। Pfiffner and Sherwood, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৩-১৭৮।

১৫। F.F. Ridley, *Specialists and Generalists*, (London: George Allen and Unwin Ltd., 1968), p. 14।

১৬। শামছুর রহমান প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭৬-২৮০। আরো দেখুন, R.J. S. Baker, *Administrative Theory and Public Administration*, London: Hutchinson & Co. Ltd., 1972, pp. 152-161; Paul H. Appleby, *Public Administration for a Welfare State*, (Bombay: Asia Publishing House, 1965), pp. 47-73।

১৭। Melville Dalton, "Conflicts between Staff and Line Managerial Officers" in Joseph A. Litterer, ed., *Organizations: Structure and Behavior*, (New York: John Wiley ans Sons, 1963), p. 403।

১৮। Appleby, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৫।

১৯। Baker, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৪-৫৮।

২০। এমাজউদ্দিন আহমেদ, *বাংলাদেশ লোক প্রশাসন*, ঢাকা, (অনন্যা, ২০০২), পৃ: ৩১৯।

২১। Baker, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৪-৫৫; Appleby, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬২।

২২। Appleby, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৪।

২৩। শামছুর রহমান প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস
(১৬০১-১৯৪৭)

ভূমিকা

একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্রিটিশ ভারতে সিভিল সার্ভিসের প্রায় দেড়শত বছরের ধারাবাহিক ও বিচিত্র ইতিহাস রয়েছে। শুরুতে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সওদাগরি চাকরি ব্যবস্থা থেকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সমসাময়িক বিশ্বের অন্যতম খ্যাতনামা শাসন ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। তাত্ত্বিক অর্থে 'সিভিল সার্ভিস' (Civil Service) বলতে যা বুঝায় ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ছিল তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ছিল ভারতের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থানকারী এক এলিট প্রশাসক গোষ্ঠী (*corps d' elite*)। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস শুধুমাত্র সরকারের শাসন বিভাগ পরিচালনার দায়িত্বই গ্রহণ করে নি, সাথে সাথে সরকারের নীতি নির্ধারণ করেছে, সার্ভিসের প্রবীণ সদস্যরা প্রাদেশিক গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছেন, শ্রেষ্ঠ বিচারালয়ে বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন আর গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদে সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন, এমনকি আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে আইন প্রণয়নও করেছেন।[১] তবে বরাবরই এ সার্ভিসের সদস্য সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত। ১৯১৯ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১২৫৫ জন। ১৯৩৯ সালে এ সংখ্যা ১২৯৯ জনের উর্ধ্বে ওঠে নি।[২]

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্মলগ্ন ১৬০১ সালে। ১৬০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর "দি গভর্নর অ্যান্ড কোম্পানি অব মারচেন্টস্ অব লন্ডন ট্রেডিং ইন্টু দি ইস্ট ইন্ডিজ" (The Covernor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies') নামধারী লন্ডনের এক বণিকগোষ্ঠী রানী এলিজাবেথের নিকট থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় বাণিজ্য করার সনদ লাভ করেন।[৩] ১৭০৯ সালে সে বণিকগোষ্ঠী আরো কতিপয় বণিক সমিতির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন এক সংগঠন তৈরি করেন। তার নামকরণ হয় 'ইউনাইটেড কোম্পানি অব মারচেন্টস্ অব ইংল্যান্ড ট্রেডিং টু দি ইস্ট ইন্ডিজ' (United Company of Merchants of England Trading to the East Indies')। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে সে কোম্পনিকে সংক্ষেপে বলা হয় "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনি" (East India Company)।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৭৬৫ সালে কোম্পানি বাংলার দেওয়ানী ক্ষমতার অধিকারী হয়। ১৭৭৩ সাল থেকে কোম্পানি শাসন ক্ষমতাও পরিচালনা করতে থাকে আর ১৮৩৩ সালে এর বাণিজ্যিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হলে শাসন ক্ষমতাই প্রাধান্য লাভ করে। ১৮৫৮ সালে ব্যর্থ সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হবার পর কোম্পানীর সকল ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজের হস্তে ন্যস্ত হয়। ফলে ১৬০১ সালের "গভর্নর অ্যান্ড কোম্পানি অব মারচেন্টস্ অব লন্ডন" (Governor and Company of Merchants of London) স্বপরিষদ ভারতীয় সেক্রেটারি অব স্টেট কাউন্সিলে রূপান্তরিত হয়। বণিকদের কুঠিগুলো রূপ লাভ করে এক সাম্রাজ্যে আর বণিক ও তাদের কর্মচারীরা সংগঠিত হয়ে ওঠে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে।

এ অধ্যায়ের পরবর্তী পাঁচটি প্রধান অংশে ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগ পূর্ব উপমাদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনামলে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) এর উৎপত্তি, বিকাশ, আইসিএসদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, সিপাহী বিদ্রহো উত্তর ব্রিটিশ রাজ আমলে আইসিএস-এর ভারতীয়করণ, প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। অধ্যায়ের প্রায় পুরোটা জুড়েই আইসিএসদের প্রংসগ প্রাধান্য পেয়েছে। অনেক পর্যবেক্ষক এদেরকেই সেই বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের "স্টিল ফ্রেম" হিসেবে অবিহিত করে গেছেন। এবং আধুনিক পর্যবেক্ষকদের অনেকে ভারত-বিভাগ উত্তর রাষ্ট্রসমূহেও আইসিএসদের উত্তরসূরির সন্ধানে অনুশীলনরত রয়েছেন।

কোম্পানি সার্ভিসের আইনগত ও যৌক্তিক ভিত্তি সুসংহতকরণ

১৭৮৬ সালে গভর্নর জেনারেল হিসেবে লর্ড কর্নওয়ালিসের (১৭৮৬-৯৯) আগমন পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য, বাণিজ্য-বসতি ও সুবা বাংলার দেওয়ানী শাসন পরিচালনার জন্য ছিল দুই প্রকারের সার্ভিস কাঠামো - একটি Covenanted Civil Service এবং অপরটি Uncovenanted Civil Service। লন্ডনে কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স-এর সঙ্গে বিশেষ চুক্তিপত্রে (Covenant) আবদ্ধ হয়ে এদেশে কোম্পানির বিষয়াদি পরিচালনার জন্য যারা নিয়োগ লাভ করতো তারা ছিল Covenanted Civil Servant বা চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তা। এদিকে বিশেষ প্রকল্পে বা কোন তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে কলকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়াম' নামকরণে গঠিত কুঠিতে অবস্থানকারী কোম্পানি কর্তৃপক্ষও স্থানীয়ভাবে লোক নিয়োগ করতো। স্থানীয়ভাবে নিযুক্ত এসব কর্মচারী ছিল Uncovenanted Civil Servants বা অচুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তা[৫]। উল্লেখ্য যে, অভ্যাগত ইউরোপীয় ও ইউরো-এশীয়দেরকে প্রধানত এ সার্ভিসে নিয়োগ করা হতো। অচুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তাদের চাকুরির নিশ্চয়তা ছিল না, বেতনের

Dhaka University Institutional Repository

হারও ছিল খুব কম। তাদের বেশির ভাগেই নিযুক্ত হতো স্বল্প মেয়াদে। প্রধানত নকলনবিশ, পত্রবাহক, কেরানি, মেস পরিচালক[৬], পোস্টম্যান সার্ভেয়ার প্রভৃতির কর্ম গ্রহণ করতো অচুক্তিবদ্ধরা। অল্প মায়নার সমস্যাটি নিরসন করতো এরা নজরানা, বকশিস, উৎকোচ, সুদে লগ্নি, ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রভৃতির মাধ্যমে। অবশ্য চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তাদেরও মায়না ছিল নামেমাত্র। তবে নামেমাত্র মায়না পুষিয়ে নেবার জন্য ভারতে এসে কোম্পানির কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ব্যবসা করা এবং কোম্পানির জাহাজে তাদের নিজস্ব পণ্য পরিবহণের সুবিধা প্রদান ইত্যাদি কোম্পানির সঙ্গে তাদের চুক্তি (Covenant) বা সনদস্বীকৃত সুবিধাদির মধ্যে ছিল অন্যতম।

এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটান কর্নওয়ালিস। তিনি কোম্পানির বাণিজ্য থেকে প্রশাসন সম্পূর্ণ পৃথক করে প্রশাসনিক চাকুরি ও বাণিজ্যিক চাকুরিকে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা পেশায় পরিণত করেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ সিভিল সার্ভিসে প্রেষিত সকল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাইভেট ব্যবসা সম্পূর্ণ অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং অবৈধ ব্যবসা প্রমাণিত হলে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করার কঠোর নিয়ম প্রণীত হয়। প্রাইভেট ব্যবসা ছাড়াই কোম্পানির কর্মচারী-কর্মকর্তারা যাতে সরকারী চাকুরির প্রতি আকৃষ্ট হয় সেজন্য তাদেরকে দেয়া হয় আকর্ষণীয় হারে বেতন।[৭] পেশাগত উৎকর্ষ, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য তিনি কর্মকর্তাদের কার্যকে স্থায়ীভাবে বিচার ও প্রশাসন এ দুভাগে বিভক্ত করেন। সব শেষে তিনি বিধান করেন যে, সকল দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদ লাভ করবে শুধু Covenanted Civil Servantরা। এদের শপথ গ্রহণ করতে হয় এ মর্মে যে, তাঁরা স্বনামে বা বেনামে প্রশাসনিক দায়িত্বের বাইরে ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হবে না; ঘুষ, উৎকোচ, নজরানা, পেশকাশ বা পুরস্কার গ্রহণ করবেন না, জমিদারদের নিকট থেকে টাকা ধার নিতে পারবেন না এবং ধার দিতেও পারবেন না এবং সর্বাবস্থায় তাঁদের কার্যকলাপের লক্ষ্য হবে নিরপেক্ষতা, আইন ও নিয়মকানুনের প্রতি আনুগত্য, কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা এবং শাসিতশ্রেণীর কল্যাণ সাধন। চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তাদের প্রাথমিক নিয়োগ হবে পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে, তবে পদোন্নতি হবে জ্যেষ্ঠতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে, আগের মতো সুপারিশ বা প্রভাবের ভিত্তিতে নয়। কর্নওয়ালিসের এসব বিধান ১৭৯৩ সনের চার্টার আইনে সন্নিবেশিত করে সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রাথমিক ভিত্তি।[৮]

কর্নওয়ালিসের পর সিভিল সার্ভিসের কাঠামো ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৮৫৪ সন পর্যন্ত সিভিল সার্ভিসের নিয়োগ পদ্ধতিতে তেমন কোন পরিবর্তন আনা হয়নি, কিন্তু চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তাদের ক্ষমতা, এখতিয়ার, বেতন ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কর্নওয়ালিসের রেখে যাওয়া ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, বিশেষ করে অচুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস কাঠামোয়। বিচার বিভাগের জন্য সদর আমিনের পদ সৃষ্টি করে পরবর্তীতে গভর্নর

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল পদে আসীন লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫) সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেন। সে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিংক (১৮২৮-১৮৩৫) অচুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসকে আরো সম্প্রসারিত করে ভারতীয়দের অধিকতর দায়িত্ব প্রদান করেন।

পৃষ্ঠপোষকতা থেকে প্রতিযোগিতা, ১৭৬৫-১৮৫৪

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ছিল শুধুমাত্র একটি প্রাইভেট বাণিজ্যিক সংস্থা, তখন স্বাভিবিক কারণেই অন্যান্য প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মতো কোম্পানি অনুসরণ করতো এর নিজস্ব নিয়োগ-নীতি। কোম্পানি-আইন অনুসারে এটা ছিল তাদের অধিকার। কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল যখন কোম্পানি বাংলায় রাজ্য স্থাপন করলো। কার হাতে থাকবে এ রাজ্যের শাসনভার ? কে নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করবে এ রাজ্যের কর্মচারী-কর্মকর্তাদের ? ব্রিটিশ সরকার, না কোম্পানি ? ব্রিটিশ আইন অনুসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজ্য শাসন করতে পারে না, কারণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও শাসনের অধিকার একমাত্র সার্বভৌম রাজা ও পার্লামেন্টের। পার্লামেন্টে দাবি উঠেছে কোম্পানির বাংলারাজ্য পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন আনার জন্য। কিন্তু এ দাবির বিরুদ্ধে কোম্পানি যুক্তি প্রদান করে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে শাসক হিসাবে নয়, ১৭৬৫ সনের চুক্তি মোতাবেক মুগল সরকারের অধীনে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান হিসেবে কিছু মুনাফা অর্জনকারী ভূমিকা পালন করেছে মাত্র, যা কিনা কোম্পানির বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডেরই একটি দিক। কিন্তু কোম্পানির এ কৌশলী দাবি উপেক্ষা করে ১৭৮৪ সনের ভারত আইন এবং ১৭৯৩ সনের চার্টার আইনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট এদেশকে বৃটেনের বিজিত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করে। তবে ব্রিটিশরাজের পক্ষে সে রাজ্য শাসন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে।[৯] পার্লামেন্টর পক্ষে এ রাজ্যের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সামরিক বাহিনী নিয়োগ করার অধিকারও দেয়া হয় কোম্পানিকে। এ অধিকার পার্লামেন্টারি ভাষায় patronage বা পৃষ্ঠপোষকতা নামে খ্যাত। এই পৃষ্ঠপোষকতা-অধিকারের ভিত্তিতে কোম্পানির কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স বৃটেন থেকেই সিভিল সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ করেছে ১৮৫৪ সন পর্যন্ত।

তবে কোম্পানির ঐ পৃষ্ঠপোষকতা-অধিকারে ক্রমশই পার্লামেন্টারি হস্তক্ষেপ বাড়তে থাকে। এরকম হস্তক্ষেপ প্রথম ঘটে ১৭৯৩ সনে চার্টার আইন নবায়নকালে। নবায়িত চার্টারে শর্ত যুক্ত হয় যে, কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স-এর সদস্যরা এ মর্মে শপথ নেবেন যে, তাঁরা ব্রিটিশ ভারতে নিম্নস্তরে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তা 'রাইটার' (Writer) মনোনয়ন দিতে গিয়ে প্রার্থীর নিকট থেকে কোন রকম আর্থিক বা অন্য কোন সুযোগ - সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে ডাইরেক্টারদের আয়ের এক বড় উৎস ছিল রাইটার মনোনয়ন। অর্থ, প্রভাবশালী মহলের সুপারিশ, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব রাইটার মনোনয়নে ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়। তবে রাইটার[১০] মনোনয়ন নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি, মন কষাকষি, কোন্দল এড়াবার জন্য পরিচালকদের

Dhaka University Institutional Repository

নিকট থেকে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে মনোনয়ন সংগ্রহ করা হতো। প্রতি বছর কোর্টের চেয়ারম্যান দিতে পারতেন দুটি মনোনয়ন, বোর্ড অব কন্ট্রোল দুটি মনোনয়ন এবং পরিচালকদের প্রত্যেকে একটি করে মনোনয়ন দিতে পারতেন। পার্লামেন্ট কর্তৃক রাইটারশিপের প্রার্থী থেকে আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ নিষিদ্ধ করা ছিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর ফলে রাইটার মনোনয়নে প্রার্থীর যোগ্যতার বিষয় প্রাধান্য লাভ করে।

এদিকে অচুক্তিবদ্ধ বা Uncovenanted Civil Service-এর নিয়োগ প্রায় সম্পূর্ণ কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কর্তপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করতো। লর্ড ওয়েলেসলির আমলে জেলা আদালতের জন্য সদর আমিন নামে দেশী বিচারক বিচার বিভাগের জন্য নিযুক্ত হন। কর্নওয়ালিস কর্তৃক প্রশাসনকে সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গ করার পর সদর আমিনই প্রথম দেশী অচুক্তিবদ্ধ আমলা, যে নামেমাত্র মায়নায় হলেও সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করলেন। কর্নওয়ালিস ব্যবস্থার মুন্সেফ (Native Commissioner), পণ্ডিত, মুনশি, মুফতি, সেরেস্তাদার প্রভৃতি আইন-কর্মচারী বেতন পেতেন না, তাঁরা বেতনের বদলে পেতেন মামলার মূল্যের উপর কিছু কমিশন এবং তাঁদের কোন দায়িত্বও ছিল না। রাজস্ব বিভাগে এবং জেলা কালেক্টরের সেরেস্তায় যারা দেওয়ন, নায়েব, মুহরী, কানুনগো প্রভৃতি পদে চাকরি করতেন তারা বেতন পেতেন, কিন্তু তাঁদের কোন দায়িত্ব ছিল না। তেমনিভাবে অচুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তারা ছিল ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে থানাদার, সিপাই, বরকন্দাজেরা। তবে এদের কাররই কোন সিভিল সার্ভিসের মর্যাদা ছিলা না, যদিও তারা সবাই ছিল তথাকথিত অচুক্তিবদ্ধ কর্মচারী শ্রেণীর সদস্য। বলা যায়, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোয় ওয়েলেসলি সৃষ্ট সদর আমিনই প্রথম দায়িত্বপ্রাপ্ত বেতনভোগী দেশী আমলা। অচুক্তিবদ্ধ দেশী কর্মাচারী নিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ঘটে বেন্টিংক প্রশাসনামলে। বেন্টিক সদর আমিনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। মর্যাদায় অতিরিক্ত জেলা জজের পরেই প্রিন্সিপাল সদর আমিনের স্থান।

সিভিল সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘোষণা করে ১৮৩৩ সনের চার্টার আইন। ১৭৯৩ সনের ব্রিটিশ ভারত আর ১৮৩৩ সনের ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ওয়েলেসলি (১৭৮৯-১৮০৫) থেকে আমহার্সট (১৮২৩-১৮২৮) পর্যন্ত ক্রমাগত রাজ্যবিস্তার, ১৮১৩ সনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্তি এবং অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তন, মফস্বলে ইউরোপীয়দের ভূমিনিয়ন্ত্রণ এবং বসতি স্থাপনের অধিকার, বেন্টিংক প্রশাসনের বিভিন্ন সংস্কারনীতি প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে গতিশীল রাখার জন্য ১৭৯৩ সনের ব্যবস্থায় সংশোধন আনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং এর সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র ছিল সিভিল সার্ভিস।

Dhaka University Institutional Repository

Covenanted Civil Service-এর রিক্রুটমেন্ট ব্যাপারে ১৮৩৩ চার্টার আইন বিধান করেছিল কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স-এর পৃষ্ঠপোষকতা সুবিধা বজায় রেখেই রাইটার নির্বাচনে যেন সীমিত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, Patronage-এর মাধ্যমে রিক্রুটমেন্ট ব্যবস্থায় প্রার্থীর মেধা নিশ্চিত করতে কর্তপক্ষ কতটুকু সফল হয়েছিল ? বলাই বাহুল্য যে, প্রতি বছর প্রতি ডাইরেক্টার যে কোন একজনকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে রাইটার বানাতে পারতেন। স্বাভাবিক নিয়মেই মনোনীত ব্যক্তিটি হবেন ডাইরেক্টারের পৃষ্ঠপোষকতা পাবার মতো কোন আপনজন বা এমন কেউ যাকে মনোনয়ন দিলে তাঁর নিজের আর্থিক বা অন্য কোন সুবিধা লাভ হতে পারে। তাই কোম্পানির patronage-এর সুবিধাটি সংরক্ষণের জন্য কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স ছিল সব সময়ই সজাগ। যখনই সরকার ঐ পৃষ্ঠপোষকতার অধিকারটি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্ট করেছে তখনই পার্লামেন্টের ভেতরে কোম্পানি মহল তা প্রভিহত করার চেষ্টা করেছে।[১১] যেমন, ১৮৩৩ সনের চার্টার আইনে বিধান করা হয় যে, প্রতি ডাইরেক্টার প্রতি বছর একজন মনোনয়নের বদলে চারজন মনোয়ন দেবেন যাদের মেধা যাচাই করে একজনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করবে রাইটারদের প্রশিক্ষণ দানের লক্ষে ১৮০৫ সালে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হেলিব্যারি (Haileybury) কলেজের একটি নির্বাচনী বোর্ড। টাইটার নির্বাচনে এ নিয়োগ ছিল এক ধরণের সীমিত মেধা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। কিন্তু কোম্পানির প্রতিবাদের মুখে ১৮৩৩ সনের চার্টার আইনের তথাকথিত প্রতিযোগিতার ঐ ধারাটি অবাস্তবায়িত থাকে। তবে রাইটার নির্বাচনে মেধার প্রশ্নটি একেবারেই যেন বাদ না পড়ে যায় সেজন্য ১৮৩৮ সনে একটি নিয়ম জারি করা হয় যে, ডাইরেক্টারদের মনোনীতি প্রার্থী তখনই হেলিব্যারি কলেজে রাইটার হিসেবে যোগদান করতে পারবে যখন কলেজের নির্বাচনী বোর্ড[১২] তার যোগ্যতা সম্পর্কে কোন আপত্তি তুলবেন না। প্রার্থীদের বয়সসীমা নির্ধারিত সর্বনিম্ন ষোল ও সর্বোচ্চ একুশ। কলেজের নির্বাচনী কমিটি কর্তৃক কোন প্রার্থী মনোনীত না হলে পৃষ্ঠপোষক ডাইরেক্টার বিকল্প মনোনয়ন দিতে পারবেন।

সিভিল সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট ও প্রশিক্ষণ : কোম্পানি আমল

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

কর্নওয়ালিস সিভিল সার্ভিসের গোড়াপত্তন করলেও এর পেশাগত উৎকর্ষের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন প্রথম লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫)। পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে রাইটার নিয়োগ নীতির প্রতি ওয়েলেসলির আস্থা ছিল না। তাঁর মতে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস-এর রিক্রুটমেন্ট ক্ষমতা থাকা উচিত ব্রিটিশ ভারত সরকারের হতে, সুদূরে অবস্থিত কোর্ট অব ডাইরেক্টারের পৃষ্ঠপোষকতা এক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করবে না।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

তবে পৃষ্ঠপোষকতা যেহেতু সম্পৃক্ত ছিল ব্রিটিশ রাজনীতি ও বাণিজ্যের সঙ্গে, সেহেতু এ অধিকার ভারত সরকারের হাতে তুলে দেয়া বাস্তবসম্মত ছিল না। ওয়েলেস্‌লি সিদ্ধান্ত নিলেন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে রাইটারদের নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রশাসনিক মান উন্নত করতে। সে লক্ষে তিনি ১৮০০ সনে কলকাতায় স্থাপন করেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। বিধান (রেগুলেশন ৯, ১৮০০) করা হয় যে, পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে মনোনীত প্রত্যেক রাইটারকে অফিসে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিন বছর কলেজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। প্রতি বছর বিভিন্ন বিষয়ে দুটি করে পরীক্ষা দিতে হবে। তৃতীয় বছর চূড়ান্ত পরীক্ষার বিষয় হবে প্রধান প্রাচ্য ভাষা, আরবি, ফার্সি, সংস্কৃতি, হিন্দুস্থানি, বাংলা, তেলেগু, মারাঠি, তামিল; ইউরোপীয় ভাষা ল্যাটিন, গ্রিক, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা; আইন – মুসলিম আইন, হিন্দু আইন, ব্রিটিশ আইন, কোম্পানি আইন, কোম্পানি সরকারের রেগুলেশন, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা – রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, ইউরোপীয় ও ভারতের ইতিহাস (রেগুলেশন ৯, ধারা ১৫)।

পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে নির্বাচিত রাইটারগণ ছিল বয়সে তরুণ (পনর-ষোল বছর), শিক্ষায় খুবই অপর্যাপ্ত এবং সর্বোপরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। ওয়েলেসলির মতে, দক্ষতা এবং পেশাগত উৎকর্ষের জন্য এদেরকে অতিরিক্তি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান একান্ত দরকার এবং সে শিক্ষা ও প্রশিক্ষাণের ব্যবস্থা করা সরকারেরই দায়িত্ব। ওয়েলেসলির বিশ্বাস ছিল এই যে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তা শুধু যোগ্যতর প্রশাসকই হবে না, এক সঙ্গে তিন বছর এক জায়গায় এক কোর্সে যোগদানের ফলে পেশাগত সংহতি (esprit de corps) সৃষ্টিতেও এ প্রশিক্ষণ রাখবে অমূল্য অবদান।

ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স-এর কোন পূর্ব-অনুমতি ছাড়াই। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন যে, তার পরিকল্পনাটি যেহেতু পৃষ্ঠপোষকতাকে যথেষ্ট খাটো করে, সেহেতু কোর্ট অর্ব ডাইরেক্টার্স তাঁর পরিকল্পনা অনুমোদন নাও করতে পারেন, বরঞ্চ কলেজ প্রতিষ্ঠ কওে রিপোর্ট আকারে তার অনুমতি চাইলে বাস্তবতাকে স্বীকার করে কোর্ট সে কলেজ-প্রকল্প স্বীকার করে নিতে পারে। কিন্তু ওয়েলেসলির সে কৌশল ফলপ্রসূ হয়নি। কোর্ট তাঁর প্রকল্প বাতিল করে দিয়ে তৎক্ষণাৎ তা গুটিয়ে নেবার জন্য আদেশ জারি করলো (জানুয়ারি ২, ১৮০২)। তবে ওয়েলেসলির মুখ রক্ষার্থে কলেজটি সম্পূর্ণ বন্ধ না করে এখানে শুধু কর্মকর্তাদের প্রাচ্য ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা রাখতে অনুমতি প্রদান করা হয়। ফলে, যে প্রতিষ্ঠানটি ওয়েলসলি সিভিল সার্ভেন্টদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ উচচতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউটরূপে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটি কোর্ট-এর বৈরী হস্তক্ষেপের জন্য পরিণত হলো শুধু একটি ক্ষুদ্র ভাষাকেন্দ্রে। অপরিবর্তিত অবস্থায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নামে সে ভাষাকেন্দ্রটির অস্তিত্ব ১৮৫৪ সন পর্যন্ত বজায় থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

হেলিব্যারি কলেজ (Haileybury College)

কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বিলুপ্তি আদেশ দিলেও কলেজের অন্তর্নিহিত দর্শনকে উপেক্ষা করতে পারেনি। যাদের হাতে ন্যস্ত থাকবে রাজ্য পরিচালনার ভার তাদেরকে দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন করার আগে প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত এ মর্মে কোর্ট ওয়েলেসলির সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করে। আসলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বিলুপ্তির আদেশ দেয়া হয় কোর্ট-এর মূল্যবান পৃষ্ঠপোষকতাকে এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই। সুতরাং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আদলেই ১৮০৫ সনে হার্টফোর্ড শহরে কোম্পানির খরচে প্রতিষ্ঠিত হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কলেজ। কলেজটি হেলিব্যারি নামক শহরে স্থানান্তরিত হয় ১৮০৯ সনে। এরপর থেকে কলেজটি সংক্ষেপে 'হেলিব্যারি কলেজ' নামেই সাধারণভাবে পরিচিতি লাভ করে।

ডাইরেক্টারদের মনোনীত প্রার্থীদের এ কলেজে তিন বছর অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে অধ্যায়ন ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এদের পাঠ্যতালিকায় ছিল রাজনৈতিক অর্থনীতি, ক্লাসিক্স ও সাধারণ সাহিত্য, গণিত, ইংলন্ডের ইতিহাস ও আইন, প্রাকৃতিক দর্শন, আরবি, ফার্সি, হিন্দুস্তানি, বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষা, ভারতের ইতিহাস ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের নিয়ম-কানুন। প্রতি বছর দুটি করে পরীক্ষা। তিন বছর পর চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্ররা সিভিল সার্ভিসে রাইটার হিসেবে যোগদান করার সার্টিফিকেট লাভ করবে। অনুত্তীর্ণ ছাত্রদের আরেকবার পরীক্ষা দেবার সুযোগ থাকে। কেউ পুনর্বার অনুত্তীর্ণ হলে পৃষ্ঠপোষক ডাইরেক্টার তার স্থলে আরেকজনকে নতুন করে মনোনয়ন দিতে পারবেন। সর্বোচ্চ আঠারো বছর বয়সে উত্তীর্ণ ছাত্রদের কলকাতায় এসে আরো এক বছর ভারতীয় ভাষা আয়ত্ত করতে হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে।

কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় অধিকার যতদিন স্থায়ী ছিল হেলিব্যারি কলেজের স্থায়িত্ব ছিল ততদিন। ১৮৫৩ সনের চার্টার আইনে Patronage বিলুপ্ত হলে নতুন ব্যবস্থায় কলেজটির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। কলেজটিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল অল্প বয়স্ক স্কুলফেরতা রাইটারদের জন্য, আর ১৮৫৪ সন থেকে মুক্ত প্রতিযোগিতার প্রার্থীরা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া গ্রাজুয়েট এবং রাইটার হিসেবে এদের পাঠ্যক্রম ছিল অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের আদলে। অতএব উন্নততর একাডেমিক পাঠ্যক্রমাধীনে শিক্ষাগ্রহণ-কারী গ্রাজুয়েটদের জন্য হেলিব্যারি কলেজ ছিল অনুপযুক্ত, অপ্রাসঙ্গিক। তবে সর্বশেষ ১৮৫৪ সনে ভর্তিকৃত মনোনীত প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষ না হওয়া অব্দি কলেজটি চালু রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কলেজের সর্বশেষ ব্যাচের সমাবর্তন হয় ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাসে এবং এর সঙ্গে বিলুপ্ত হয় পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে কোম্পানি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দানের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কলেজ, হেলিব্যারি।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৩ সনের চার্টার আইনের অধীনে মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে রিক্রুটমেন্টের ব্যবস্থা করা হয় এবং সে মুক্ত প্রতিযোগিতা কিভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং কোন্ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা পরিচালিত হতে পারে সে ব্যাপারে বোর্ড অব কন্ট্রোলকে পরামর্শ দেবার জন্য মেকলের (T.B. Macaulay) সভাপতিত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়।[১৫] কমিটির সুপারিশক্রমে পার্লামেন্ট ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জন্য যে নতুন বিধিবিধান প্রবর্তন করে তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

এই সার্ভিস নিয়ন্ত্রণের জন্য Civil Service Commissioners নামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান থাকবে। ১৮৫৮ সনে কোম্পানিশাসন অবলুপ্ত হলে ঐ প্রতিষ্ঠান একই পদবীতে সেক্রেটারি অব স্টেট-ইন-কাউন্সিল ফর ইন্ডিয়া-এর নিয়ন্ত্রণ চলে যায় এবং তখন থেকে Covenanted Civil Service-এর অনানুষ্ঠানিক নামকরণ হয় Indian Civil Service, সংক্ষেপে ICS।[১৬]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল নাগরিকই সারণি ২.১এতে উল্লেখিত বিষয় সম্বলিত ICS পরীক্ষা দিতে পারবে যদি তাদের বয়স সর্বনিম্ন ১৮ এবং সর্বোচ্চ ২৩ বছর হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্রাজুয়েশন বা সমতুল্য ডিগ্রি থাকতে হবে; সুস্বাস্থ্য ও সুচরিত্রের অধিকারী এ মর্মে একটি সার্টিফিকেটও থাকতে হবে। সারণি ২.১এতে উত্তীর্ণ

সারণি ২.১: ICS পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর বন্টন।

পরীক্ষার বিষয়	নম্বর
ইংরেজি লিখন চর্চা	৫০০
ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস	১০০০
গ্রিক ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস	৭৫০
রোমান ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস	৭৫০
ফরাসি ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস	৩৭৫
জার্মানির ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস	৩৭৫
ইতালির ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস	৩৭৫
গণিতশাস্ত্র	১০০০
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	৫০০
নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শন	৫০০
সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য	৩৭৫
আরবি ভাষা ও সাহিত্য	৩৭৫
মোট নম্বর[১৭]	৬৮৭৫

Dhaka University Institutional Repository

উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা মেধা অনুসারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয়ভাবে নিয়োগ লাভ করবে এবং ঐ প্রদেশ থেকেই চাকরি শেষে অবসর গ্রহণ করবে। কে কোন প্রদেশে পোস্টিং পাবে তা নির্ধারণ করা হবে মেধার ভিত্তিতে। ৬৮৭৫ নম্বরের প্রাথমিক পরীক্ষার মেধাতালিকায় সর্বোচ্চ স্থান লাভকারীরা নিয়োগ পাবে বাংলায়।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা Probationer বা প্রশিক্ষণার্থী নামে পরিচিত হবে। কে কোন প্রদেশে নিয়োগ পাবে তা নির্ধারিত হবার পর দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষানবিশগণ দুই বছর কাল ইংল্যান্ডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। এই প্রশিক্ষণপর্বের বিষয় হবে প্রধানত ভারতীয় ভাষা, ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, আইন-আদালত ইত্যাদি । প্রত্যেক প্রবেশনারকে যে-কোন দুটি ভারতীয় ভাষা আয়ত্ত করতে হবে, এর একটি হবে যে প্রদেশে সে নিযুক্তি লাভ করবে সে প্রদেশের ভাষা। ঐ প্রধান ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভের সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত সে কোন পদে যোগদান করতে পারবে না।

উত্তীর্ণ শিক্ষানবিশেরা কলকাতায় এসে প্রাথমিক পদে যোগদানের আগে এ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টর হিসেবে জেলা প্রশাসকের অধীনে প্রশিক্ষণ নেবে এক বছর। ভাষাজ্ঞানসহ বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শিক্ষানবিশ আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করবে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কোন পদে। সাধারণত একটি মহকুমার সাব-ডিভিশনাল অফিসার হিসেবে শুরু হয় তার কর্মজীবন।

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ভারতীয়করণ প্রশ্ন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতীয়দের জন্য সিভিল সার্ভিসের দ্বার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হলো ১৭৯৩ সনের চার্টার আইনবলে। এভাবে রাজ্য ব্যবস্থাপনা থেকে ভারতীয়দের উৎখাত করার উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার - ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে একচেটিয়া ব্রিটিশ করায়ত্তে এনে এর উদ্বৃত্ত রাজস্ব স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা নিষ্কণ্টক করা এবং ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ঔপনিবেশিক শাসক ও শাসিত সাধারণ মানুষের মধ্যবর্তী এমন কোন সচেতন শ্রেণীর বিকাশ রোধ করা। যা হোক, পরবর্তী তিন দশকের ব্যবধানে ব্রিটেনে এবং এদেশে পরিস্থিতির এমন পরিবর্তন ঘটলো যার ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৮৩৩ সনের চার্টার আইনে বিধান করল যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণের অজুহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজের কোন নাগরিককে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে না (ধারা ৮৭)।

এ ঘোষণার ফলে ভারতীয়দেরকে Uncovenanted-এ নিয়োগের পথ অধিকতর সুগম হলো বটে, কিন্তু Covenanted Civil Service-এর জন্য ভারতীয়রা আগের মতোই বঞ্চিত রয়ে গেল। এর কারণ Patronage। এ সার্ভিসে নির্বাচন পেতে হলে দরকার মেধা নয়, কোম্পানির কোন পরিচালকের সুপারিশ যা

Dhaka University Institutional Repository

কোন ভারতীয়ের পক্ষে লাভ করা ছিল কল্পনাতীত। তা ছাড়া, কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স ভারত সরকারকে তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, চার্টার আইনের ৮৭ ধারা কার্যকর না করে একে যেন একটি তাত্ত্বিক অবাস্তব সাধু সিদ্ধান্তরূপেই কিতাবের মধ্যে বন্দী রাখা হয়।[১৮]

কোম্পানি সরকার কর্তৃক Patronage-এর ভিত্তিতে Covenanted Civil Service নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ক্রমশই ব্রিটেনে জনমত গড়ে উঠেছিল। পার্লমেন্টের ভেতরে এবং বাইরে এবং পত্রপত্রিকায় কোম্পানির এ সুবিধার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। এদিকে শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যেও পৃষ্ঠপোষকতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে। ১৮৫৩ সনের চার্টার আই নবায়নের প্রাক্কালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রায় সাত হাজার লোকের স্বাক্ষরিত নানা দাবিদাওয়া সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করে পার্লামেন্টে। স্মারকলিপিতে উত্থাপিত দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের ন্যায্য অংশীদারিত্ব দেয়া।[১৯] পার্লামেন্টের বিতর্কে প্রখ্যাত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ জন ব্রাইট ও জন ফিলিমোরসহ অনেক উদারপন্থী সদস্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের দাবির পক্ষে তথা পৃষ্ঠপোষকতার বিরুদ্ধে এবং সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের ন্যায্য হিস্যা দেবার সপক্ষে যুক্তি প্রদান করেন। বঞ্চিত ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীও পৃষ্ঠপোষকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। সম্মিলিত প্রতিবাদের মুখে পরিশেষে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পৃষ্ঠপোষকতা নিলুপ্ত করে মুক্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।[২০] ১৮৫৩ সনের চার্টার আইন বিধান (ধারা ৩৭) করে যে, মহারাণীর সাম্রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছে এমন সবাই মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করতে পারবে। তবে সে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে একমাত্র লন্ডনে।

পৃষ্ঠপোষকতা বিলুপ্তির ফলে ব্রিটিশ প্রার্থীরা অবশ্যই সুবিধা পেল, কিন্তু ভারতীয়দের জন্য সিভিল সার্ভিসের দ্বার আগের মতোই প্রায় রুদ্ধ রয়ে গেল। এর প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত, শুধু লন্ডনে পরীক্ষার কেন্দ্র থাকায় ভরাতীয়দের পরীক্ষায় যোগদান করতে দেশ ছেড়ে ব্রিটেনে আসতে হতো। পরীক্ষার জন্য লন্ডন গমন করা এবং প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত লন্ডনে অবস্থান করার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। এ অর্থ যারা জোগাড় করতে পারতো শুধু তারাই লন্ডনে গিয়ে পরীক্ষা দেবার পরিকল্পনা নিতে পারতো। তা ছাড়া উনিশ শতকের শেষ অব্দি ICS পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে এমন যোগ্যতা সাধারণত উচ্চ বর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকেরই ছিল, এবং যেহেতু সমকালীন হিন্দু সমাজে সমুদ্র পাড়ি দেয়া সংস্কারবিরোধী ছিল, সেহেতু আর্থিক সঙ্গতি থাকলেও ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে হিন্দু যুবকেরা লন্ডনে যেতে কুণ্ঠা বোধ করতো। দ্বিতীয়ত, সকল অন্তরায় অতিক্রম করে যারা লন্ডনে গিয়েছে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় যোগদানের জন্য তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ; কেননা

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষার জন্য যে সিলেবাস প্রণীত হয়েছিল তা ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা ছাত্রদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সিলেবাসে ইউরোপীয় ইতিহাস, ভাষা ও সাহিত্যের যে দাপট দেখা যায় তা শুধু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কেন, এমন কি সাধারণ ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের জন্যও সিলেবাসকে করেছিল সুকঠিন। সিলেবাসটি প্রণীত হয়েছে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডিমিক সিলেবাসের আদলে। সিলেবাস প্রশ্নে মেকলে কমিটি খোলাখুলিভাবে মন্তব্য করেছে যে, অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের গ্রাজুয়েটেরা পেশাজীবী হিসেবে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে আসুক এটা ছিল তাদের একান্ত কাম্য।[২১] বলা বাহুল্য যে, মেকলে কমিটির চিন্তাধারায় ভারতীয়রা ছিল অনুপস্থিত।

মুক্ত প্রতিযোগিতার প্রারম্ভ থেকে (১৮৫৫) প্রথম মহাযুদ্ধ অব্দি পরীক্ষায় ভারতীয় প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৫২২ জন (বার্ষিক গড় ৮ জন) এবং এদের মধ্যে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে মোট ৮৪ জন (বার্ষিক গড় ১.৪২ জন)। অথচ এ সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১০৪১৭ জন (বার্ষিক গড়ে ১৭৬.৫৫) এবং চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ২৬৪৪ জন (বার্ষিক গড়ে ৪৪.৮১)।[২২] ব্রিটিশ ও ভারতীয় উত্তীর্ণ প্রার্থীর পারস্পরিক বার্ষিক গড় অনুপাত দাঁড়ায় ৪৪:১। প্রকৃত মেধার অনুপাতটি কিন্তু এত ব্যবধানপূর্ণ নয়। উক্ত সময়কালে ব্রিটিশ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে গড়ে শতকরা ২৫ জন আর ভারতীয় প্রার্থী শতকরা ১৬ জন। শত বাধাবিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ভারতীয় প্রার্থীরা যে যোগ্যতা প্রদর্শন করেছে তা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ।

ব্রিটিশ উদারপন্থী এবং ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বৃটেন ও ভারতে একযোগে ICS পরীক্ষা গ্রহণের সপক্ষে তুমুল দাবি উত্থাপন, এমন কি এর অনুস্থলে কোন কোন সরকারী কমিটির সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও ভারতে পরীক্ষকেন্দ্র না খোলার ব্যাপাওে কর্তৃপক্ষ থাকে অবিচল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর বৃটেনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও বিশ্বপরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন এবং ভারতে বিপুল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সিভিল সার্ভিসকে আর শ্বেতাঙ্গদের একচেটিয়া অধিকারে রাখা সম্ভব ছিল না।

সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট (Montagu-Chelmsford Report) ১৯১৮ সুপারিশ করে। এ পটভূমিতেই ১৯২২ সনে সর্বপ্রথম ভারতে ICS পরীক্ষা শুরু হয়।[২৩] সিভিল সার্ভিসকে ভারতীয়করণের লক্ষ্যে গঠন করা হয় Royal Commission, ১৯২৩-এর চেয়ারম্যানের নামানুসারে লী-কমিশন। ১৯২৪ সনে প্রকাশিত হয় লী-কমিশনের রিপোর্ট। লী-কমিশনের সুপারিশক্রমে প্রতি বছরের শূন্য পদের শতকরা বিশ ভাগ ICS পদ পূরণ করার ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

নেয়া হয় প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস থেকে পদোন্নতি দিয়ে এবং বাকি আশি ভাগ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। তবে ঐ আশি ভাগের অর্ধেক পদ সংরক্ষিত থাকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভারতীয় প্রার্থীদের জন্য, আর বাকি অর্ধেক পদ সংরক্ষিত থাকে ব্রিটিশ প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ ১৯২৫ থেকে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের শতকরা ৬০ ভাগ শূন্য পদ লাভ করলো ভারতীয়রা আর ৪০ ভাগ সংরক্ষিত থাকলো শ্বেতাঙ্গদের জন্য। বলাই বাহুল্য যে, এ ধরনের নীতি আদর্শ আমলাতন্ত্রেও পরিপন্থী। কেননা মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেধাভিত্তিক রিক্রুটমেন্ট আদর্শ আমলাতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তবে ভারতীয় আমলাতন্ত্রের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মুক্ত প্রতিযোগিতার নীতি কখনো আক্ষরিকভাবে অনুসৃত হয়নি। কোম্পানি আমলে সর্বশ্বেতাঙ্গ সিভিল সার্ভিস পৃষ্ঠপোষকতা, রাজ আমলে আক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতীয়বাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সংরক্ষণ ও মনোনয়ন নীতি প্রভৃতি সুবিধাবাদী ব্যবস্থা মুক্ত প্রতিযোগিতার চরিত্রকে নেতিবাচক করে তুলেছে। ১৯৪৭ সন পর্যন্ত সংরক্ষণ নীতি বলবৎ থাকে। বলাই বাহুল্য যে, সংরক্ষণ নীতির অধীনে রিক্রুটমেন্টের ফলে ১৯২৫-এর পর থেকে ভারতীয় আইসিএসদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ১৯৪০ নাগাদ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।[২৪]

প্রাদেশিক ও সুপিরিয়র সিভিল সার্ভিস

প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের পূর্বসূরী হচ্ছে তথাকথিত Uncovenanted Civil Service। কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতার আওতার বাইরে কলকাতা সরকার যে সব নিয়োগ করতো সেগুলিরই সামগ্রিক নাম ছিল Uncovenanted Civil Service। এ সার্ভিসের বেতন অল্প, মেয়াদ স্বল্প এবং নিরাপত্তা শূন্য। অচুক্তিবদ্ধ এ সার্ভিসে নিযুক্ত হতো প্রধানত দেশী লোকরা।[২৫] কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থায় মর্যাদায় সর্বোচ্চ অচুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তা ছিল দেশীয় কমিশনার বা মুন্সেফ।[২৬] উচ্চ মর্যাদার অচুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তা ছিলেন ওয়েলেসলির আমলে সদর আমিন এবং বেন্টিংক এর সংস্কারের পর বিচার শাখায় প্রিন্সিপাল সদর আমিন এবং নির্বাহী শাখায় ডেপুটি কালেক্টার। ১৮৪৩ সনে প্রবর্তিত হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ। এসব পদের অচুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তাদের নিয়েই উনিশ শতকের মাঝামাঝি গঠিত হয় একটি নেটিভ এলিট প্রশাসকশ্রেণী। ১৮৬১ সালের সিভিল সার্ভিস এ্যাক্টে সকল অচুক্তিবদ্ধ পদের নাম দেয়া হয় Subordinate Executive Service। নেটিভ শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরাই এ সার্ভিসের প্রার্থী। স্যার উইলিয়াম গ্রে এ. সার্ভিসকে আরো মর্যাদাপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করেন এর রিক্রুটমেন্টের জন্য এক রকমের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্তন করে। নিয়ম করা হয় যে, এ সার্ভিসের প্রতিটি শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রাথমিক স্তরে তিন জনের একটি তালিকা প্রস্তুত হবে। বিভাগীয় পরীক্ষার মাধ্যমে উক্ত তিন জনের একজন মেধাগুণে ঐ শূন্য পদে উন্নীত হবে। Subordinate Executive Service-এর অবয়ব আরো

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধি করেন স্যার জর্জ ক্যাম্ববল। তিনি প্রবর্তন করেন সাব-ডেপুটি কালেক্টরের পদ। ১৮৮৮-৮৯ সনে স্যার স্টুয়ার্ট বেইলির আমলে Subordinate Executive Service-কে দুটি শাখায় বিভক্ত করা হয়। উপরের শাখা গঠিত হয় ২৪২ জন বিশেষ ডেপুটি কালেক্টর নিয়ে। আর এর নিম্নের শাখা গঠিত হয় সাব-ডেপুটি কালেক্টর, অস্থায়ী অফিসার, তহশিলদার, কানুনগো ও সার্ভেয়ার নিয়ে। বিভিন্ন ধর্ম ও এলাকার মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে এ শাখায় অর্ধেক শূন্য পদ পরীক্ষার মাধ্যমে আর বাকি অর্ধেক বিভাগীয় মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, Subordinate Executive Service কোন নিয়মিত নতুন সার্ভিস নয়, বরং পূর্বতন Uncovenanted Civil Service-এর কাঠামোরই উপরিভাগ।

১৮৫৮ সনে রাণীর ঘোষণা থেকে ভারতীয়রা আশ্বাস লাভ করেছিল যে, Covenanted Civil Service-এ "তাদের আসন লাভে কোন আইনগত বাধা থাকবে না এবং আমলাতন্ত্রে ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের থাকবে অভিন্ন ও সমান অধিকার"।[২৭] কিন্তু ইন্ডিয়া অফিস এবং ভারত সরকার রাণীর এ ঘোষণা বাস্তবায়নে নানা আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ভারতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা রাজনৈতিকভাবে অবাস্তব[২৮] ঘোষণা করে সরকার ১৮৭৯ সনে সিদ্ধান্ত নেয় Statutary Civil Service নামে একটি ক্যাডার তৈরি করে মনোনয়নের মাধ্যমে ভারতীয়দেরকে কিছু উচ্চ পদ প্রদান করতে। স্বাভাবিক কারণেই ঐ সার্ভিসে মনোনয়ন লাভ করে তারাই যারা ছিল অভিজাত এবং বৃটিশের প্রতি একান্ত অনুগত। মেধার চেয়ে মর্যাদাই ছিল মনোনয়নের বড় বিবেচনার বিষয়। ভারতীয় জনমত নতুন সার্ভিসকে প্রচণ্ড সমালোচনা করে এবং সন্দেহের চোখে দেখে। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় স্টেটুটারি সিভিল সার্ভিস-এর বিপক্ষে বাংলা সরকারসহ প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার মত প্রকাশ করে। এদিকে ভারতের বিভিন্ন সভাসমিতি ও দল ভারতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। আন্দোলনের মুখে সরকার সিভিল সার্ভিস ভারতীয়করণ সম্পর্কে বিকল্প চিন্তভাবনা শুরু করে। ঐ চিন্তারই ফসল ১৮৮৬ সনের পাবলিক সার্ভিস কমিশন, যা সাধারণভাবে Aitchison Commission নামে পরিচিত।[২৯] কমিশনকে দায়িত্ব দেয়া হয় সিভিল সার্ভিসকে ভারতীয়করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পন্থা সুপারিশ করার জন্য।

Aitchison Commission-এর সুপারিশ ছিল অতীত তথাকথিত Unconvenanted Civil Service-এর নামে সময় সময় সৃষ্ট সকল সার্ভিস ক্যাডারকে এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করার জন্য যাতে করে মেধার ভিত্তিতে সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষিত যুবক মর্যাদাপূর্ণ পদ লাভ করতে পারে।[৩০] কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সরকার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:

Dhaka University Institutional Repository

১. Statutary Civil Service বিলুপ্ত করা হবে;

২. Uncovenanted Civil Service বিলুপ্ত করে প্রতি প্রদেশে প্রভিন্সিয়েল সিভিল সার্ভিস গঠন করা হবে;

৩. Convenanted Civil Service-এর জন্য সংরক্ষিত অনেকগুলো পদ প্রভিন্সিয়েল সিভিল সার্ভিসে হস্তান্তর করা হবে;

৪. সামাজিকভাবে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস এবং প্রভিন্সিয়েল সিভিল সার্ভিসকে সমান মর্যাদাপূর্ণ গণ্য করা হবে;

৫. প্রভিন্সিয়েল সিভিল সার্ভিস কাঠামোয় Subordinate Civil Service নামে একটি অধঃস্তন সার্ভিস ক্যাডার গঠন করা হবে এবং

৬. প্রভিন্সিয়েল সিভিল সার্ভিসের রিক্রুটমেন্ট হবে তিন উপায়ে -

ক. দক্ষতার ভিত্তিতে সাবর্ডিনেট সিভিল সার্ভিস থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে,

খ. উচ্চ নির্বাহী পদের জন্য সাবর্ডিনেট সিভিল সার্ভিস থেকে পরীক্ষার মাধ্যমে,

এবং

গ. বিচার বিভাগীয় পদের জন্য সরাসরি মনোনয়নের মাধ্যমে।

প্রভিন্সিয়েল সিভিল সার্ভিসের নাম হবে প্রদেশের নামানুসারে, যেমন - বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস, পাঞ্জাব সিভিল সার্ভিস, বোম্বে সিভিল সার্ভিস ইত্যাদি। লক্ষণীয় যে, ভারতীয় জনমত দাবি জানাচ্ছিল সুপিরিয়র সার্ভিসের জন্য একযোগে বৃটেনে ও ভারতে আই সি এস পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য যেন ভারতীয় প্রার্থীরা সমপর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে। সে লক্ষ্যে কোন সুপারিশ না করে Aitchison Commission সুপিরিয়র সার্ভিসের কতিপয় ক্যাডার প্রভিন্সিয়েল সিভিল সার্ভিসে হস্তান্তর করলো এবং ক্যাডারগুলি পূরণের জন্য পদোন্নতি ও মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হলো। এর মানে ICS পরীক্ষা ছাড়াই ভারতীয়দের জন্য আই সি এস ক্যাডারের উচ্চতর পদ লাভের ব্যবস্থা করা হলো। এ সকল উচ্চ পদে আরোহণের জন্য নির্মিত হলো বিরাট এক সিরি। এ এক কঠিন পরীক্ষ্যা। উদাহরণস্বরূপ, প্রার্থী 'ক' চাকরিজীবনের প্রথম ধাপে আরোহণ করলেন সাবর্ডিনেট সিভিল সার্ভিস-এর নিম্নমত ক্যাডারের একটি পদ লাভ করে। তারপর, ঐ সার্ভিসের অন্তর্গত বিভিন্ন ধাপ-উপধাপ তিনি অতিক্রম করলেন কখনো পদোন্নতি, কখনো বিভাগীয় পরীক্ষা, কখনো বা মনোনয়নের এবং অবশেষে লাভ করলেন প্রভিন্সিয়েল সিভিল সার্ভিস-এর সর্বনিম্ন ক্যাডার, এবং আবার প্রভিন্সিয়েল সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ধাপ-উপধাপ কখনো পরীক্ষা, কখনো পদোন্নতি, কখনোবা মনোনয়নের মাধ্যমে অতিক্রম করে করে চাকরিজীবনের

Dhaka University Institutional Repository

শেষ প্রান্তে এসে অবশেষে 'ক' লাভ করলেন সুপিরিয়র সার্ভিসের একটি জুনিয়র ক্যাডার পদ যা কিনা ICS-এর 'স্বর্গসন্তানগণ' অলংকৃত করে থাকেন চাকরিজীবনের যাত্রা থেকেই।

স্বাভাবিক কারণেই সম্প্রসারিত নতুন প্রভিন্সিয়েল সিভিল সার্ভিস-এর জন্য Aitchison Commission সংস্কারের প্রত্যাশা মোতাবেক বধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ কোন অতিরিক্ত 'মর্যাদা ও আকর্ষণ' সৃষ্টি হয়নি। অতএব, সুপিরিয়র সার্ভিস ভারতীয়করণ আন্দোলন প্রশমিত না হয়ে বরং আরো তীব্রতর হলো। সরকারের শিক্ষানীতির ফলে উপমহাদেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা স্নাতকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, কিন্তু নিয়োগনীতির ফলে তাদের জন্য সংখ্যানুপাতে চাকরির সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়নি। ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সন পর্যন্ত স্নাতকের সংখ্যা বেড়েছে পাঁচ গুণ, কিন্তু ঐ সময়ে স্নাতকযোগ্য চাকরির সংখ্যা বেড়েছে মাত্র শতকরা ১২ ভাগ।[৩১] এর বেশির ভাগই Subordinate Service এলাকায়। স্বভাবতই উচ্চ - শিক্ষিতের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ক্ষোভের কারণ উল্লেখ করে ১৯০৩ সালে গোপালকৃষ্ণ গোখলে তাঁর বাজেটবক্তৃতায় মন্তব্য করেন যে, 'ভারতীয়দেরকে সুবিচার প্রদানে মহারাণির ঘোষণা এখন একটি কুহকিনী আশায় পরিণত হয়েছে। ভারতের শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু চাকরির সংখ্যা বাড়ছে না, সুপিরিয়র সার্ভিসের দ্বার তাদের জন্য বলা যায় রুদ্ধ। ফলে শিক্ষিত সমাজে বাড়ছে বঞ্চনাবোধ, আর বঞ্চনাবোধ থেকে ক্ষোভ। এ বঞ্চনা প্রশমনের কোনই লক্ষণ নেই, যেজন্য শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এ ধারণা দানা বাঁধছে যে, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে সুপিরিয়র সার্ভিসে স্থান লাভের কোনই সম্ভাবনা নেই।[৩২]

সিভিল সার্ভিসকে উনিশ শতকে কতটুকু ভারতীয়করণ করা সম্ভব হয়েছে এর বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরা হয় Islington Commission Report (1912-1915)-এ। এ খতিয়ান প্রণয়নের কারণ হচ্ছে সিভিল সার্ভিসকে ভারতীয়করণের প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক জটিলতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন জাতির প্রয়োজন-সমস্যাদি এক মান ও এক ধরনের ছিল না। যেমন, উনিশ শতকে ভারতীয় বলতে হিন্দু এবং ইন্দুর মধ্যে কলকাতা এবং মফস্বলের কতিপয় বিশেষ অঞ্চলের হিন্দু ভদ্রলোক বুঝাতো। সুপিরিয়র সার্ভিসে বাঙ্গালি-বাবুর আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। ভারতীয়করণে প্রাদেশিক সমস্যা ছাড়াও একই প্রদেশে সম্প্রদায়গত প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন ছিল আরো জটিল। সব প্রদেশেই সিভিল সার্ভিসে সংখ্যানুপাতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ছিল অতি অসম ও ভারসাম্যহীন। ১৮৮৮ সালের পাবলিক সার্ভিস কমিশন রিপোর্ট সিভিল সার্ভিস বিতরণে প্রদেশভিত্তিক সাম্প্রদায়িক ভারসাম্যহীনতার এক পরিসংখ্যানিক চিত্র তুলে ধরা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউল্লেখিত কমিশন প্রণীত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সিভিল সার্ভিসকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ভারতীয়করণ করলে সকল প্রদেশে এর বাস্তবায়ন সমভাবে হবে না। জনসংখ্যানুপাতে বাংলা ও আসামে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠ, কিন্তু সিভিল সার্ভিসে হিন্দুদের অংশ বিসদৃশভাবে বেশি। আবার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যায় জনসংখ্যানুপাতে মুসলমানদের অংশ অনেক বেশি। এদের আনুপাতিক অংশ তেমনি বেশি মধ্য প্রদেশ ও হায়দ্রাবাদে। বাংলা, বোম্বাই ও পাঞ্জাব প্রদেশে হিন্দু আধিপত্য সংখ্যানুপাতিক হারে অত্যধিক বেশি। আবার একই প্রদেশের ভেতরে চরম আঞ্চলিক বৈষম্য বিদ্যমান। যেমন, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে বৈষম্য আকাশ-পাতাল। এমনিতরো আঞ্চলিক বৈষম্য ব্রিটিশ ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে বিদ্যমান। অতএব, সরকার মনে করে যে, সিভিল সার্ভিসকে ভারতীয়করণের আগে নীতিমালা তৈরি করা দরকার যেন ভবিষ্যতে সকল প্রদেশ এবং সকল সম্প্রদায় এ থেকে সমভাবে উপকৃত হতে পারে।

মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেই সিভিল সার্ভিসে সংরক্ষণ-মনোয়ন নীতি সুপারিশ করা হয় এবং লী-কমিশনর সে নীতি বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করে। ইন্ডিয়া কাউন্সিল তথা ভারত সরকার সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, অনিয়ন্ত্রিতভাবে সিভিল সার্ভিসকে ব্যাপকভাবে প্রাদেশিকীকরণ এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক করতে পারলে সিভিল সার্ভিস ভারতীয়করণের রাজনৈতিক জটিলতা হ্রাস করা সম্ভব হবে। লী-কমিশন সরকারের এ অনুভূতি বিবেচনায় এনে সিভিল সার্ভিসকে ব্যাপকভাবে প্রদেশিকীকরণের জন্য সুপারিশ করে। এ প্রক্রিয়া একদিকে যেমন প্রদেশবাসীর সমর্থন লাভ করে, অপরদিকে সুপিয়ির সার্ভিস ক্যাডার প্রদেশভুক্ত করায় প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের মর্যাদার বৃদ্ধি পায়।

১৯১৯ সনের ভারত আইনের ও লী-কমিশনের সুপারিশক্রমে সর্বপ্রথম গঠিত হয় ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন (১৯২৬)। কমিশনের দায়িত্ব হয় সংরক্ষিত তালিকার সার্ভিস ছাড়া সুপিরিয়র সার্ভিসের বাকি সকল পদের নিয়োগ, পরীক্ষা গ্রহণ, সিলেবাস তৈরি, চাকরির নিয়মবিধি প্রণয়ন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা। চেয়ারম্যানসহ পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত এ কমিশন সরাসরি সেক্রেটারি অব স্টেট-ইন-কাউন্সিল দ্বারা নিযুক্ত হয় এবং ঐ সংস্থার কাছেই থাকে এর জবাবদিহিতা, ভাইসরয়ের কাছে নয়। কমিশনের এবং সুপিরিয়র সার্ভিসের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য এ ব্যবস্থা। সুপিরিয়র সার্ভিসে নমিনেশনের ব্যাপারে সরকারকে উপদেশ প্রদান থাকে কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠার পর অবসান হলো সিভিল সার্ভিসে সরাসরি সরকার কর্তৃক নিয়োগদানের ক্ষমতার। সিভিল সার্ভিসকে ভারতীয়করণ প্রক্রিয়ায় এ এক বিশাল অগ্রগতি। প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতি প্রদেশে পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের জন্যও লী-

Dhaka University Institutional Repository

কমিশন সুপারিশ করে। কিন্তু মাদ্রাজ ছাড়া অন্য কোন প্রদেশে অনুরূপ কমিশন স্থাপন করা হয়নি। প্রত্যেক প্রদেশে প্রভিন্সিয়েল পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয় ১৯৩৫ সনের ভারত আইন কার্যকর হওয়ার পর। এ আইনের অধীনে ইন্ডিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পুনর্গঠিত করে নতুন নামকরণ করা হয় ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন।[৩৩]

ভারতীয়করণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য লী-কমিশনের সুপারিশক্রমে সুপিরিয়র সার্ভিসকে পৃথক তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যেমন ক. সর্ব ভারতীয়, খ. কেন্দ্রীয় ও গ. প্রাদেশিক। সর্ব ভারতীয় সার্ভিসে নিযুক্ত অফিসারগণ বিভিন্ন প্রদেশের জন্য নিযুক্ত হলেও প্রয়োজনে ভারতের যে-কোন জায়গায় বদলি হতে পারেন এবং এ নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ থাকে সেক্রেটারি অব স্টেট-ইন-কাইন্সিল-এর হাতে। এ শ্রেণীর সার্ভিসের মধ্যে থাকে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস। কেন্দ্রীয় সার্ভিসে থাকে দেশী ও বৈদেশিক বিষয়, যোগাযোগ, কাস্টমস এ্যান্ড অডিট একাউন্টস, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিভাগসমূহ। আর বাকি সব বিভাগ হস্তান্তরিত হয় প্রদেশের নিয়ন্ত্রণে। প্রথম দুই শ্রেণীর সার্ভিস থাকে কেন্দ্রে 'সংরক্ষিত'- (Reserved)[৩৪] আর বাকি সব সার্ভিস বিবেচিত হয় প্রদেশে হস্তান্ত রিত (Transferred) বিষয় হিসেবে। ১৯৩৭ সন পর্যন্ত মাদ্রাজ ছাড়া বাকি সব প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সার্ভিসের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ন্যস্ত থাকে ইন্ডিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উপর। ১৯৩৭ সনের নির্বাচনের পর প্রত্যেক প্রদেশে গঠিত হয় প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস কমিশন যার ফলে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এখতিয়ার থাকে শুধু কেন্দ্রীয় সার্ভিসের উপর।

ভারতীয়করণের পক্ষে ঔপনিবেশিক সরকারের মনোভঙ্গি এমন রাতারাতি পাল্টাবার প্রধান কারণ ব্রিটেন ও ভারতের আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রথম মহাযুদ্ধের অভিঘাত, বিশ্বরাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে পরিবর্তন, কংগ্রেস আন্দোলন, উগ্র জাতীয়তাবাদ, সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি, উচ্চশিক্ষিতের মধ্যে চরম বেকার সমস্যা, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য ব্রিটিশদের আকর্ষণ হ্রাস ইত্যাদি। সন্ত্রাসী তৎপরতার ফলে মফস্বলে শ্বেতাঙ্গদের নিরাপত্তার সমস্যা এমন নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের আগ্রহ আর আগের মত প্রবল ছিল না। এ সময়ে বরঞ্চ British Home Service ও Colonial Civil Service পেশাগতভাবে অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের পুনর্গঠন কর্মসূচিতে অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয় বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রাজুয়েটদের জন্য। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের আকর্ষণ হ্রাসের আরেক বড় কারণ ছিল প্রকৃত বেতনের অবমূল্যায়ন। ১৮৯০-১৯১২ সময়কালে মূল্য বেড়েছে শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ। কিন্তু এ সময়ে বেতন-স্কেলের কোন পরিবর্তন হয়নি। এসব কারণ ছাড়াও ১৯১৯ সনের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পর রাষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনা ক্ষেত্রে যতটুকু ভারতীয়করণ করা হয়েছে আমলাতন্ত্রে অন্তত সমপরিমান ভারতীয়করণ না করে উপায় ছিল না। তবে লী-কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে সুপিরিয়র সার্ভিসে ভারতীয়করণ-প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে প্রত্যাশিত হারের চেয়ে অনেক বেশি। ১৯১৯ সনে ভারতের কোন প্রদেশেই ICSসহ সুপিরিয়র সার্ভিসে ভারতীয় অংশ শতকরা ১৬ ভাগের বিশি ছিল না। অথচ ১৯৩৯ সনে এসে সুপিরিয়র সার্ভিসে ভারতীয় ও ইউরোপীয় অফিসারদের সংখ্যানুপাত হলো ৫০:৫০ এবং অচিরেই ভারতীয়রা প্রায় প্রতি প্রদেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো। সারণি ২.২ তে ১৯৪২ সনের ভারতীয় ও ইউরোপীয় অফিসারদের প্রদেশওয়ারী সংখ্যানুপাত দেখানো হলো।

সারণি-২.২: আই সি এস সুপিরিয়র সার্ভিসে ভারতীয় ও ইউরোপীয় অফিসারদের প্রদেশওয়ারী সংখ্যানুপাত, ১৯৪০

প্রদেশ	ভারতীয়	ইউরোপীয়	মোট
মাদ্রাজ	১০৬	৮১	১৮৭
বোম্বাই	৮৪	৬৬	১৫০
বঙ্গদেশ	১১১	৯৬	২০৭
উত্তর প্রদেশ	১০৯	১০৫	২১৪
পাঞ্জাব	৭৮	১০৩	১৮১
বিহার-উড়িষ্যা	৬৭	৬৩	১৩০
মধ্য প্রদেশ	৪৬	৪৬	৯২
আসাম	১৬	২৫	৪১
মোট	৬১৭	৫৮৫	১২০২

সূত্র: *Government of India Proceedings: Home (Establishments)*, File No. 35/15/42, pp. 4-5 (National Archives of Bangladesh)

সিভিল সার্ভিসের দ্রুত ভারতীয়করণ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা হচ্ছে সুপিরিয়র সার্ভিসের ব্যাপক প্রাদেশিকীকরণ। Aitchison Commission-এর সুপারিশ প্রভিন্সিয়েল সিভিল সার্ভিস ছিল মূলত পূর্বেকার Unconvenanted Civil Service-এরই নতুন নামকরণ এবং আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ নতুন নামকরণের ফলে এ সার্ভিসের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি। কারণ, জাঁকালো নাম দেয়া হলেও এ সার্ভিসে কার্যত কোন নতুন ক্ষমতা লাভ করেনি। উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ কোন বিভাগই এ সার্ভিসের অন্তর্গত হয়নি। লী-কমিশন সংস্কারের ফলে সুপিরিয়র সার্ভিসের সকল হস্তান্তরিত (transferred) বিভাগ প্রভিন্সিয়েল সিভিল সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। অথচ একদা এগুলি ছিল ICS ক্যাডারভুক্ত। ঔপনিবেশিক সরকারের এ পদক্ষেপ প্রাদেশিক পর্যায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও রাজনৈতিক মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এসব হস্তান্তরিত সুপিরিয়র সার্ভিস নতুন প্রতিনিধিত্বশীল সরকারকেও এনে দেয় অতিরিক্তত মর্যাদা।

Dhaka University Institutional Repository

তবে, ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত জেলা প্রশাসনকে প্রভিন্সিয়েল সার্ভিসের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের স্থানিক ভিত্তি ছিল জেলা প্রশাসন। এক কথায়, জনগণের সঙ্গে ঔপনিবেশিক সরকারের একমাত্র যোগসূত্র হচ্ছে জেলা প্রশাসন। রাজনৈতিক কারণে ১৯৩৭ সালে প্রদেশে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের ক্ষেত্রে 'সংরক্ষিত' এবং 'হস্তান্তরিত' সার্ভিস আগের মতো সমন্বিত এবং কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে, অর্থাৎ ১৯১৯ সালের সংস্কারপূর্ব অবস্থায়ই থাকে। ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের খাতিরে জ্যেষ্ঠতা, পদমর্যাদা এবং বেতনের নিরিখে সুপিরিয়র সার্ভিসের অনেক উচ্চপদস্থ অফিসার প্রভিন্সিয়েল সার্ভিসে বর্তমান থাকলেও জেলা বা সাব-ডিভিশনের প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত হয় সাধারণত সেক্রেটারি অব স্টেট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ICS ক্যাডারের অফিসার।[৩৫]

ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র: মূল্যায়ন

ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের বরপুত্র এর আমলাবাহিনী। শাসিত শ্রেণীর চেতনায় আমলারা ছিল ডেপুটি সাহেব, কালেক্টর সাহেব, জজ সাহেব, ছোটলাট বাহাদুর, বড়লাট বাহাদুর। 'সাহেব' আর 'বাহাদুর'গণ ছিলেন গরিবের 'মা-বাপ'। 'হুজুর মা-বাপ'-এর কৃপা লাভের জন্য 'সাওলেরা' করজোড়ে কৃপা চাইতো-"দোহাই হুজুর, দোহাই কোম্পানির, দোহাই মাহারাণির, . . .।[৩৬] এত বড় একটি জনগোষ্ঠীর ঘাড়ে আনুগত্যের জোয়াল চাপিয়ে দু'শত বছর যাবৎ এদেরকে যদৃচ্ছা নিয়ন্ত্রে রাখার জন্য যদি ব্রিটিশ জাতি কাউকে কৃতিত্ব দিতে চায় তবে এর অবিসংবাদিত দাবিদার হবে আমলাতন্ত্র। মূলত আমলাতন্ত্রই ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ধারক-বাহক। এমনতরো ভূমিকা পালন করার উদ্দেশ্যেই কর্নওয়লিস আমলাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ১৭৯৩ সনে।

কর্নওয়ালিস-এর পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনায় ভারতীয়দের অংশীদার রাখার নীতি অনসৃত হয়ে আসছিল, যদিও সীমিতভাবে। বস্তুত সেটা ছিল ব্রিটিশপূর্ব মুগল সরকারের নীতিরই অনুকরণ। কিন্দু কর্নওয়ালিস সে নীতি বর্জন করে শাসক-শাসিতের মধ্যে ব্যবধান টেনে রাষ্ট্র পরিচালনায় শাসিত শ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে দূরে রেখে শাসনযন্ত্রকে সর্বশ্বেতাঙ্গ রাখার নীতি প্রণয়ন করেন এবং সে নীতিই প্রায় অপরিবর্তিভাবে বলবৎ থাকে ১৮৫৪ সন পর্যন্ত। কিন্তু আমলাতন্ত্রে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে ১৮৫৩ সনের চার্টার আইনের মাধ্যমে আইনগত বাধা দূর করা হলেও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আমলাতান্ত্রিক মহলে যে মানসিকতা তৈরি হয়েছিল তা ক্রিয়াশীল থাকে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ অব্দি। আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণ থাকে নামে মাত্র। বিশ্বযুদ্ধ, উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সন্ত্রাস, অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং শাসনতান্ত্রিক সংস্কার

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি কারণে আমলাতন্ত্রের ভারতীয়করণ প্রক্রিয়া নাটকীয় মোড় নিল ১৯২৪ সন থেকে। এ সময় থেকে আই সি এস সহ সকল সুপিরিয়র সার্ভিসে ভারতীয়দের রিক্রুটমেন্ট এমন বাড়তে থাকে যে, ১৯৪০ সনের মধ্যে আমলাতন্ত্রে ভারতীয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রুপে পরিণত হলো। পরবর্তী ছয় বছরে ভারতীয়করণ আরো গতি অর্জন করলো যার ফলে ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই সহজেই প্রশাসনিকভাবে স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের সংকট কাটিয়ে উঠতে সহজেই সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে বর্ধিত আকারে, নানান শ্রেণী এবং বিভিন্ন বৃত্তির (Functional) ও বিশেষজ্ঞ (Specialist) গোষ্ঠী বিভক্তিতে গড়ে উঠা ভারতীয় আমলাতন্ত্রে সৃষ্টি হয়েছে নানান বিভাজন। সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন গ্রুপ প্রতিনিধিত্ব করেছে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর। লন্ডনে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গ সিভিল সার্ভেন্টরা ছিল বিঘোষিতভাবে বর্ণবাদী এবং ভারতীয় সহকর্মীদের প্রতি উন্নাসিক, ঈর্ষা-দ্বেষপূর্ণ। Statutary Civil Service এবং প্রাদেশিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক মনোনীত সিভিল সার্ভেন্টদের প্রতি এমন কি ভারতীয় অন্যান্য সিভিল সার্ভেন্টদেরও ছিল বিদ্রুপপূর্ণ মনোভাব। এটা কারো অজানা ছিল না যে, মনোনীত সিভিল সার্ভেন্টরা ছিল ব্রিটিশ আনুগত্য, আভিজাত্য ও অদক্ষতার প্রতীক। শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গ সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল শাসক-শাসিতের মতো। পৃষ্ঠপোষকতার দ্বার দিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে অধিকাংশ মুসলমান কর্মকর্তা। তাদের প্রতি ব্রিটিশ উর্দ্ধতন সিভিল সার্ভেন্টদের ছিল করুণা আর হিন্দু সিভিল সার্ভেন্টদের ছিল বিদ্বেষ। প্রাদিশিক সিভিল সার্ভিস থেকে পদোন্নতি বা মনোনয়ন নিয়ে কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসে আগত সিভিল সার্ভেন্টরা সামাজিকভাবে কখনো কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভেন্টদের নিকট থেকে সমমর্যাদা পায় নি। তেমনি ছিল উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে সম্পর্ক। এমনতাবস্থায় সিভিল সার্ভিসে esprit de corps বা পেশাগত সংহতি তৈরি হওয়া ছিল এক অযৌক্তিক প্রত্যাশা। তবে সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের প্রতিবেদনে সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব বিষায়ক কোন সমস্যার কথা কোনভাবেই উল্লিখিত হয় নি। হয়তো বা এই সমস্যাটি শ্রেণীগত অন্যান্য জটিল সমস্যাদির কারণে পর্যবেক্ষকদের অনুশীলনে স্থান পায় নি।

সে যাই হোক, স্বীকার করতেই হবে আদর্শ আমলাতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ব্রিটিশ ভারতের আমলাতন্ত্রে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। সেটি হচ্ছে সরকারী কার্যক্রমের যথাযথ দলিল তৈরি ও রেকর্ড সংরক্ষণ। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের, বিশেষ করে যেসব বিষয়ে রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত ছিল সেসব বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ দলিল তৈরি করা হয়েছে এবং এগুলি তাৎক্ষণিক এবং ভবিষৎ রেফারেন্সের জন্য সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিটি বিভাগ ও সিরিজের নামে কালানুক্রমে সাজিয়ে দলিল সংরক্ষিত হয়েছে।[৩৭] সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারও দলিলিত করার একটি কারণ ছিল

Dhaka University Institutional Repository

লন্ডন ইন্ডিয়া অফিস থেকে ভারত শাসন ব্যবস্থা। কোম্পানির শাসন পর্যন্ত এক টাকা খরচ বা এক টাকা আয় করার প্রস্তাব রাখলেও তা কর্যকর করতে কোর্ট অব ডাইওেক্টার্স-এর অনুমোদন নেবার প্রয়োজন ছিল। ইন্ডিয়া অফিসের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়াও কোন ব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত, নীতি, আয়-ব্যয় সম্পর্কে আগের এবং পরের সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে যেন কোন রকম ভুল বুঝাবুঝির বালাই না থাকে সেজন্য সকল রকম প্রাসঙ্গিক দলিল মোহাফেজখানায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

উপসংহারে আমরা কতিপয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। প্রথমত, পৃষ্ঠপোষকতা আমলের সিভিল সার্ভিস আর প্রতিযোগিতা আমলের সিভিল সার্ভিস ছিল ভিন্ন ধরনের। কোম্পানি আমলে সিভিল সার্ভিসের রিক্রুটমেন্ট ছিল সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতার উপর ভিত্তি করে। ১৮৫৪ সন থেকে মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে রিক্রুটমেন্ট শুরু হলেও ভিন্নরূপে পৃষ্ঠপোষকতা টিকে থাকে। রিক্রুটমেন্ট-এর সময় প্রতিযোগিতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল মনোনয়ন, স্টেটুটরি সিভিল সার্ভিস, সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক হিস্যা, ১৯২২ থেকে আলাদাভাবে এলাহাবাদ ও লন্ডনে আই সি এস পরীক্ষা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, নানা উৎস থেকে এবং নানা নিয়মের অধীনে সিভিল সার্ভিসের রিক্রুটমেন্ট হওয়ায় এ সার্ভিসে কোন সময়ই অন্যান্য আদর্শ আমলাতন্ত্রের মতো *esprit de corps* গড়ে উঠতে পারেনি। সিভিল সার্ভিসের ভেতরে শ্বেতাঙ্গ-অশ্বেতাঙ্গ, হিন্দু-মুসলমান, ভারতীয় ও প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস প্রভৃতি প্রশ্ন আমলাতান্ত্রিক সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ফলে ভাইসরয় সিভিল সার্ভিস সমাজ আধুনিক আমলাতন্ত্রের মতো শক্তিশালী পেশাদার সংগঠনে রূপান্তরিত না হয়ে অভ্যন্তরীণভাবে নানা স্বার্থগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শ্বেতাঙ্গ সিভিল সার্ভেন্টদের নিকট ভারতীয় সিভিল সার্ভেন্টরা ছিল অপাঙক্তেয় আর ভারতীয় হিন্দু সিভিল সার্ভেন্টদের চোখে উপহাস্য ছিল মুসলমান মনোনীতরা। তৃতীয়ত, ঔপনিবেশিক কারণে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসকে সর্বাংশে না হলেও প্রধানত শ্বেতাঙ্গ রাখার নীতি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকে। যুদ্ধোত্তরকালের পরিবর্তিত আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সিভিল সার্ভিসকে হঠাৎ করে ভারতীয়করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু সে ভারতীয়করণ নীতি বাস্তবায়িত হয়েছে অতিশয় বক্র ও বিকৃতভাবে। অনেক কেন্দ্রীয় ক্যাডার প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে হস্তান্তর করে এবং প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের ক্ষমতা-পরিধি আমূল সংস্কার করে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসকে ব্যাপকভাবে ভারতীয়করণ করা হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস এর সনাতন আধিপত্য হারিয়ে ফেলে। ১৯৩৫-এর শাসনতন্ত্রে প্রদেশে গণ-প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রবর্তিত হওয়ায় প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস প্রদেশ-পর্যায়ে আধিপত্য বিস্তার করে। এ পরিবর্তনটি এত দ্রুত এত অল্প সময়ের মধ্যে সাধিত হয়েছে যে, এর ফলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ভাবমূর্তি প্রাদেশিক পর্যায়ে প্রচণ্ডভাবে ম্লান হয়। অনেকের ধারণা, এর ফলে সিভিল সার্ভিসের সনাতন দক্ষতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সবশেষে ঔপনিবেশিক কারণে ব্রিটিশ

Dhaka University Institutional Repository

সরকার সচেতনভাবে ভারতীয় আমলাতন্ত্রকে একটি দুর্লঙ্ঘ্য-দুর্নিবার সংগঠনে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল। এ চেষ্টায় সরকার সফল হয়েছে। তবে এর জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হয়েছে। কোম্পানি আমল পর্যন্ত নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আমলাদের মধ্যে নিজস্ব উদ্যোগ ও কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রাজ আমলে এসে সিভিল সার্ভিস ক্রমশ গতিহীন, গতানুগতিক ও নিয়ম-নিগুড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আমলাতন্ত্র একটি আড়ষ্ট, নিষ্প্রাণ যন্ত্রে পরিণত হয়।

তথ্যনির্দেশ

১। দেখুন, J. Bradshow, *Sir Thomas Munro* (Oxford, 1894), pp. 181-82।

২। Reginald Coupland, *Britain and India* (London, 1941), p. 37।

৩। প্রগুপ্ত। পৃ: ৩।

৪। The Charter Act of 1833, Clanse 871।

৫। L.S.S. O'Malley, *The Indian Cidvil service* (London: John Murray, 1931), pp. 1-2.

৬। K.L. Panjabi, *The Civil Servant in India* (Bombay: Bharatiya Vidya Bhaban, 1965), pp 343-44

৭। Sir W.W. Hunter, *A History of British India* (London, 1899) vol.1 p.250.

৮। Sir Ddward Blunt, *The ICS* (London: Faber and Faber Ltd., 1931), pp. 8-10.

৫। ১৮৫৪ সন পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তারা নিযুক্ত হতো কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সের ব্যক্তিগত সুপারিশের ভিত্তিতে। ১৮৫৩ সনের চার্টার আইনে কোর্টের এ সুবিধা বিলুপ্ত করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্যাডেট নিয়োগের ব্যবস্থা চালু হলে চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তার নতুন ক্যাডেটদের কম্পিটিশনওয়ালা বলে আখ্যাত করে। দ্রষ্টব্য, George Trevelyan. The Competition Wallah. (London. 1864, First published)।

৬। আঠারো শতকের শেষ অব্দি সঙ্গে পরিবার রাখা ছিল ইউরোপীয়দের মধ্যে বিরল ব্যাপার। কর্মচারী-কর্মকর্তারা এবং কোম্পানির নাবিকরা মেসেই থাকতো। বর্তমানের মতো তখন হোটেল, গেষ্ট হাউজ ছিল না বিধায় এদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হতো মেসে। সরকার স্থাপিত মেস পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হতো সরকার বা মেস ম্যানেজার।

৭। নির্দিষ্ট বেতনক্রম এবং পর্যাপ্ত বেতন আধুনিক আমলাতন্ত্রের একটি শর্ত। আমলাদের উচ্চ বেতন প্রদান করা হয়। এত উচ্চ যে, বেন্টিংকে প্রশাসনের সময় আর্থিক কারণে ঐ বেতন-হার অনেক হ্রাস করা হয়। বিশ শতকের প্রথম সিকিতে এসে একজন আন্ডার সেক্রেটারি বেতন পেতেন ১৩০০ টাকা, আর সেক্রেটারি পেতেন ৪০০০ টাকা। অথচ কর্নওয়ালিস একজন জেলা কালেক্টরের বেতন নির্ধারণ করেন ন্যূনপক্ষে ২৫০০ টাকা, এবং জেলা জজের বেতন ৩০০০ টাকা।

৮। ১৭৯৩ সনের চার্টার আইনের সার্ভিস সংক্রান্ত ধারাগুলি হচ্ছে S.56.57.60।

৯। একটি মজার ব্যাপার এই যে, যদিও বাংলা ছিল তখনকার ব্রিটেনের সর্ববৃহৎ উপনিবেশ, কিন্তু এ রাজ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ জনমত ছিল খুবই অনুৎসক। কোম্পানি আমলে এ রাজ্য নিয়ে কিছুটা তর্ক-বিতর্ক হতো যখন বিশ বছর পরপর কোম্পানির চার্টার আইন নবায়ন হতো। অবাধ বাণিজ্য সমর্থকরা ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য সুবিধার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করতো। কোম্পানি আমলে মাত্র দুবার ভারত বিষয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গুরুত্ব লাভ করেছে: একবার ওয়ারেন হেস্টিংসকে পার্লামেন্টে বিচারের (Impeachment) সময়, আবার সিপাহী বিদ্রোহের সময়। কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনাকালেও পার্লামেন্টে উপস্থিতি ছিল সর্বনিম্ন অর্থাৎ মাত্র কোরামের কাছাকাছি। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের বাইরে ভারত ছিল অন্যান্য ব্রিটিশদের কাছে এক অজানা ব্যাপার এবং একে জানার আগ্রহ ছিল তাদের কম। ভারতে ব্যবসা ও চাকরিকে কেন্দ্র করে ব্রিটেনে একটি উচ্চস্বার্থশ্রেণী গড়ে উঠেছিল। ঐ স্বার্থশ্রেণীর বাইরে ভারত বিষয়ে ব্রিটিশরা ছিল বরাবরই উদাসীন।

Dhaka University Institutional Repository

১০। Covenanted Civil Service-এর জন্য মনোনীত প্রার্থীকে বলা হতো রাইটার। রাইটার হিসেবে এরা প্রথম যোগদান করতো কোম্পানির সিভিল সার্ভিসে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, চার পদ-স্তর বিশিষ্ট Covenanted Civil Service কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত রাইটার পদ-স্তর-এর উপরে অপর তিনটি স্তরে বিন্যস্ত পদসমূহ আসীন কর্মকর্তাদেরকে বলা হতো - যথাক্রমে Factors, Junior Merchants এবং Senior Merchants । এই তিন স্তর-এর পদসমূহ সাধারণত সার্ভিস কাঠামোর ভিতর হতেই পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হত। তবে কোম্পানির প্রথম অবস্থায় ১৬৯৪ সন পর্যন্ত রাইটার পদ-স্তর-এর নিম্নে 'শিক্ষানবিশ' বা 'Apprentice' পদ সম্বলিত আরেকটি স্তর ছিল। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, B.B. Misra, *The Bureaucracy in India: An Historical Analysis of Development up to 1947* (Delhi, 1977), pp. 41-43; M.A. Choudhuri, *The Civil Service in Pakistan* (Dacca: NIPA, 1969) p. 2.

১১। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলা, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার হিসেবে সম্পদ অর্জন করে অনেকেই পরে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। তাছাড়া কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার জন্য অনেক পার্লামেন্ট-সদস্যকে কোম্পানি আর্থিক বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে, বিশেষ করে ভারতে এদের পোষ্যদের চাকরি দিয়ে প্রতিপালক বানাতো। তারা সবাই ছিল পার্লামেন্টের ভেতরে কোম্পানির সমর্থক। কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে তারা ছিল সদা সোচ্চার।

১২। নির্বাচনী বোর্ড গঠিত হয় বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে, যথা, বোর্ড অব কন্ট্রোল, কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স, হেলিব্যারি কলেজ।

১৩। B.B. Misra. *The Bureaucracy in India: An Historical Analysis of Development upto 1974*, (Delhi, 1980, second edition), p. 67.

১৪। হেলিব্যারি কলেজ, বিশেষ করে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে এর অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, Charles Danvers, et al., *Memorials of Old Hallebury College,* (London, 1894).

১৫। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন T.B. Macaulay (Chairman), Ashburton, Henry Melvill. Benjamin Jowett. John George Shaw Lefevre। কমিটি রিপোর্ট প্রদান করে ১৮৫৪ সনের নভেম্বরে। পূর্ণ রিপোর্ট-এর জন্য দ্রষ্টব্য, Parliamentary Papers (HC), No. 34 of 1855।

১৬। Aitchison Commission-এর সুপারিশক্রমে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে *Covenanted Civil Service*-এর নামকরণ করা হয় *Indian Civil Service (ICS)* ১৮৬৭ সনে।

১৭। ১৮৫৯ সনে বিভিন্ন বিষয়ের নম্বর বিভাজনে কিছু পরিবর্তন করা হয়। গণিত বিষয়ে নম্বর ১০০০-এর স্থলে করা হয় ১২৫০, আর সংস্কৃত এবং আরবি বিষয়ে ৩৭৫-এর স্থলে করা হয় ৫০০ করে। তখন থেকে সর্বমোট পরীক্ষা-নম্বর হয় ৭৩৭৫।

১৮। A.C. Banerjee (ed.), *Indian Constitutional Documents*, Vo. 1, p. 256; also cited in Anuradha Chanda, *Public Administration and Public Opinion in Bengal* (1854-4885), (Calcutta 1986), p. 30।

১৯। দাবিনামাটি দীর্ঘ এবং এর মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের মানবসম্পদ যে কিভাবে পদদলিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে এ সম্পর্কে চমৎকার বিবরণ রয়েছে। দাবিনামাটি পার্লামেন্টের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছাপা হয়। দ্রষ্টব্য, Parliamentary Papers, House of Commons, Vol. 27 (1852-1853) ।

২০। Anuradha Chanda, *Public Administration and Public Opinion inBengal 1854-1885* (Calcutta, 1986), pp. 30-32।

২১। Macaulay Committee Reprot in Parliamentary Paper (HC). No. 34 of 1855, p. 9। উল্লেখ্য, একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস সংস্কারের উদ্দেশ্যে Northcote-Trevelyan Report (1853)। ঐ রিপোর্টের বলা হয় সিভিল সার্ভিস হবে এমন একটি পেশা যা গ্রহণের জন্য তৈরি করা হয়। উভয় কমিটির দর্শন ছিল এই যে, সিভিল সার্ভিস হবে একটি সম্মানজনক পেশা এবং ঐ পেশার সদস্যদের হতে হবে বিদ্বান, বিদগ্ধ, মননশীল। এদের কাজ হবে একটি সম্মানজনক পেশা এবং চিন্তামূলক কাজগুলো সম্পাদন করা। এর জন্য থাকা চাই ক্লাসিকেল সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় যা শুধু অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের ছাত্রদেরই আছে। এ ধরনের আভিজাত্যিক শ্রেণীভিত্তিক মনোভাব তখন আস্বাভাবিক কিছু ছিল না। সমকালীন ব্রিটিশ সমাজ ব্রিটিশ পাবলিক স্কুল ও অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের ছাত্রদের মানসিক ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছিল।

২২। Report of the Royal (Islington) Commission on Public Services in India, 1913-16, Appendix Vol. IX, pp. 252-3; B.B. Misra, *The Bureaucracy in India, An Historical Analysis of Development upto 1947* (New Delhi, 1977), pp. 101-102।

Dhaka University Institutional Repository

২৩। প্রথম থেকেই ভারতীয় জনমত দাবি করে আসছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা একযোগে ইংল্যান্ড ও ভারতে অনুষ্ঠান করার জন্য। সে দাবি কখনো মানা হয়নি। ১৯২২ সন থেকে ভারতে আলাদা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করা হয়, একযোগ নয়। পরীক্ষার সিলেবাস ও প্রশ্ন ছিল আলাদা। অনেক ভারতীয় পরীক্ষার্থী স্বদেশে পরীক্ষা না দিয়ে লন্ডন গিয়ে পরীক্ষা দিত, কারণ তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ব্রিটেনে গিয়ে পরীক্ষা দিলে একদিকে যেমন সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি অপরদিকে সামাজিক সম্মানও বেশি।

২৪। Government of India Proceedings: Home Department (Ests.). File No. 30/39 of 1939, pp. 36-37 (Bangladesh National Archives)।

২৫। ১৮২০-এর দশক থেকে অর্ধবর্ণ (দেশী মাতা ও শ্বেতাঙ্গ পিতার সন্তানদি) এবং এদেশে বসবাসকারী এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরাও এ সার্ভিসে নিযুক্ত হতে থাকে। বেন্টিংক প্রশাসনামলে মফস্বলে ইউরোপীয়দের বসবাস ও বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়া হলে সার্ভিসের উচ্চ পদগুলি অর্থাৎ যেসব পদের বেতন ১৫০ টাকার উর্ধে সেসব পদের বেশিরভাগই শ্বেতাঙ্গদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এ প্রবণতা চলে উনিশ শতকের সত্তরের দশক পর্যন্ত। রেলওয়ে ও স্টিমার সার্ভিস প্রসারিত হবার পর এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও অর্ধবর্ণরা অচুক্তিবদ্ধ সার্ভিস থেকে সরে যায় উচ্চ বেতনের যোগাযোগ সার্ভিসে।

২৬। মুন্সেফ-এর বেতন ছিল না। মুন্সেফ আদালতের ব্যয়ভারও সরকার বহন করতো না। মুন্সেফ এজলাসে দায়েরকৃত মামলার কোর্ট ফি থেকে আদালতের যাবতীয় খরচ বাদে যদি কোন উদ্বৃত্ত থাকতো সেটাই হতো মুন্সেফের আয়।

২৭। Queen Victoria's Proclamation, 1 November, 1858, quoted in Philips, *Evolution*, p. 11।

২৮। অবশ্যই এজন্য যে, মুক্ত প্রতিযোগিতায় ভারতীয়রা অধিক সংখ্যক সিভিল সার্ভিসে অনুপ্রবেশ করলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

২৯। কমিশনের সদস্য পনর। পাঞ্জাবের লেঃ গভর্নর Sir Charles Aitchison চেয়ারম্যান। ছয়জন সদস্য ভারতীয়। কমিশন রিপোর্ট প্রদান করে ১৮৮৭ সনের ২৩ ডিসেম্বরে।

৩০। Aitchison Commission-এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ সরকারি পদ লাভ করলে ভদ্রলোক শ্রেণীর ICS ভারতীয়করণ দাবি তীব্রতা হারাবে। ICS-কে একটি শ্বেতাঙ্গ এ্যালিট ক্লাব হিসেবে অক্ষুণ্ন রাখা ব্রিটিশদের জন্য ছিল একটি রাজনৈতিক প্রয়োজন। তবুও এ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথেষ্ট অগ্রসর, কেননা পূর্বে নিম্নপদগুলিও ভারতীয়দের প্রদান করতে তাদের আপত্তি ছিল।

৩১। B.B. Misra, *The Administrative History of India 1834-1947* (New Delhi 1970) p. 227।

৩২। Parliamentary Papers, No. 57 (167) of 1905-6, p. 187, quoted in B. B. Misra, *Administrative History*, p. 231।

৩৩। ব্রিটিশ ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পিএসসি-এর প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা ও কার্যক্রম সম্পূর্ণ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Syed Giusuddin Ahmed, *Bangladesh Public Service Commission* (Dhaka, 1990), pp. 25-47।

৩৪। কেন্দ্রীয় সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ ভারত সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকলেও সেক্রেটারি অব স্টেটের ক্ষমতা থাকে এ সার্ভিসের সার্বিক প্রশাসন, নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা ব্যাপারে প্রয়োজনে পরামর্শ দেয়া। বলাই বাহুল্য, সেক্রেটারি অব স্টেটের 'পরামর্শ' মানে নির্দেশ।

৩৫। জেলা প্রশাসনের বিকাশ ও বিবর্তনধারার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, B.B. Misra, 'Evolution of the Office of Collector', *Journal of Indian Public Adminstration*, July-September, 1965।

৩৬। দোহাই হুজুর, হুজুর মা-বাপ, গরিব সাওয়াল, সাহেব, লাট বাহাদুর, জয় মহারাণী, প্রভৃতি আকুতি ও আনুগত্যমূলক শব্দ দিয়ে সমকালীন সরকারী দলিলদস্তাবেজ ছিল ভরপুর। সমকালীন সাহিত্যেও এর প্রতিফলন ঘটেছে।

৩৭। See for details, M. Moir, *A General Guide to the India Office Records*, (The British Library, 1988)।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস
(১৯৪৭-১৯৭১)

ভূমিকা

১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট ব্রিটিশ ভারত দুটি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেয়। এ রাষ্ট্র দুটি হলো পাকিস্তান ও ভারত। দেশ বিভাগের পর ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে সিভিল সার্ভিসসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে যে কোন একটি রাষ্ট্রে যোগ দেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়। অধিকাংশ মুসলমান চাকুরিজীবীরা পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকরি করতে ইচছা প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ ও ইউরোপবাসী চাকুরেদের অধিকাংশই অপরিণত অবস্থায় অবসর গ্রহণ করলেন। পাকিস্তান সরকার বিশেষ করে উচচপদস্থ ব্রিটিশ আইসিএস অফিসারদেরকে নিয়োগ করার প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করেন। কেননা পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ উর্ধ্বতন প্রশাসকের সংখ্যা খুব নগণ্য ছিল। পাকিস্তান সরকারের অনুরোধে কয়েকজন ব্রিটিশ আইসিএস অফিসার পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ ভারতের সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস - যথা, Indian Civil Service সাবেক পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস বা 'Civil Service of Pakistan' (সিএসপি) নামে পরিচিতি লাভ করে।

ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া সম্ভবত সবচেয়ে সুরপনেয় যে চিহ্নটি পাকিস্তানী প্রশাসকদের মধ্যে কার্যকরভাবে উপস্থিত ছিল, তা হচ্ছে বিশেষ করে প্রশাসনের একেবারে উচচ পর্যায়ে কর্মরত সিএসপি অফিসাদের ক্ষেত্রে তাদের মন-মানসিকতা। স্বভাবের দিক থেকে এরা হয়ে উঠেছিল অহঙ্কারী, জটিল মনোভাবাপন্ন এবং উন্নাসিক। একজন বিশিষ্ট পর্যবেক্ষক এই সিএসপিদেরই পূর্বসূরি আইসিএস অফিসারদেরকে প্লেটোর "আদর্শ রাষ্ট্রের" গার্জিয়ান ক্লাস-এর সাথে তুলনা করেছেন।[১] ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিনিধি হিসেবে এই আইসিএস অফিসাররা পুরো উপমহাদেশকে যেভাবে কব্জা করে রেখেছিলেন, তাতে তাদেরকে কখনো কখনো বিশাল সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের "স্টিল ফ্রেম" হিসেবেও অভিহিত করা হতো। সিএসপিদের ক্ষেত্রেও এই অভিধাটি মাঝেমধ্যে ব্যবহার করা হতো, কেননা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সার্বিক প্রশাসনিক কাঠামো পাকিস্তানের এই ক্যাডারভুক্ত অফিসারদের প্রশাসনিক ক্ষমতাবলয়ের আওতাধীন ছিল। "গার্জিয়ানশীপ"-এর সমপর্যায়েই এই এলিট সিএসপি অফিসাররা সাধারণ মানুষেদের থেকে একটা দূরত্ব বজায় রাখতেন। তবে এ কথা বলা মোটেই ঠিক হবে না যে, এসব এলিট প্রশাসকদের সকলেরই মধ্যে জনস্বার্থে কাজ করার ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে দায়িত্বশীলতার অভাব ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগপূর্ব সময়ের মতোই পাকিস্তান আমলেও প্রতিশ্রুতিশীল তরুণেরা আইসিএস-এর আদলে প্রতিষ্ঠিত সিএসপিতে যোগ দেয়ার ব্যাপারে অতীব উৎসাহী ছিল।[২]

১৯৫৫ সলের অক্টোবরে পশ্চিম পাকিস্তানকে একক একটি প্রাদেশিক প্রশাসনের আওতায় আনার আগ পর্যন্ত ফেডারেল পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোটি বিক্ষিপ্ত কয়েকটি প্রশাসনিক ইউনিটে জটিলভাবে বিন্যস্ত ছিল। পূর্ব অংশে পূর্ববঙ্গকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল গভর্নরশাসিত একক একটি প্রদেশ। আর পশ্চিম অংশে ছিল তিনজন গর্ভনরশাসিত তিনটি প্রদেশ, যথা (পশ্চিম) পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (এনডব্লিউএফপি)। সেই সাথে ছিল (ব্রিটিশ) বালুচিস্তান, দি বালুচিস্তান স্টেটস (খালাত, লাসবেলা, মাকরান এবং খারানকে নিয়ে একত্রে গঠিত হয়েছিল বালুচিস্তান স্টেটস্ ইউনিয়ন), দি এনডব্লিউএফপি স্টেটস্ (দার, আম্ব, সোয়াত এবং চিত্রল), সীমান্ত উপজাতীয় অঞ্চল, করাচির ফেডারেল রাজধানী এলাকা এবং খায়েরপুর ও বহওয়ালপুরের প্রিন্সলি স্টেটস্। ১৯৫৬ সালের আগ পর্যন্ত গভর্নর শাসিত প্রদেশগুলি ১৯৩৫ সালের অভিযোজিত ভারত শাসন আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের আওতায় পরিচালিত হতো। এবং এসব প্রদেশের শাসনপদ্ধতি মোটামুটিভাবে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের মতোই ছিল। প্রিন্সলি স্টেটগুলির অবস্থা ছিল একেবারে প্রায় একনায়কতান্ত্রিক শাসন থেকে গভর্নরের শাসনপদ্ধিতির কাছাকাছি পর্যায়ের। অন্যদিকে বালুচিস্তান, করাচি এবং উপজাতীয় অঞ্চলসমূহ শাসিত হতো কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এজেন্টদের মাধ্যমে। গভর্নর শাসিত তিনটি প্রদেশ, প্রিন্সলি স্টেটগুলো এবং উপজাতীয় অঞ্চলসমূহ একক একটি প্রদেশের আওতায় এসে পশ্চিম পাকিস্তান (লাহোর এর নতুন রাজধানী স্থাপিত হল) নাম ধারন করলো। তখন থেকে পূর্ববঙ্গও হলো পূর্ব পাকিস্তান (আগের মতই এর রাজধানী থেকে গেল ঢাকা)।

ভূকিমার অংশটি ছাড়াও এ অধ্যায়টি তিনটি প্রধান অংশে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পরবর্তী অর্থাৎ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে মূলত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত সভিল সার্ভিস ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো ও এ কাঠামো অন্তর্গত সাধরণজ্ঞ সিভিল সার্ভিস ক্যাডার বা Civil Service of Pakistan (সিএসপি) সম্পর্কিত আলোচনা উপাস্থিত হয়েছে। বিশেষ করে সিএসপি-এর গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী সম্পর্কিত প্রসংগগুলি আলোচনায় স্থান পেয়েছে। তৃতীয় অংশে প্রদেশিক পর্যায়ে বিশেষ করে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে গঠিত সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থায় প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরিশেষে, চতুর্থ অংশে আইসিএসদের উত্তরসরি পাকিস্তানের সিএসপিদের ক্ষমতা বলয় ও জীবনযাত্রার ধরন মূল্যায়ন সহকারে অধ্যায়টির উপসংহার টানা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত সিভিল সার্ভিস

পাকিস্তানে 'সিএসপি'ই একমাত্র সিভিল সার্ভিস ছিল না বা এমনও নয় যে গুরুত্বপূর্ণ সবগুলো প্রশাসনিক পদে এই সার্ভিসেরই একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। সবগুলো সুপিরিয়র সার্ভিসকে নিয়ে একত্রে যে কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসেস (Central Superior Services) গঠিত হয়েছিল এটি ছিল তারই অন্যতম। মর্যাদার বিচারে শীর্ষে অবস্থিত সিএসপি এবং সর্বনিম্নে অবস্থানকারী কেন্দ্রীয় সচিবালয় সার্ভিস বা সিএসএস জাতীয় সর্বমোট সতেরোটি সার্ভিস ছিল[৩] (সারণি ৩.১ দ্রষ্টব্য)। এই সার্ভিসগুলোকে কেন 'সুপিরিয়র' সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা হতো একটি সরকারি পুস্তিকায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে: "সার্ভিসগুলোকে সুপিরিয়র হিসেবে গণ্য করা হয় এই কারণে যে, মর্যাদার দিক থেকে এগুলোর চেয়ে নিম্নতর আরো অনেক সার্ভিস রয়েছে। সুপিরিয়র সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সিভিল সার্ভেন্টের অধীনে আরো শতশত লোক কর্মরত রয়েছে, যাদের কেউই সুপিরিয়র সার্ভিসের সদস্য নয়। এই বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সরাসরি সুপিরিয়র সার্ভিসের উপর ন্যস্ত"।[৪]

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সুপিরিয়র সার্ভিসগুলোর মধ্যে সিএসপিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একই পুস্তিকায় এই সার্ভিস সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলা হয়েছে, 'পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পাকিস্তানে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বা আইসিএস-এরই উত্তরসূরি। এটি ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সিভিল সার্ভিস'।[৫]

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সাংগঠনিক কাঠামোটি ছিল অনমনীয় এবং জটিল। বিশেষ করে উপরের দিকের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোটি কাজের ধরন বা ক্যাডারের ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল। এখানে আন্তঃক্যাডার মেধা প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ ছিল খুবই কম। আসলে এটি ছিল ভারতে বৃটিশ শাসন পরিচালনার লক্ষ্যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে একটি প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার লাগাতার কৌশলেরই ফসল।[৬] উপরের স্তরের আমলাতন্ত্রে কাজের ধরনের ভিত্তিতে বিন্যস্ত ক্যাডার ব্যবস্থা ছাড়াও পদের শ্রেণীগত (১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী, ৩য় শ্রেণী এবং ৪র্থ শ্রেণী) এবং স্থানগত (নিখিল পাকিস্তান, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক) বিভাজন রীতিও চালু ছিল। এই ব্যবস্থাকে অনেকেই একদিকে প্রশাসনের মধ্যে একটি সার্ভিসকৌলীন্য ও আন্ত-সার্ভিস বিরোধের জন্মদান এবং অন্যদিকে প্রশাসনকে কেন্দ্রভূত করে তোলার জন্যে দায়ী করে থাকেন।[৭] পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান তিন ধরনের ১ম শ্রেণীর চাকরির মধ্যে সর্বপ্রথমেই ছিল সেইসব পদ, যেগুলো আইনের ভিত্তিতে গঠিত একটি সার্ভিস বা ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত থাকতো। দ্বিতীয়ত, এমন কিছু চাকরি ছিল, যেগুলো নিয়মিত কোন সার্ভিস বা ক্যাডারের অন্তর্গত নয়। এগুলো ছিল বিশেষ কিছু পেশাদার গোষ্ঠী, যেমন-অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, উপ/সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা, পরিকল্পনা

Dhaka University Institutional Repository

কমিশনের উপ/সহকারী উপদেষ্টার পদ। তৃতীয়ত, আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়সমূহ, যথা - অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জন্যে ১৩০টি পদের একটি ইকনোমিক পুল (Economic Pool) ব্যবস্থাও চালু ছিল।[৮]

সারণি -৩.১: সতেরোটি কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসের তালিকা

1.	Civil Service of Pakistan
2.	Pakistan Foreign Service
3.	Police Service of Pakistan
4.	Pakistan Audit and Accounts Service
5.	Pakistan Military Accounts Service
6.	Pakistan Taxation Service
7.	Pakistan Railway Accounts Service
8.	Pakistan Customs and Excise Service
9.	Central Engineering Service
10.	Telegraph Engineering Service
11.	Post and Telegraph Traffic Service
12.	Pakistan Postal Service
13.	Pakistan Military Lands and Cantonments Service
14.	Central Information Service
15.	Trade Service of Pakistan
16.	Geological Survey of Pakistan
17.	Central Secretariat Service

সূত্র: Government of Pakistan, *Report of the Working Group on the Reorganization of the Public Service Structure in Pakistan* (Chaiarman, D.K. Power), (Karachi 1969), p. 138.

প্রথম ধরনের পদগুলোর জন্যে নিয়মিত ভিত্তিতে সতেরোটি সার্ভিস বা ক্যাডার ব্যবস্থা চালু ছিল, যা সারণি-৩.১তে দেখানো হয়েছে। এই সতেরোটির মধ্যেকার বিভাজন তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই সতেরোটি ক্যাডারে লোক নিয়োগ করা হতো। প্রতিটি ক্যাডারব্যবস্থাই ছিল আলাদা।[৯] এগুলোর সাথেই যুক্ত করা হয়েছিল ছোট আকারের আরো একটি ক্যাডার। জেনারেল এডমিনিস্ট্রেটিভ রিজার্ভ বা General Administrative Reserve (জিএআর) নামের এই ক্যাডারটিতে বিভাগ পরবর্তীকালে পাকিস্তানে আইসিএস অফিসারদের

Dhaka University Institutional Repository

স্বল্পতাজনিত সমস্যা মোকাবিলা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সার্ভিস বা ডিপার্টমেন্ট থেকে সংগৃহীত কিছু সংখ্যক কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।[১০] এই সবের বাইরে উল্লেখ করার মতো খুব সামান্য কিছু ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ ছিল, যারা পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল। এদের মধ্যে ছিল বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সরবরাহ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা; কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও পেশাদার কর্মকর্তা; পরিকল্পনা কমিশন, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস এবং অন্যত্র নিয়োজিত অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যানবিদ; পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এবং পাকিস্তান পরমাণু শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানী এবং বেসামরিক বিমান চলাচল ও আবহাওয়া ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা।[১১]

১৯৫০ সালে 'ফাইন্যান্স এন্ড কমার্স পুল' নামে একটি পৃথক সার্ভিস গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৯ সালে 'ইকনোমিক পুল' নামে এটিকে পুনর্গঠিত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন বেশ কিছু পদ সৃষ্টি না করা পর্যন্ত এর কার্যক্রম স্থগিতই ছিল।[১২] ইকনোমিক পুল তৈরি করার এই ধারণাটি এসেছিল বিভাগপূর্ব বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা নিয়োগের প্রচলিত একটি নীতিকে অনুসরণ করে। এই নীতিটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সার্ভিসে কর্মরত মেধাবী অর্থনীতিবিদদেরকে অভিন্ন একটি ক্যাডারে নিয়ে আসা। অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাসহ মাঝারি পর্যায়ের সীমিত সংখ্যক কিছু কর্মকর্তাকেই ইকনোমিক পুলের জন্যে নির্বাচন করা হতো। এই পুলে যাথাক্রমে ৬০ শতাংশ পদে সিএসপি এবং ৪০ শতাংশ পদে একাউন্টস ও টেক্সেশন ক্যাডারের কর্মকর্তারা নিয়োগ পেতে পারতো।[১৩]

সতেরোটি ক্যাডার, ক্যাডারবহির্ভূত ১ম শ্রেণীর পেশাদারদের পদ এবং একনোমিক পুল ছাড়া পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের বাদবাকী সার্ভিসগুলোর গঠন জটিলই ছিল। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের শ্রেণীকরণ রীতিপদ্ধতিটি বিভাগপূর্ব অবস্থার প্রায় অনুরূপই থেকে গিয়েছিল। পরিবর্তনের মধ্যে ছিল কেবল বিভিন্ন কয়েকটি ক্যাডারের নামের একটু হেরফের এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নতুন কয়েকটি সার্ভিস বা ক্যাডারের সংযোজন। সার্ভিসগুলোকে সর্বপ্রথম বিস্তৃতভাবে শ্রেণীকরণ করা হয় স্থানভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে। যেমন, নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস, কেন্দ্রীয় সার্ভিস এবং প্রাদেশিক সার্ভিস। সিএসপি এবং পুলিশ সার্ভিস অব পাকিস্তান (পিএসপি) ছিল বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস, যেহেতু এই সার্ভিস দুটির কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় সরকারে চাকরি করতো। আর এটা হয়েছিল এই কারণে যে, এই দুটি সার্ভিসের মাঠ পর্যায়ের পদগুলো প্রধানত প্রাদেশিক অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। নিখিল পাকিস্তান সার্ভিসকাঠামোর আওতায়ই পিএসপি ছিল পুরোপুরি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রত একটি ক্যাডার। অডিট এন্ড একাউন্টস সার্ভিস, মিলিটারি

Dhaka University Institutional Repository

একাউন্টস সার্ভিস, টেক্সেশন সার্ভিস, রেলওয়ে একাউন্টস সার্ভিস, কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ সার্ভিস এবং সেন্ট্রাল ইনজিনিয়ারিং সার্ভিসের মতো কেন্দ্রীয় সার্ভিসগুলো নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস (সিএসপি এবং পিএসপি) দুটি থেকে আলাদা ছিল। কারণ, প্রথম ধরনের সার্ভিসগুলোর সদস্যরা একান্তভাবেই কেন্দ্রীয় করকারের জন্যে কাজ করতো। নিয়োগ পাওয়ার পরপরই কেন্দ্রীয় সার্ভিসের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট কোন সংযুক্ত ডিপার্টমেন্ট বা অধীনস্থ অফিসে কাজ করতে শুরু করতো। এই ডিপার্টমেন্ট বা অফিসগুলো সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচলনা করতো।[১৪]

নিখিল পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় সার্ভিসগুলো ছাড়াও প্রতিটি প্রাদেশিক সরকারেরই নিজস্ব কিছু সার্ভিস ছিল। প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিজেই এসব সার্ভিসের জনবল সংগ্রহ, এদের ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকতো। তবে চাকরির বিভিন্ন শর্তাদি বা সুযোগ-সুবিধার বিচারে প্রাদিশিক এই সার্ভিসগুলো নিখিল পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় উভয় প্রকারের সার্ভিস থেকে কম মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। ইস্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস বা (ইপিসিএস) সদস্যরা ব্যতীত অন্য অধিকাংশ প্রাদেশিক সার্ভিসের সদস্যেরাই তাদের চাকরিজীবনের পুরোটা সময় প্রদেশের সংশ্লিষ্ট সার্ভিসেই কর্মরত থাকতো।[১৫]

দায়িত্বের ধরন ও প্রকৃতি বিচারে পাকিস্তানে সার্ভিস ও ক্যাডারের ক্ষেত্রে বড় দাগের আরেকটি শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছিল। যেমন, (১) সাধরণজ্ঞ প্রশাসনিক সার্ভিস (সিএসপি); (২) পেশাদারী সার্ভিস (অর্থাৎ অডিট এন্ড একাউন্টস, ইনকাম ট্যাক্স, কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ); এবং (৩) বিশেষজ্ঞ সার্ভিস (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, টেলিগ্রাফ এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে)। সিএসপি অফিসারদেরকে সাধারণজ্ঞ প্রশাসক হিসেবে বিবেচনা করা হতো এই কারণে যে, তারা এক ধরনের কাজ থেকে অন্য ধরনের কাজে, এক ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টে এবং কেন্দ্র থেকে প্রদেশ বা প্রদেশ থেকে কেন্দ্রে বদলি হতে পারতো। তারা কেবল ভূমিরাজস্ব বা আইন-শৃংখলা সম্পর্কিত প্রশাসনই নয়, রাষ্ট্রের শিল্প, অর্থনীতি এবং বাণিজ্য বিষয়ক প্রশাসনেরও দায়িত্ব পালন করতো। তাছাড়া রাষ্ট্রের অন্যবিধ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজের সাথেও জড়িত ছিল তারা। কেউ কেউ আবার বিচার বিভাগের কাজ করতো। সুতরাং সিএসপি ছিল পাকিস্তানে প্রকৃত অর্থেই সাধারণজ্ঞ সর্বক্ষেত্রে ধন্বন্তরি একটি সার্ভিস।[১৬]

পেশাদারি সার্ভিসের সদস্যরা নিজ নিজ সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত পেশাগত দায়িত্ব পালন করতো এবং চাকরিজীবনের সবটা সময় সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টেই কাটিয়ে দিত। তবে বিশেষজ্ঞ সার্ভিসটি সাধারণজ্ঞ এবং পেশাদারি এই উভয় সার্ভিস থেকেই আলাদা ছিল। কারণ বিশেষজ্ঞ সার্ভিসের সদস্যদেরকে নিয়োগ করা হতো

Dhaka University Institutional Repository

তাদের বিশেষ পেশাগত ডিগ্রী এবং প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে। অন্যদিকে সাধারণজ্ঞ এবং পেশাদারি সার্ভিসের সদস্যদেরকে নিয়োগ করা হতো প্রায় প্রতি বছর কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতমূলক অভিন্ন একটি কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে।[১৭] সাধরণজ্ঞ, পেশাদারি এবং বিশেষজ্ঞ জাতীয় বিভাজনটিকে সার্ভিসের উল্লম্ব শ্রেণীকরণের বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিভাজন হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কারণ সার্ভিসগুলো তাদের কাজের ধরন অনুযায়ী উল্লম্ব (Vertical) রেখা দ্বারা একে অপর থেকে বিভক্ত।[১৮]

এ ছাড়াও পাকিস্তান সার্ভিসগুলো আবার অনুভূমিকভাবে (Horizontally) চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যথা - ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণী। প্রতিটি শ্রেণীর পদের গুরুত্ব, বেতন স্কেল এবং দায়িত্বের তারতম্যের উপর ভিত্তি করেই এই বিভজনটিকে অনুভূমিক শ্রেণীবিভাজন (Horizontal Classification) বলে অভিহিত করা হয়েছিল। ১ম শ্রেণী এবং ২য় শ্রেণীর অধিকাংশ কর্মকর্তাই ছিল গেজেটেড অফিসার (কারণ তাদের নিয়োগ, দায়িত্ব গ্রহণ এবং চাকরিজীবনের অন্যান্য তথ্যাদি সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হতো) এবং সার্ভিস ব্যবস্থাপনা ও সরকারি কর্মকাণ্ড সম্পাদনের ক্ষেতে তারা উচচতর ক্ষমতা এবং দায়িত্ব লাভ করতো। ৩য় শ্রেণীর সিভিল সার্ভেন্টরা ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থেকে দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদন করতো। আর ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা নিয়োজিত থাকতো শারীরিক বা অন্যান্য ছোটখাট কাজকর্মে।[১৯]

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের শ্রেণীকরণ পদ্ধতির বিরুদ্ধে অধিকাংশ সময়েই যে অভিযোগটি আনা হয় তা হলো, এই শ্রেণীকরণ পদ্ধতিটি সিএসপিদেরকে আলাদা একটি কৌলীন্যের মর্যাদা প্রদান করেছিল। তিনটি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই কৌলীন্যের বিষয়টি কার্যকর করা হতো। প্রথমত, এই সার্ভিসে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পদ্ধতির এমন একটি কঠিন নীতি বরাবরই চালু রাখা হয়েছিল, যা কেবল সমাজের বিশেষ ভাগ্যবান একটি অংশের প্রতিযোগীদেরকেই এই মর্যাদাপূর্ণ ক্যাডারটিতে প্রবেশের সুযোগ করে দিত। দ্বিতীয়ত, চাকরিতে পদোন্নতি এবং পোস্টিং-এর ক্ষেত্রে যাতে করে অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায় সেজন্যে বিপুল সংখ্যক অনুমোদিত পদের বিপরীতে সব সময়েই তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক সিএসপি অফিসার নিয়োগ করা হতো। এবং বাস্তবায়নকারী ডিপার্টমেন্টগুলোর প্রশাসনিক পদসমূহ সিএসপিদের জন্যে সংরক্ষিত থাকতো।[২০] আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায়, সিএসপি ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের প্রকৃত সংখ্যার চাইতে তাদের জন্য সংরক্ষিত পদের সংখ্যা সব সময়ই বেশি ছিল। এর ফলে অতি সহজেই সিএসপি কর্মকর্তারা মাঠ ও সদর অফিস, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং পাবলিক কর্পোরেশন ও বিচার বিভাগের মধ্যে অহরহ স্থানান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মরত থাকার সুযোগ পেত। এ জাতীয় স্থানান্তরের মানেই ছিল দ্র□ত পদোন্নতি। শীর্ষপদগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উচচতর বেতনস্কেলের বিধানটিও কিন্ত সিএসপিদের জন্যে বিশেষ একটি মর্যাদা হিসেবে কাজ করতো।

Dhaka University Institutional Repository

পেশাদারি এবং বিশেষজ্ঞ ক্যাডারের সদস্যদের ক্ষেত্রে সচলতা এবং পরিক্রমণের এ জাতীয় সুযোগ খুবই কম ছিল বলে প্রায়ই তারা পদোন্নতিতে সিএসপিদের চাইতে অনেক পিছিয়ে থাকতো। এই অবস্থাটি পেশাদারি ও বিশেষজ্ঞ সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে একটি ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণার জন্ম দিত।[২১]

পুরো পাকিস্তান সময়ে (১৯৪৭-৭১) সর্বমোট কতজন লোক সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ছিল তার কোন সঠিক হিসাব অথবা জনশক্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত কোন জরিপের সন্ধান পাওয়া যায় নি। এমনকি কোনোক্রমে সংগৃহীত সূত্রাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহও খুব বেশি নির্ভরযোগ্য বলেও মনে হয় নি। এক্ষেত্রে জ্ঞাত তথ্যাদি ও অনুমিত হিসাবের সাথে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগত উপাত্তসমূহ মিলিয়ে নিয়েই মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য একটি সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে। ১৯৬২ সালে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পরিচালিত এক সরকারি গননায় দেখা গেছে যে, ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলিয়ে সারা পাকিস্তানে মোট ৩৭৬,৫২১ জন লোক সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ছিল।[২২] শিক্ষকবৃন্দ এবং রেলওয়েতে কর্মরত জনবলও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে, ডাক ও তারের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিজীবী বিধায় তাদেরকে এই হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছে। ১৯৬৩ তালে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি চাকরিজীবীদের উপর পরিচালিত এক সরকারি গননায় দেখা যায় যে, ঐ সময়ে সর্বমোট ১৮৫,৭৯৪ জন লোক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চাকরিতে নিযুক্ত ছিল। এদের মধ্যে ৫,৭৩৬ জন গেজেটেড অফিসার, ১০০,২৩৩ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী এবং ৭৯,৮২৫ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী।[২৩] ১৯৬৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের এক কর্মচারী গননায় দেখা যায়, ১৯৬৬ সালের ১লা জুলাই তারিখে প্রায় ১৩২,৯৯০ জন লোক পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে নিয়োজিত ছিল।[২৪] বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত নিয়ে রালফ্ ব্রাইবান্টি দেখিয়েছিলেন, ১৯৬৩ সাল বা এর কাছাকাছি সময়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে প্রায় দশ লক্ষ (৯৯৫,৩২৩) লোক নিযুক্ত ছিল।[২৫] আরেকটি সূত্রের হিসাব মতে, ১৯৭০ সালে সারা পাকিস্তানে সরকারি চাকরিতে কর্মরত লোকের সংখ্যা ছিল বারো লক্ষ। এদের মধ্যে ৫৫৫ জন ছিলেন সিএসপি কর্মকর্তা।[২৬]

প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস

ফেডারেল পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশেরই নিজস্ব কিছু সিভিল সার্ভিস ছিল। প্রাদেশিক পর্যায়েই প্রতিষ্ঠিত একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং অন্যান্য কিছু কর্মীব্যবস্থাপনা এজেন্সির মাধ্যমে লোক নিয়োগ করে প্রাদেশিক সরকারগুলো নিজেরাই পুরোপুরিভাবে এসব সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ করতো। প্রাদেশিক সার্ভিসগুলোর অধিকাংশই ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে উচচতর দায়িত্বের জন্যে চুক্তিভিত্তিক চাকরির কিছু পদ তৈরি করা হয়। এসব পদে লোক বাছাই এবং নিয়োগ দেয়া হতো সরাসরি ইংল্যান্ড থেকে। পাশাপাশি

Dhaka University Institutional Repository

এসব উচচতর পদের নীচেও আবার আরেকটি ধাপ তৈরি করা হয়। তবে এই ধাপের সকল চাকরির বিভিন্ন পদে বিনা চুক্তিতে নিয়োগের জন্যে ভারতেই লোক বাছাইয়ের ব্যবস্থা করা হতো। অচুক্তিবদ্ধ এসব চাকরি ছিল অস্থায়ী এবং স্বল্পমেয়াদী। পরবর্তীকালে চেয়ারম্যান হিসেবে চার্লস ইউ এচিসন-এর নেতৃত্বাধীন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (১৯৮৬-৮৭) সুপারিশ অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ এবং অচুক্তিবদ্ধ এসব সার্ভিসকে তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তরে পুনর্বিন্যাস করা হয়। এগুলো ছিল (১) দি ইম্পেরিয়াল সার্ভিস যা পূর্বেকার চুক্তিবদ্ধ সার্ভিসগুলোর স্থালাভিসিক্ত হয়, (২) অচুক্তিবদ্ধ সার্ভিসের উপরের স্তরের চাকরিগুলোকে নিয়ে গঠিত প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহ এবং (৩) অচুক্তিবদ্ধ সার্ভিসের নিচের স্তরের চাকরিগুলোর স্থলে প্রবর্তিত অধস্তন সার্ভিসসমূহ। তিন স্তরবিশিষ্ট নতুন এই সার্ভিসকাঠামোটি আবার দি রয়াল কমিশন অব পাবলিক সার্ভিস (১৯১২-১৫) কর্তৃক পুনঃঅনুমোদিত হয়, যার চেয়ারম্যান ছিলেন লর্ড ইস্‌লিংটন। যাই হোক, ইস্‌লিংটন মনে করে যে, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিসরে কার্যকর সার্ভিসগুলো নামকরণের দিক থেকে বাস্তবসম্মত রীতিতে আলাদা হওয়া উচিত। এরই ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় পরিসরে বিদ্যমান উচচতর স্তরের সার্ভিসগুলো রাজকীয়ক বা নিখিল ভারত সার্ভিস হিসেবে গণ্য ছিল। একই স্তরের যে সার্ভিসগুলো কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় পরিসরে প্রযোজ্য ছিল সেগুলোর নাম দেয়া হলো কেন্দ্রীয় সার্ভিস ১ম শ্রেণী, আর মধ্যম বা প্রাদেশিক পর্যায়ের দায়িত্বের যে সার্ভিসগুলো কেন্দ্রীয় পরিসরে কার্যকর ছিল সেগুলোকে অভিহিত করা হলো কেন্দ্রীয় সার্ভিস ২য় শ্রেণী হিসেবে। অন্যদিকে প্রাদেশিক সার্ভিসের যে সার্ভিসগুলোর কর্মকাণ্ড কেবলমাত্র প্রাদেশিক পরিসরেই সীমাব ছিল, সেগুলোকে আলাদ করা হয় সংশ্লিষ্ট প্রদেশের নাম আলাদা আলাদাভাবে সেগুলোর সাথে জুড়ে দেয়ার মাধ্যমে। উপরন্তু প্রতিটি সার্ভিসের নামের সাথে তাদের কাজের ধরনও লিপিবদ্ধ থাকতো। ক্রমবিকাশের ধারায় এভাবে জন্ম নিয়েছিল বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস, বোম্বে পুলিশ সার্ভিস, মাদ্রাজ কৃষি সার্ভিস ও বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসসহ এ ধরনের আরো বহু সার্ভিস। কার্যত এগুলো ছিল বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্যমান মধ্যম অথবা প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহের প্রতিরূপ। অধস্তন সর্ভিসগুলো অবশ্য পূর্বের মতোই বহাল ছিল।[২৭] বস্তুত উল্লিখিত গুরুতপূর্ণ দু'টি কমিশন এবং লর্ড লীকে চেয়ারম্যান করে গঠিত দি রয়াল কমিশন অন দি সুপিরিয়র সার্ভিসেস ইন ইন্ডিয়া (১৯২৪) কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহই পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশে জন্ম নেয়া বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ সার্ভিসকাঠামোর উন্নয়ন ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, এচিসন কমিশন যে প্রাদেশিক সার্ভিসের সুপারিশ করেছিল তা থেকেই পরবর্তীকালে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস তথা ইপিসিএস অথবা পিসিএস ও অন্যান্য বিশেষায়িত প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহ পাকিস্তান সহ অন্যত্রও আবির্ভূত হয়। স্বাধীনতার সময় পাকিস্তান যে প্রাদেশিক সার্ভিসকাঠামোটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল পরবর্তী চব্বিশ বছরে তা প্রায় অক্ষুণ্নই থেকে গিয়েছে। পরিবর্তন বলতে সামান্য যেটুকু হয়েছিল তা ছিল কেবল বিভিন্ন সার্ভিসের নামকরণের ক্ষেত্রে এবং পর্যায়ক্রমে নতুন কিছু সার্ভিস বা ক্যাডারও এর সাথে যুক্ত হয়েছিল।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৫ সালে একক একটি পশ্চিম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত পাকিস্তান ছিল আলাদা চারটি প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি ফেডারেল রাষ্ট্র। এই কারণে সেই সময়কার প্রাদেশিক সার্ভিসগুলোর চারটি প্রাদেশিক ইউনিটের (পূর্ব বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) অন্তর্গত করেই আলাদা আলাদাভাবে গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭০ সালের জুন মাসে একক পশ্চিম পাকিস্তান ইউনিটটি ভেঙ্গে দেয়ার আগ পর্যন্ত প্রাদেশিক সার্ভিসগুলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান - এই দু'টি সুনির্দিষ্ট প্রাদেশিক ইউনিটেই বিন্যস্ত ছিল। সার্ভিসগুলোর সাথে প্রদেশের নাম জুড়ে দিয়ে এক প্রদেশের সার্ভিস থেকে আরেক প্রদেশের সার্ভিসকে আলাদা করা হয়। অবশ্য এর সাথে প্রতিটি সার্ভিসের কাজের ধরনও উল্লেখ করা থাকতো। যেমন, পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, পশ্চিম পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিস, পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিস, পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সার্ভিস, পশ্চিম পাকিস্তান শিক্ষা সার্ভিস ইত্যাদি। যাই হোক, পশ্চিম পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে 'পশ্চিম পাকিস্তান' কথাটি সাধারণত ব্যবহার করা হতো না। এটিকে অভিহিত করা হয় কেবল প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস বা পিসিএস নামে।[২৯]

পূর্ব পাকিস্তানে নিয়মিত ভিত্তিতেই মোট চব্বিশটি সার্ভিস (সারণি ৩.২ দ্রষ্টব্য) প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে এরূপ সার্ভিসের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল চৌদ্দটি।[৩০] প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহের কাঠামো প্রায় কেন্দ্রীয় সার্ভিসসমূহের কাঠামোর মতোই ছিল। কিন্তু চাকরির শর্তাবলীর দিক থেকে প্রাদেশিক সার্ভিসগুলো ছিল কেন্দ্রীয় সার্ভিসের তুলনায় নিম্ন মর্যাদার।

যাই হোক, বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সার্ভিসগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সুস্পষ্টভাবেই ভিন্ন ভিন্ন ছিল। প্রথমত প্রাদেশিক এই সার্ভিসগুলো অনেকটা কেন্দ্রীয় সার্ভিসের মতোই প্রধান তিনটি ধারায় বিভক্ত ছিল। যেমন, সাধারণজ্ঞ প্রশাসনিক সার্ভিস (যেমন ইপিসিএস এবং পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয় সার্ভিস), বিশেষজ্ঞ সার্ভিস (অর্থাৎ স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রকৌশল সার্ভিস) এবং নির্দিষ্ট বৃত্তিনির্ভর সার্ভিস, অর্থাৎ যেগুলোর জন্যে চাকরিতে পূর্ববর্তী কারিগরি যোগ্যতার প্রয়োজন হতো না (অর্থাৎ পুলিশ ও এক্সাইজ সার্ভিস)। দ্বিতীয়ত, এই সার্ভিসগুলোর শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অনুসৃত সেই চারটি শ্রেণীর ধরনই বজায় রাখা হয়েছিল। যথা, ১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী, ৩য় শ্রেণী এবং ৪র্থ শ্রেণী। কোন কোন সার্ভিসে ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণী এবং ২য় শ্রেণী থেকে ১ম শ্রেণীতে উত্তরণের সীমিত কিছু সুযোগ ছিল। তবে ৪র্থ শ্রেণী থেকে ৩য় শ্রেণীতে এমনকি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীটির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি দানের বাস্তব কোন সুযোগই ছিল না। তৃতীয়ত, প্রাদেশিক সার্ভিসের অনেকগুলোই আবার ১ম শ্রেণী এবং ২য় শ্রেণী বা উর্ধ্বতন বা নিম্নতন অথবা উচ্চতর ও নিম্নতর - এভাবে বিভক্ত ছিল। চতুর্থত, প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহের বেতনস্কেল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ একই রকম সার্ভিসের বেতনস্কেলের তুলনায় কম হতো। এ ছাড়াও প্রাদেশিক সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে অনেকগুলো

Dhaka University Institutional Repository

বেতনস্কেল বহাল থাকার করণে এ ক্ষেত্রে যৌক্তিক একটি বেতনকাঠামো দাঁড় করানোর সমস্যাও ছিল। পঞ্চমত, প্রাদেশিক পুলিশ সার্ভিসের কোন কর্মকর্তা পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসে, যা ছিল একটি নিখিল পাকিস্তান সার্ভিস, উচ্চতর কোন পদে পদোন্নতি পেলে স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি পিএসপির সদস্য হয়ে যেতেন। কিন্তু যেসব ইপিসিএস অফিসার তালিকভুক্ত পদের জন্য নির্বাচিত হয়ে সিএসপি ক্যাডারভুক্ত পদে নিযুক্তি পেতেন, তাদেরকে কখনোই পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ দেয়া হতে না।[৩১]

সারণি-৩.২: পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহ

1.	East Pakistan Civil Service (EPCS), Class I
2.	East Pakistan Civil Service, Class II
3.	East Pakistan Civil Service (Judicial)
4.	East Pakistan Police Service
5.	East Pakistan Junior Police Service
6.	East Pakistan Senior Education Service
7.	East Pakistan Junior Education Service
8.	Railway Service of Engineers
9.	Railway Commercial, Transportation, and Traffic Service
10.	East Pakistan Excise Service
11.	East Pakistan Health Service (Upper)
12.	East Pakistan Health Service (Lower)
13.	East Pakistan Senior Engineering Service
14.	East Pakistan Engineering Service
15.	East Pakistan Agriculture Service
16.	East Pakistan Higher Livestock Service
17.	East Pakistan Livestock Service
18.	East Pakistan Higher Fisheries Service
19.	East Pakistan Fisheries Service
20.	East Pakistan Senior Forest Service
21.	East Pakistan Junior Forest Service
22.	East Pakistan Food Administration Service
23.	East Pakistan Secretariat Service
24.	East Pakistan Taxation Service

সূত্র: Government of Bangladesh, Cabinat Division, *Report of the Pay and Services Commission*, Part 1- *The Services*, vol. 1, (Dhaka 1977), p.37.

প্রতিটি প্রদেশেই প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস (নির্বাহী) ক্যাডারকে সাধারণত সিএসপি সার্ভিসের মতোই প্রাদেশিক পর্যায়ে সাধরণজ্ঞ ক্যাডার হিসেবে মনে করা হতো। সংক্ষেপে এর নাম ছিল পিসিএস। পূর্ব পাকিস্তানে

Dhaka University Institutional Repository

এই পিসিএসকে সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করে চিনতে পারার জন্য বলা হতো পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস বা ইপিসিএস। সিএসপির মতো এটিও ছিল একটি সর্বক্ষেত্রে ধন্বন্তরি সার্ভিস যদিও সারা পাকিস্তান জুড়ে এর ব্যাপ্তি ছিল না। তবে, কখনো কখনো অল্প সংখ্যক বাছাই করা ইপিসিএস অফিসার কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ পেতেন। ইপিসিএস অফিসারদেরকে নিয়োগ করাই হতো মূলত প্রাদেশিক প্রশাসনের জন্যে। তরুণ ইপিসিএস অফিসারদের দিয়ে প্রধানত মাঠ প্রশাসনের ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের পদগুলো পূরণ করা হতো। সিএসপিদের মতোই তারাও মাঠ পর্যায়ের পদ থেকে সচিবালয়ের পদে অথবা সচিবালয় থেকে মাঠ পর্যায়ের পদে বদলি হতো। এই বদলি প্রদেশের ফাংশনাল এবং স্বায়ত্তশাসিত উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের পদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। তবে তাদের বদলি সিএসপি অফিসারদের মতো এত ঘন ঘন হতো না। সাধারণ প্রশাসনের তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট সংখ্যক উচচ পদেই কেবল ইপিসিএস অফিসাদের নিয়োগ দেয়া হতো। সিএসপিদের মতো এত দ্রুত তারা উচচতর পদসমূহে পদোন্নতি পেতেন না।[৩২]

১৯৬৬ সালে যেসব ইপিসিএস অফিসার মহকুমা ও জেলা অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন তাদের বয়স ছিল যথাক্রমে ৩৫ থেকে ৫০ এবং ৪৫ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে ১৯৬৬ সালেই যেসব সিএসপি অফিসার পূর্ব পাকিস্তানে উল্লেখিত দু'টি পদে চাকরিরত ছিলেন, তাদের অধিকাংশের বয়সই ছিল যথাক্রমে ২৫ থেকে ২৮ এবং ৩২ থেকে ৩৫ বছেরের মধ্যে। ইপিসিএসদের মধ্য থেকে মেধা ও দক্ষতা প্রদর্শনকারী সীমিত সংখ্যক কিছু অফিসারই কেবল মহকুমা ও জেলা অফিসার হিসেবে নিয়োগ পেতেন। তাদের থেকে বাছাই করা খুব অল্প সংখ্যক অফিসারই কেবল প্রাদেশিক সচিবালয়ের যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং সচিব পদে পদোন্নতি পেতেন।[৩৩]

ইপিসিএস অফিসারদের মধ্যে বরাবরই এই অসন্তোষ বিদ্যমান ছিল যে, ধারাবাহিকভাবে ঔপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ সিএসপি অফিসারদের জন্যে সংরক্ষিত রেখে দিয়ে তাদেরকে তাদের চাকরিজীবনের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচেছ। তাদের বক্তব্য ছিল, তারা যে ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত সেই ক্যাডার কোন অবস্থায়ই সিএসপিদের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। কারণ যে পদ্ধতিতে তাদের বাছাই করা হতো সেই পদ্ধতিটি কোন অংশেই সিএসপিদের বাছাই পদ্ধতির চেয়ে কম প্রতিযোগিতামূলক ছিল না এবং কর্মক্ষেত্রেও তাদেরকে সিএসপিদের অনুরূপ দায়িত্বই পালন করতে হতো। বাস্তব অবস্থাটি ছিল এই যে, মাঠ পর্যায় এবং সচিবালয় উভয় ক্ষেত্রেই ইপিসিএস অফিসারদের কাজের অভিজ্ঞতা ছিল দীর্ঘ এবং কাজের পরিধি ছিল বিস্তৃতর। কারণ তাদের ক্ষেত্রে এক পদ থেকে আরেক পদে বদলি বা পদোন্নতির ঘটনা ধুব ধীরে এবং কমই ঘটতো। উপরন্তু ইপিসিএস অফিসারদের সংখ্যা প্রতি বছরই বেড়ে চলছিল। উদাহরণ

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে বলা যায়, ১৯৫০ সালে যখন ইপিসিএস অফিসারদের জন্যে 'তালিকাভুক্ত' পদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়, তখন ইপিসিএস ক্যাডারে অফিসারের সংখ্যা ছিল ২৮০ জন। কিন্তু ১৯৬৪ সালে এই ইপিসিএস অফিসারের সংখ্যা বেড়ে যখন ৭৪০-এ দাঁড়িয়েছিল, তখনো তাদের জন্যে নির্ধারিত 'তালিকভুক্ত' পদের সংখ্যা অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। এর অবধারিত ফল দাঁড়ালো এই যে, বহু যোগ্য ও দক্ষ ইপিসিএস অফিসারেরই পদোন্নতি পাওয়ার সুযোগ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসতে লাগলো। বিশেষত প্রাদেশিক সচিবালয়ে সিএসপি মুখ্য সচিবের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণাধীন চাকরি ও সাধারণ প্রশাসন ডিপার্টমেন্টে ইপিসিএস অফিসারদের চাকরি যেভাবে নিয়ন্ত্রতি হয়েছে তা তাদের মনে বড় ধরনের একটি ক্ষতই তৈরি করেছিল।[৩৪]

সিএসপি ও ইপিসিএসদের মধ্যেকার বিরোধ ছিল প্রাদেশিক আমলাতন্ত্রে আন্তঃক্যাডার সম্পর্কের মাত্র একটি রূপ। বিরোধের আরেকটি দিক ছিল একদিকে সিএসপি ও ইপিসিএস (পশ্চিম পাকিস্তান পিসিএস) অফিসার এবং অন্যদিকে সিএসপি ও নির্দিষ্ট বৃত্তিনির্ভর ও বিশেষজ্ঞ সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মধ্যেকার ঈর্ষা এবং বৈরিতার সম্পর্ক। এমনিতে সিএসপি এবং ইপিসিএসরা নিজেদের মধ্যে বিরোধে লিপ্ত থাকলেও যখনই বৃত্তিভুক্ত ও বিশেষজ্ঞরা সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর দিকে হাত বাড়াতো, তখনই তারা বিরোধ বাদ দিয়ে নিজেদের মধ্যে এক ঐক্য গড়ে তুলতো। সাধারণজ্ঞ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অধীনস্থ পদগুলোতে চাকরি করার ব্যাপারে এবং বৃটিশদের রেখে যাওয়া পুরো প্রশাসন ব্যবস্থাটি, যা টৌকস কর্মকর্তাদের শীর্ষ পদগুলোতে বসার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিল, তার ব্যাপারেই নির্দিষ্ট বৃত্তিনির্ভর ও বিশেষজ্ঞদের বরাবরই অসন্তোষ ছিল।[৩৫]

উপসংহার

আসলে পাকিস্তান আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি অনেকাংশে ঔপনিবেশিক আমলের ভাবধারায় বিন্যস্ত হয়েছিল। সচিবালয় ব্যবস্থা, মন্ত্রণালয় এবং সংযুক্ত ডিপার্টমেন্টসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাজমান নীতি-প্রশাসনের দ্বি-বিভাজন বৃটিশ আইসিএস অফিসারদের উত্তরসূরি সাধারণজ্ঞ ক্যাডারের সিএসপি অফিসাদের আধিপত্য, জেলা প্রশাসন যেখানে একজন কালেক্টর, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিপুটি কমিশণার কার্যত ছোটখাট একজন গভর্নরের মতোই প্রশাসন পরিচালনা করতেন এবং ভূমি রাজস্ব প্রশাসন এসবই ছিল ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের এক একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিশেষভাবে সিএসপি পদের জন্যে যে বেতন-ভাতা এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ধার্য করা হয়েছিল তা ছিল যথেষ্ট আকর্ষণীয় এবং এগুলো বৃটিশ আমলকে অনুসরণ করেই করা হয়েছিল। উপরন্তু ব্রিটিশ আমলের তুলনায় আরো বেশি সামাজিক মর্যাদাও এরা ভোগ করতেন। একজন পাকিস্তানী সমালোচক বলেছেন, ব্রিটিশ

Dhaka University Institutional Repository

আমলের মতো শাসক সম্প্রদায়ের একটি সুবিধাভোগী জনবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী ছাড়াও ধনিকশ্রেণীভুক্ত হওয়া এবং ঐশ্বর্যময় ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করার প্রতিই পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসটির আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। বলা বাহুল্য, দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের সাথে তাদের এই ধরনের জীবনযাপন ছিল একেবারেই সঙ্গতিহীন।[৩৬]

তথ্যনির্দেশ

১। দেখুন, Philip Woodruff, *The Men Who Ruled India: The Guardians,* vol. 2 (London 1963), p. 12।

২। Guthrie S. Birkhead, "Introduction", in Guthrie S. Birkhead (ed.), *Administrative Reform in Pakisatn* (New York, 1966) p.12।

৩। পাকিস্তানে সার্ভিসের সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। পাকিস্তান সরকারের ছাব্বিশটি কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসের নামও তালিকাভুক্ত পাওয়া গেছে --দেখুন, *Report of the Administrative Reorganization Committee - 1961* (Karachi 1961) (reprinted in public edition by Efficiency O & M Wing, Establishment Division, President's Secretariat, 1963), p. 348। আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, Ralph Braibanti, "The Higher Bureaucracy of Pakistan", in Ralph Braibanti (ed.), *Asian Bureaucratic Systems Emergent from the British Imperial Tradition* (Durham, 1966) pp. 258-59।

৪। The Government of Pakistan (Establishment Division), *Careers in the Pakistan Central Superior Services* (Karachi 1954), p. 2।

৫। ঐ, p. 3।

৬। Ralph Braibanti, *Research on the Bureaucracy of Pakistan,* (Durham 1966), pp. 101-112।

৭। দেখুন, S.G. Ahmed, *Public Personnel Administration,* (Dhaka: University of Dhaka, 1986), pp. 48-49।

৮। Cf. *Memorandum submitted to the Services Reorganization Committee* (1969) by the CSP Association (reprinted in *Administrative Science Review*, NIPA, Dacca, vol. 4, no. 1, March 1970, pp. 169-243), pp. 208-211।

৯। পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের গঠন এবং এর কর্মকাণ্ডের উপর বিস্তারিত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে, Syed Giasuddin Ahmed , *Bangladesh Public Service Commission,* (Dhaka 1990), pp. 48-86; S. G. Ahmed, "Public Service Commission in Pakistan", *Pakistan Administration,* vol. 31, no. 2, 1985, pp. 87-98।

১০। Cf. *The CSP Association Memorandum of 1969,* pp. 208-211।

১১। Government of Pakistan, *Report of the Working Group on the Reorganization of the Public Service Structure in Pakistan,* (Karachi 1969), p. 138।

১২। Cf. M.A. Rahman, ed. *Administrative Reforms in Pakistan* (Lahore 1969), pp. 10-11।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। বৃটিশ ভারতে অর্থনৈতিক পুলের উৎপত্তি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, S.G. Ahmed, *Public Personnel Administration in Bangladesh*, p. 51 (fn. 19)।

১৪। S.G. Ahmed, *Public Personnel Administration*, pp. 52-54।

১৫। Cf. *The CSP Association Memorandum of 1969*, pp. 208-209।

১৬। M.A. Chaudhuri, *The Civil Service of Pakistan*, (Dacca 1969), p. 60।

১৭। *The CSP Association Memorandum of 1969*, 208-209; M.A. Chaudhuri, *The Civil Service of Pakistan*, pp. 59-64।

১৮। M.A. Chaudhuri, ঐ, p. 60।

১৯। ঐ, 6p. 61; *The CSP Association Memorandum of 1969*, p. 210।

২০। Cf. The Civil Service of Pakistan (Composition & Cadre) Rules, 1954, in Government of Pakistan (Establishment Division), *Establishment Manual*, vol. 1 (Karachi 1968), pp. 185-196।

২১। দেখুন, Nasir Islam, "Pakistan", in V. Subramaniam (ed.) *Public Administration in the Third World* (New York, 1990), p. 82।

২২। Ralph Braibanti, *Research on the Bureaucracy of Pakistan*, (Durham 1966), pp. 131-132।

২৩। দেখুন, Government of East Pakistan (Services & General Administration Department), *Census of Civil Employees 1965*, vol. 1, (Dacca 1966), pp. 1-9।

২৪। Cf. *CSP Association Memorandum of 1969*, p. 210।

২৫। বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, R. Brabhanti, "Concluding Observations", in Brahanti and Others (eds.). *Asian Bureaucratic System Emergent from the British Imperial Tradition*, (Durham 1966), pp. 648-649।

২৬। Mumtaz Ahmad, *Bureaucracy and Political Development in Pakistan*, (Karachi 1974), p. 63।

২৭। বৃটিশ ভারতে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের ক্রমোন্নয়নের বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন, B.B. Misra, *The Bureaucracy in India*, (Delhi 1977), pp. 91-299; Charles H. Kennedy, *Bureaucracy in Pakistan* (Karachi 1987), pp. 17-35; Pakistan, *Report of the Pay and Services Commission 1959-1962* (Chairman, A.R. Cornelius) (Karachi 1969), pp. 44-45।

২৮। Cf. Charles H. Kennedy, pp. 21-22।

২৯। Cf. Muneer Ahmad, *The Civil Servants in Pakistan* (Karachi 1964), p. 204।

৩০। দেখুন, Braibanti, "The Higher Bureaucracy of Pakistan", p. 244।

৩১। পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সার্ভিস সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, S.G. Ahmed, *Public Personnel Administration*, pp. 159-164; Government of Bangladesh (Cabinet Division), *Report of the Pay and Services Commission*, Part 1 - *The Services*, vol. 1 (Dhaka 1977), pp. 169-173; Civil Service Association (ex-CSPs), *Future Services Structure of Bangladesh* (Dhaka 1972)।

Dhaka University Institutional Repository

৩২। দেখুন, Najmul Abedin, *Local Administration and Politics in Modernising Societies*, (Dhaka, 1973), pp.187-188।

৩৩। ঐ, p. 188।

৩৪। Cf. Ali Ahmed, *Role of Higher Civil Servants in Pakistan*, (Dacca 1968), pp. 346-357।

৩৫। দেখুন, Tulukder Maniruzzaman, "Administrative Reforms and Politics within the Bureaucracy in Bangladesh", *Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, vol. xvii, no. 1, 1979, p. 49। Similar inter-cadre conflicts in West Pakistan are reported in Muneer Ahmed, *The Civil Servant in Pakistan*, 183-255; C.J. Hayes, *Report on the Public Service Commissions of British Commonwealth Countries* (London 1955), pp. 168-169।

৩৬। দেখুন, Mustaq Ahmed, *Government and Politics in Pakisatn* (Karachi, 1970), p. 84।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় ভাগ

বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো

ভূমিকা

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সরকারী কার্যক্রম দ্বিমূখী প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিচালিত হয় বলা যেতে পারে। এই দ্বিমূখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা বলতে সরকারী নীতি ও নির্বাহী কার্যক্রমের একটি ধারা, অন্যটি মাঠ পর্যায়ে নীতি বাস্তবায়নের আরেকটি ধারা। প্রথম ধারাটি মূলত জাতীয় পর্যায়ের যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সচিবালয় হিসেবে গঠিত। আর অন্যটি পরি-জাতীয় স্তরে (Sub-national level) বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে বিস্তারিত যেখানে সরকারের সাধারণ প্রশাসনিক কার্যক্রম ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এছাড়াও দেশজুড়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পরিব্যাপ্ত। যেমন জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, শহুরে অঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যালটি ইত্যাদি। লক্ষণীয় যে, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালটিগুলো সুনির্দিষ্ট 'ক্ষমতা' ও 'কার্যাবলী' নিয়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে, অন্যদিকে জেলা ও উপজেলা পরিষদ প্রবলভাবে আমলাতান্ত্রিকতাপুষ্ট; জননির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কাঠামোটি এখনো আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি।

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক বা স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত সরকারী প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রশাসনযন্ত্রের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। অধ্যায়টি প্রধানত: দু'টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গঠিত প্রশাসনযন্ত্র তথা মন্ত্রণালয়সমূহ বা সচিবালয় ও এর সাথে সংযুক্ত অধিদপ্তর/পরিদপ্তর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত প্রশাসনযন্ত্র যথা বিভাগ, জেলা ও থানা বা উপজেলার প্রশাসন কাঠামো ও কার্যক্রম।

কেন্দ্রীয় সচিবালয় ও মন্ত্রণালয়সমূহ

সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা পুনরায় চাল করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী এবং রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কেবিনেট বা মন্ত্রিপরিষদের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। সংসদীয়

Dhaka University Institutional Repository

সরকার পদ্ধতিতে অনুসৃত 'যৌথ দায়বদ্ধ' নীতি অনুযায়ী কেবিনেট বা মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। অর্থাৎ মন্ত্রীপরিষদের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণের কার্যকালের মেয়াদ জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যদের সমর্থনের উপর একান্তভাবে নির্ভশীল। কেবিনেট বা মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে বাছায়কৃত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের সমন্বয়ে। তবে সংসদ সদস্য নন এমন কয়েকজনকেও মন্ত্রী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এই শর্তে যে সংসদ সদস্যবহির্ভূত মন্ত্রীর সংখ্যা মন্ত্রীপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার এক-দশমাংশের কম হবে। সাধারণ অর্থে, একজন কেবিনেট মন্ত্রী একটি মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক প্রধান হিসেবে নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু তাত্ত্বিক অর্থে তার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়াও দপ্তরবিহীন এক বা একাধিক কেবিনেট মন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। একজন প্রতিমন্ত্রী একটি মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে অথবা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কোন বিভাগের প্রধান হিসেবে অথবা সচরাচর যেমনটা দেখা যায় একজন কেবিনেট মন্ত্রীর সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। একজন উপমন্ত্রী সাধারণতঃ কোন একক মন্ত্রণালয়ের বা মন্ত্রণালয়ের কোন সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন না; বরং তার কর্ম বা দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

সচিবালয়

রাষ্টের প্রশাসনযন্ত্র ও এর পরিচালন সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানে কোন সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়া হয় নি। বরং বলা হয়েছে: "সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে"[১]। এছাড়া সরকারের কার্যাবলী ও কর্মপন্থা সম্পর্কে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৫ (৬)-এ বলা হয়েছে: "রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।" সংবিধানের এই অনুচ্ছেদবলে সরকার প্রশাসনিক 'কার্যবিধি' (Rules of Business) ও 'কার্যবন্টন' (Allocation of Functions) প্রণয়ন ও পরিমার্জন করে থাকে। এ দলিলদ্বয় (প্রশাসনিক কার্যবিধি ও কার্যবন্টন) সরকারের কর্মসূচি নির্বাহ ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে তা বন্টনের একটি আইনগত ভিত্তি প্রদান করে। এই মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সমষ্টিকেই বলা হয়ে থাকে সচিবালয় - 'প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র'। বর্তমানে সর্বসাকুল্যে ৪১টি মন্ত্রণালয় এবং ৫২টি সংশ্লিষ্ট বিভাগ রয়েছে। কোন কোন মন্ত্রণালয়ের একটি মাত্র বিভাগ রয়েছে আবার কোন কোন মন্ত্রণালয় একাধিক সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত। উদাহরণস্বরূপ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের রয়েছে তিনটি সংশ্লিষ্ট বিভাগ (১) পরিকল্পনা বিভাগ; (২) পরিসংখ্যান বিভাগ ও (৩) বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED)। এই ৪১টি মন্ত্রণালয় ছাড়াও সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে "প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়" নামে আরেকটি প্রশাসনিক শাখা রয়েছে যার অন্তর্ভূক্ত আছে

Dhaka University Institutional Repository

কেবিনেট বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়[২]।

কোন একটি মন্ত্রণালয় ও তার সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক বিভাগ মূলত তাদের এখতিয়ারভূক্ত সীমানার মধ্যে সরকারী নীতি প্রণয়নের ভূমিকা পালন করে। পাশপাশি উক্ত নীতিমালাগুলোর বাস্তবায়ন পরবর্তী মূল্যায়নও তারা তদারক করে থাকেন। মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কাঠামোগতভাবে বিভিন্ন উইং, শাখা (ব্রাঞ্চ) এবং সেকশনে ভাগ করা হয়েছে। সচিব পদমর্যাদার একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাই মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দাপ্তরিক প্রধান (Official Head) হিসেবে বিবেচিত হন, যিনি সরকারের সব ধরনের নীতি প্রণয়ন ও প্রশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর প্রধান পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন। এ প্রেক্ষাপটে র□লস অব বিজনেস বা প্রশাসনিক কার্যবিধি এবং সচিবালয় নির্দেশমালার (Secretariat Instruction) নির্দেশনার অনুগামী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সকল ধরনের কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তায় সচিবের উপরই। এছাড়া সচিব তার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও তৎসহযোগী অধিদপ্তর (Department) ও অন্যান্য অফিসের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার (Principal Accounting Officer) ভূমিকাও পালন করেন[৩]।

সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও সচিবালয়ে কর্মরত অন্যান্য পদমর্যাদার কর্মকর্তারা হচ্ছেন অতিরিক্ত বা যুগ্ম সচিব (Additional or Joint Secretary), উপসচিব (Deputy Secretary), জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব (Senior Assistant Secretary) এবং সহকারী সচিব (Assistant Secretary)। কোন অতিরিক্ত বা যুগ্মসচিব কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত না হলেও সুনির্ধারিত ক্ষেত্রে তারা সুনির্দিষ্ট কর্ম ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এই সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের ব্যাপারে তারা পূর্ণ স্বাধীন এবং সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বিবেচনার জন্য মন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বা উপস্থাপনের অধিকারপ্রাপ্ত। তবে কোন বিষয়ে মন্ত্রীর নির্দেশ বা আদেশ সাধারণত সচিবের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌছায়। উপসচিব সাধারণত কোন মন্ত্রণালয়ের শাখার (Branch) দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং তার কাজের পরিসীমায় নতুন কোন নীতি প্রণয়ন বা নির্ধারণের বিষয় ছাড়া অন্যান্য সকল কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার ব্যাপারে অন্যভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অন্যদিকে, সহকারী সচিব বা জেষ্ঠ্য সহকারী সচিব মন্ত্রণালয়ের উপশাখার (Section) দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। তাদের কর্মকান্ড সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ - সরকারের স্থায়ী আদেশ (Standing order), প্রচলিত দৃষ্টান্ত (Precedents) ও নিয়মনীতির অনুবর্তী। কোন বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে বা পরামর্শ প্রয়োজন হলে তিনি তার অব্যবহিত উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার নির্দেশনা গ্রহণ করেন।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

সচিবালয়ের বিভিন্ন অফিসার পদে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বা বিসিএস-এর ২৯টি ক্যাডার হতে বাছায়কৃত সদস্যদেরকে নিয়োগের জন্য ক্যাডার প্রতি কোটা সংরক্ষিত আছে। কোটাভিত্তিক এ নিয়োগের প্রচলন শুরু হয় ১৯৮৯ সালের সিনিয়র সার্ভিসেস পুল (Senior Services Pool- SSP) পদ্ধতি বাতিলকরণ ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ে একটি নতুন পদোন্নতি ও পদায়ন ((Posting) নীতিমালা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। কিন্তু বাস্তব দৃশ্যপটে দেখা যায়, এই নতুন রীতি (১৯৯৮-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সংশোধিত বিবেচনায়) অনুসারে উপসচিব, যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কর্মকর্তাই আসেন বিসিএস 'প্রশাসন' ক্যাডার সদস্যদের মধ্য থেকে। বাকী মাত্র এক-চতুর্থাংশ পদ লাভ করেন অন্যান্য ২৮টি কারিগরী (technical) ও পেশাগত (Professional) বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাগণ।[৫] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব পদে নিয়োগের জন্য এ পর্যন্ত কোন কোটা পদ্ধতি চালু করা হয় নি। এবং প্রধানমন্ত্রী তার নিজস্ব বিবেচনায় ২৯টি ক্যাডার হতে বাছায়কৃতি শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে এই উচ্চ পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু কার্যত দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সচিব পদগুলোতে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণই নিয়োগ পেয়ে থাকেন। এভাবে এই পরিভাষিত কোটা সংরক্ষণের ফলে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণই 'প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র' সচিবালয়ের সিংহভাগ পদে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন।[৬] সচিবালয়ের পদসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে এই অসম সংরক্ষণ নীতির ফলেই সেই স্বাধীনতাপূর্ব সময়কাল থেকে আজ অব্দি বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অসহিষ্ণুতা বিরাজ করছে।

সংযুক্ত অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর

মন্ত্রণালয় বা বিভাগের গৃহীত সরকারী নীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রায় ২৫৪টি নির্বাহী অনুসংগঠন (Agency) রয়েছে। এ অনুসংগঠনগুলো সাধারণত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা তৎসংশ্লিষ্ট বিভাগের অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর হিসেবে কাজ করে। এ অনুসংগঠনগুলোর মূল কাজই হচ্ছে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতির বাস্তবায়নের দিকটি সুনিশ্চিত করা। এছাড়া মন্ত্রণালয় বা বিভাগগুলোর কর্মকান্ডের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত তথ্য বা দিক নির্দেশনাও প্রদান করা। এই অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরগুলো আকার, গুরুত্ব ও ক্ষমতার দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের। কোন কোন অধিদপ্তরের প্রধানের বেতন একজন পূর্ণাঙ্গ সচিবের বেতনের সমপর্যায়ভূক্ত, আবার কোন কোন অধিদপ্তরের প্রধান উপসচিব, যুগ্মসচিব বা অতিরিক্ত সচিবের সমপর্যায়ের বেতনভাতা পেয়ে থাকেন।[৭] অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংযুক্ত অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরের প্রধানগণ বিভিন্ন টেকনিক্যাল পদনামে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন; যেমন: মহাপরিচালক (Director-general), পরিচালক (Director) বা প্রধান নির্বাহী অফিসার (Chief executive officer) ইত্যাদি। পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগে ও কাজের ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করেন। অধিদপ্তর

Dhaka University Institutional Repository

বা পরিদপ্তরের কর্মবিন্যাস (Job Specification) ও কাজের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে অধঃস্তন কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদায়ন করা হয়। তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কারিগরী (Technical) ও পেশাগত (Professional) ক্যাডারসমূহ থেকে নিয়োজিত হন[৮]।

সচিবালয় এবং অন্যান্য সংযুক্ত অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে অফিস ফাইলের উপর ব্যস্ত থাকা বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা; যেমন: অধীক্ষক (Superintendent), সহকারী ও জ্যেষ্ঠ সহকারী এবং উচ্চ ও নিম্ন পদস্থ করণিক। বস্তুতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কর্মচারীগণ ফাইল তৈরী ও নোট লেখা, খসড়া প্রস্তুতকরণ, পূর্বনজির (Precedent) ও সূত্র (Reference) অনুসন্ধান ও সারসংক্ষেপকরণ, সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও সংবিধি নির্দেশকরণ এবং মন্তব্য লিপিবদ্ধকরণের ভূমিকা পালন করেন। যাতে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক কর্মকর্তার কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়ক হয়। ফলশ্রুতিতে যা হয়, পদস্থ কর্মকর্তাগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার অধীনস্থদের 'সহায়ক' ভূমিকার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন যা সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকেই বরং দীর্ঘায়িত করে; প্রবচনের ভাষায় এ বৈশিষ্ট্যকেই বলা হয় "লাল ফিতার দৌরাত্ম্য"।[৯]

বাংলাদেশ সরকারের আরো কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যাদেরকে সাধারণভাবে বলা হয় 'পাবলিক কর্পোরেশন' বা 'পাবলিক এন্টারপ্রাইজ' (এদের মোট সংখ্যা ১৭৩)। আইনবলে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সেসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেগুলোর গঠন ও পরিচালনায় মোটা অংকের মূলধন বিনিয়োগ ও বহুসংখ্যক শ্রমিক আবশ্যক (যেমন, তেল বা গ্যাস), অথবা বেসরকারী খাত যে সব ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত (যেমন, আবাসন), অথবা যে সমস্ত ক্ষেত্রে বেসরকারী খাত অনুৎসাহিত (যেমন, পানি ও বিদ্যুৎ)। সরকার নিজে এ সমস্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীর ভূমিকা পালন করে। আবার কিছু কিছু পাবলিক এন্টারপ্রাইজ আছে, যেখানে সরকার পুরো অথবা আংশিক অর্থায়ন করে থাকেন। এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমন্ডলী পরিষদে সরকারের প্রতিনিধি নিয়োজিত থাকেন। আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও কর্মী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে এ প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকটাই স্বাধীন। তবে নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে এসব প্রতিষ্ঠানকে সরকারের পক্ষ হতে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।[১০]

স্থানীয় প্রশাসন কাঠামো

বাংলাদেশ প্রশাসনিকভাবে ৬টি বিভাগে বিভক্ত। এ ছয়টি বিভাগ আবার ৬৪টি জেলায় বিভক্ত। জেলা পর্যায়ের নিচে পৌর ও গ্রামীণ স্তরে আরো উপবিভাজন রয়েছে। পৌর এলাকায় রয়েছে ছয়টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল এবং প্রতিটি কর্পোরেশন আবার বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভক্ত) এবং

Dhaka University Institutional Repository

২০১টি পৌরসভা (Municipalities)। সমগ্র দেশব্যাপী রয়েছে ৪৬০টি উপজেলা। এ উপজেলাগুলো আবার ৪৪৪১টি ইউনিয়নে বিভক্ত (এক একটি ইউনিয়ন পৌর এলাকার একেকটি ওয়ার্ডের প্রায় সমতুল্য)। এ ইউনিয়নগুলো ৬০,৩১৫টি মৌজা (গড়ে একেকটি মৌজা একটি গ্রামের চেয়ে সামান্য বড়) বা ৬৮,০০০ গ্রামে বিভক্ত। গ্রামীণ পর্যায়ের এই মৌজার উপবিভাজনের মতো পৌর এলাকায়ও রয়েছে সমউপবিভাজন, যাকে বলা হয় মহল্লা। আদম শুমারীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, একেকটি মহল্লা গড়ে ২৫০টি গৃহস্থ বাড়ি নিয়ে গঠিত। নব্বই দশকের শেষভাগে একটি গ্রামে বসবাস করতো গড়ে ১,৫০০ মানুষ। তার উপরে প্রায় ১৫টি গ্রাম নিয়ে গঠিত একেকটি ইউনিয়ন, যার গড় লোকসংখ্যা ২৪,৭০০ এবং তার উপরে ৮ থেকে ১০টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এক একটি থানা বা উপজেলা, যার গড় লোকসংখ্যা ২২২,০০০ জন। সারণি-৪.১-এ প্রশাসনিক বিন্যাস, গড় লোকসংখ্যা ও আয়তনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি- ৪.১: বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

পর্যায়	সংখ্যা	গড় জনসংখ্যা	গড় আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)
বিভাগ	৬	১৯.৭ মিলিয়ন	২৩,৯৩৩
জেলা	৬৪	১.৯ মিলিয়ন	২,৩০৬
থানা	৪৬০	২২০ হাজার	৩০২
ইউনিয়ন	৪৪৪১	২৪.৭ হাজার	৩৩
গ্রাম	৬৮,০০০	১.৫ হাজার	২

সূত্র: World Bank, *Government that Works*, 1996, p.149; UNDP, *Local Government in Bangladesh*, 1996, p. 20.

বিভাগ

সরকারের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নিচের স্তরেই রয়েছে বিভাগ। এ বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন বিভাগীয় কমিশনার (Divisional Commissioner), যিনি সরকারের একজন পদস্থ সাধারণজ্ঞ বিসিএস (generalist) কর্মকর্তা। বিভাগের সচরাচর কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে, সরকারের জেলা পর্যায়ের কাজগুলোর সমন্বয় করা, জেলা প্রশাসনের কর্মকান্ডে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও তদারক করা, জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলো সমন্বয় করা এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পর্যায়ের রাজস্ব অফিসারের সিদ্ধান্ত ও মতামত শোনা। একটু ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, বিভাগীয় কমিশনারের এই সমন্বয়কারীর ভূমিকা পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে কখনোই অতটা সক্রিয় ছিল, যতটা সক্রিয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে[১১]। পরবর্তীতে, ১৯৭১ সালের পর যতগুলো সরকার এসেছে প্রত্যেকটি সরকারের আমলেই বিভাগীয় কমিশনারের ভূমিকা গুরুত্ব হারিয়েছে। ফলশ্রুতিতে, অনেকেই

Dhaka University Institutional Repository

মন্তব্য করেছেন জেলা প্রশাসনের কর্মকাণ্ড তদারক করার ব্যাপারে বিভাগ একটি 'ডাকবাক্সের' ভূমিকা ছাড়া অন্য কিছুই পালন করে না।[১২]

জেলা

বাংলাদেশের একটি জেলার গড় আয়তন প্রায় ২৩০৬ বর্গকিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২ মিলিয়ন। স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসন অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। জেলা প্রশাসনের প্রধানকে সাধারণতঃ ডেপুটি কমিশনার বা ডিসি আখ্যায়িত করা হয়, যিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসভুক্ত প্রশাসনিক ক্যাডার কর্মকর্তা। তার প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম হলো: ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করা, 'জাতি গঠন' সংক্রান্ত সরকারের সকল কাজে সমন্বয়ন করা, স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার গঠন (যেমন ইউনিয়ন পরিষদ) উদ্যোগকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করা। কোন অপরাধের বিচার সংক্রান্ত কাজে অপরাধীকে তিনি সর্বোচ্চ দু' বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দিতে পারেন। ডিসি যে জেলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেখানে তিনি প্রায়ই ভ্রমণ করেন এবং তিনিই জেলা পর্যায় এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হন[১৩]।

এই ডেপুটি কমিশনার বা ডিসি ছাড়াও সরকারের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের 'কার্যক্রমগত' (Functional) বিভাগের অনেক মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা জেলা সদরে দায়িত্ব পালন করেন। তাদের মধ্যে সাধারণত: থাকেন একজন পুলিশ অধীক্ষক (Superintendent), একজন জেলা শিক্ষা অফিসার, স্কুলের জেলা পরিদর্শক (Inspector), জেরা স্বাস্থ্য অফিসার, একজন পৌর চিকিৎসক (Civil surgeon), একজন নির্বাহী প্রকৌশলী (রাস্তা), এবং আরো অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। এই কর্মকর্তাবৃন্দ ঢাকায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ের স্ব স্ব বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগকৃত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন। আবার কোন কোন কর্মকর্তা বিভাগীয় সদরের (যথা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট) সংশ্লিষ্ট line কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেও নিরীক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন। কিন্তু তারা সাধারণতঃ একটি দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীনে দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে থাকেন। সরকারের বিভিন্ন Functional বিভাগগুলোর মধ্যে সুসমন্বয়নের স্বার্থে এই কর্মকর্তাবৃন্দ ডেপুটি কমিশনারের সাধারণ তদারকির অধীনে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। এক কথায়, এই ডেপুটি কমিশনার এক ধরনের 'ক্ষুদ্র রাজ্যপাল/জেলাপাল বা শাসক' এবং সরকারের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের প্রধান প্রতিনিধি[১৪]।

Dhaka University Institutional Repository

কাগজে-কলমে জেলা প্রশাসকের ভূমিকা যাই থাকুক না কেন, বাস্তব অবস্থা একেবারেই ভিন্নতর। স্বাধীনতার আগে থেকেই বিভাগীয় কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারগণ স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছেন। ব্রিটিশ আমলের ভাইস রিগ্যাল (Viceregal) পদ্ধতির আদলে গড়ে উঠা এককালের জেলা প্রশাসনের কর্মকাণ্ড ও ডেপুটি কমিশনারের ভূমিকা বাংলাদেশে অনেকটা সঙ্কুচিত হয়েছে। বর্তমানে কার্যক্রমগত (Functional) ডিপার্টমেন্টগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ ডেপুটি কমিশনারের নিকট কোনভাবেই দায়বদ্ধ থাকতে রাজী নন। অবশ্য ডেপুটি কমিশনার তার অধীন থানা নির্বাহী কর্মকর্তার (TNO) মাধ্যমে থানা বা উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন[১৫]।

থানা বা উপজেলা

ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের শুরুর দিকে গ্রাম পর্যয়ে পুলিশ প্রশাসনকে সুগঠিত করার জন্য ১৭৯২ সালে 'থানা' নামক প্রশাসনিক একটি স্তর তৈরী করা হয়[১৬]। যা হোক, পরবর্তীতে এই থানা প্রশাসন কাঠামোতে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন, বিশেষ করে ১৯১১, ১৯৫৯ ও ১৯৮২ সালে[১৭]। ১৯৮২ সালে থানা পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে অভিনব প্রশাসনিক সংস্কার। উপনিবেশিক ও উত্তর-উপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে তৎকালীন ৪৬০টি থানাকে উপজেলায় উত্তরণ ঘটানো হয়েছে। প্রথমবারের মতো উপজেলা পর্যায়ে গঠিত পরিষদের চেয়ারম্যানের পদকে সরাসরি নির্বাচনের আওতায় আনা হয় এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রায় ১৫টি সরকারী ডিপার্টমেন্টের স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব উপজেলা চেয়ারম্যানকে দেয়া হয়। পাকিস্তান আমলে সৃষ্ট সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) ও সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) পদ দু'টিকে সমন্বয় করে থানা নির্বাহী অফিসার (TNO) নামে একটি পদে রূপান্তর করা হয়। গ্রামীণ পর্যায়ে এভাবে উন্নয়ন প্রশাসনকে তরান্বিত করার মাধ্যমে থানাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে সৃষ্টি করা হয়। বাড়ানো হয় প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য, নিয়োগ দেয়া হয় দক্ষ প্রশাসনিক ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক কর্মকর্তাবৃন্দ[১৮]। এরপর ১৯৯১ সালে উপজেলা পদ্ধতি বাতিল করে 'থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (Thana Development Coordination Committee) গঠন করা হয় যা আজ অব্দি প্রচলিত আছে। এই কমিটিতে উপজেলার অন্তভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণ পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করে থাকেন। যা হোক, একটি নির্বাচিত শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে থানা পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের সার্বিক ব্যবস্থাপনার ভূমিকা পালন করেন থানা নির্বাহী অফিসার (TNO)। থানা ও তার নিম্ন পর্যায়ে আর্থিক খাতের মূল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেন তিনি। তাই দেখা যায়, কর্যক্রমগত এজেন্সীর (Functional agencies) কর্মকর্তাগণ কোন সরকারি প্রজেক্টের আর্থিক

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়পত্রের জন্য থানা নির্বাহী অফিসারের অনুমতির প্রয়োজনে তার দ্বারস্থ হন। নির্বাহী অফিসার তার কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট জেলার ডিসির কাছে করে থাকেন।[১৯]

উপসংহার

বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে উপসংহার পর্বে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হলো, বিভাগ, জেলা এবং থানা বা উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা আজ অব্দি অপ্রতিনিধিত্বশীল ও আমলাতান্ত্রিকতার নিগড়ে আটকে রয়েছে। এই তিনটি স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত মূখ্য কর্মকর্তা সাধরণজ্ঞ প্রধানগণ অর্থাৎ বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার ও থানা নির্বাহী অফিসার এবং স্থানীয় পর্যায়ে লাইন এজেন্সীসমূহে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সবাই মূলত সরকারের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের প্রশাসনের প্রতিনিধিমাত্র। কেন্দ্রীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ীই তাদেরকে কাজ করতে হয়। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে পৌর ও গ্রামীণ এলাকায় নির্বাচিত পদ্ধতিতে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার গড়ে উঠেছে। উদারণস্বরূপ, পৌর এলাকায় ২০১টি পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যালটি এবং গ্রামীণ এলায় প্রায় ৪৪৪১টি ইউনিয়ন পরিষদ। জাতীয় সংসদে ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম পরিষদ এবং পরবর্তিতে ২০০৩ সালের প্রথমদিকে গ্রাম সরকার বিল পাসের মধ্য দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে। দেশের ছয়টি বড় মিউনিসিপ্যালটি - ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশালকে 'মেট্রোপলিটান' মর্যাদায় উন্নিত করে এদের নামকরণ সিটি কর্পোরেশন করা হয়েছে। বহুদিন থেকেই প্রত্যেকটি সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত হয়ে আসছিল একজন মনোনীত (nominated) মেয়রের দ্বারা যদিও বা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনারগণ নির্বাচনের বৈতরণী পার হয়ে আসতেন। যা হোক, ১৯৯৪ সালের মার্চ মাস থেকে প্রথমে চারটি মেট্রোপলিটন শহর[২০] (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) এবং পরবর্তিতে খুবই সম্প্রতি সিলেট ও বরিশাল মেট্রোপলিটন শহরে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত মেয়র দায়িত্ব পালন করছেন।

তথ্যনির্দেশ

১। দেখুন, Government of Bangldesh (GOB), *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh* (Dhaka: Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, 1998), Article 55(4)।

২। দেখুন, GOB, *Allocation of Busines Among the Different Ministries and Divison*, (Dhaka: Cabinet Division, revised up to August 2000)। উল্লেখ্য যে, তিনটি প্রধান বিভাগ, একটি মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ছাড়াও চারটি গুর□ত্বপূর্ণ নির্বাহী সংস্থা, যেমন জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী, দুর্নীতি দমন ব্যুরো ও বিনিয়োগ বোর্ড - নিয়ন্ত্রণও প্রধাণমন্ত্রীর কার্যলয়ের অধীন ন্যস্ত করা হয়েছে। গঠন প্রকৃতি ও কার্যবলীর বিপুলতা বিবেচনা করলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়কে 'রাষ্ট্রপতি সরকার' আমলের রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৩। দেখুন, GOB, *Rules of Business 1996* (Dhaka: Cabinet Division, revised up to August 2000), p. 1।

৪। দেখুন, GOB, *Secretariat Instructions* (Dhaka: Organization and Management Division, Cabinet Secretariat, 1976) p. 21 ।

৫। সচিবালয়ের পদসমূহে বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদেরকে নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে অনুসৃত কোটা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, GOB, *Extraordinari Gazette Notification* No. ME/SA-O/21/94 (Sect. 2/29), dated 10 February 1998 (Dhaka: Ministry of Establishment)।

৬। দেখুন, World Bank, *Govenment That Works* (Dhaka, 1996), p. 131।

৭। কারিগরী ও পেশাগত ক্যাডারসমূহ হতে নিয়োগপ্রাপ্ত সংযুক্ত অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রধানদেরকে সচিব বা অতিরিক্ত সচিবদের সমান বেতন গ্রেড প্রদান করা হলেও তাদেরকে সচিব বা অতিরিক্ত সচিবদের পদমর্যাদাসহ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেয়া হয় না। উল্লেখ্য যে, একমাত্র 'সচিবালয়' পদমর্যাদা কর্মকর্তাগণই সচিবালয় পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত পরবর্তী সকল আদেশ জারি ও নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা ভোগ করেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, GOB, *Rules of Business 1996* (Dhaka: Cabinet Division, revised up to August 2000), p. 17।

৮। দেখুন, Syed Giasuddin Ahmed, *Public Personnel Administration in Bangladesh* (Dhaka: University of Dhaka, 1986), pp. 150-56।

৯। দেখুন, Syed Giasuddin Ahmed, "Public Administration in the Three Decades", in A. M. Choudhury and Fakrul Alam (eds.), *Bangladesh on the Threshold of the Twenty-First-Century* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2002), p. 330।

১০। বাংলাদেশে পাবলিক কর্পোরেশন বা পাবলিক এন্টারপ্রাইজসমূহের বিস্তার ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, Rehman Sobhan and M. Ahmed, *Public Enterprise in an Intermediate Regime: A Study in the Political Economy of Bangladehs* (Dhaka: Bangladesh Institute of Development Studies, 1980); F. H. Yusuf, *Mationalization of Industries in Bangladesh* (Dhaka: National Institue of Local Government, 1985); H.M. Zafarullah, "Public Corporations in Bangladesh: An Assessment of their Administrative Aspects", *Indian Journal Administation* (1978), vol. 24, no. 4, pp. 990-98 ।

১১। দেখুন, Syed Giasuddin Ahmed, "Public Administration 1947-71", in M. Serajul Islam (ed.), *History of Bangladesh,* vol. 1 (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997), pp. 365-66।

১২। দেখুন, UNDP, *Report on Public Administration Sector Study in Bangladesh* (New York 1993), p. 45।

১৩। দেখুন, A. M. M. Shawkat Ali, *Aspects of Public Adminstration in Bangladesh* (Dhaka: Nikhil Proakashani, 1993), pp. 84-92; Najmul Abedin, *Local Administration and Politics in Modernising Societies: Bangladesh and Pakistan* (Dhaka: NIPA, 1973) ।

১৪। A.M.A. Muhith, *The Deputy Commissioner in East Pakistan* (Dhaka: NIPA, 1968), pp. 11-34।

১৫। দেখুন, UNDP, *Report on Public Administration Sector Study in Bangladesh* (New York 1993), p. 45।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। দেখুন, A. M. M. Shawkat Ali, *Aspects of Public Adminstration in Bangladesh* (Dhaka: Nikhil Proakashani, 1993); Najmul Abedin, *Local Administration and Politics in Modernising Societies: Bangladesh and Pakistan* (Dhaka: NIPA, 1973)।

১৭। দেখুন, Mahammed Anisuzzaman, *The Officer: A Study of His Role* (Dhaka, 1963), pp. 3-4।

১৮। দেখুন, Kamal Siddiqui (ed.), *Local Government in Bangladesh* (Dhaka, 1994), pp. 24-50।

১৯। GOB, *Manual on Upazila Administration*, vol. 1 (Dhaka: BGP, 1983)।

২০। দেখুন, Nazmul Islam, *Urban Governance in Asia* (Dhak: Centre for Urban Studies, 2000), pp. 11-15।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সিভিল সার্ভিস: সংস্কার পরবর্তী কাঠামো ও সমস্যাবলী

ভূমিকা

এই অধ্যায়ে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নতুন সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টি ভূমিকার অংশটি ছাড়াও চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত। ভূমিকা পরবর্তী দ্বিতীয় অংশটিতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ও জটিলতা এবং প্রাথমিক সংস্কার প্রচেষ্টার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা ও বেতন কাঠামো পুনর্গঠন কল্পে ১৯৭৬ সালে গঠিত সার্ভিসেস ও বেতন কমিশন কর্তৃক পেশকৃত প্রাসংগিক সুপারিশমালা ও মৌলিক নির্দেশনাসমূহ বিশ্লেষণ সহকারে আলোচিত হয়েছে। অধ্যায়ের চতুর্থ অংশে উক্ত কমিশন পেশকৃত সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সালে সিনিয়র সার্ভিসেস পুল (এসএসপি) ও ১৯৮১ সালে একীভূত "বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস" ব্যবস্থা গঠন এবং ১৯৮৯ সালে এসএসপি-এর বিলুপ্তি ও তৎপরবর্তী উদ্ভূত সমস্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে পঞ্চম অংশে গবেষকের মতামত ও সুপারিশসহ অধ্যায়টি উপসংহার টানা হয়েছে। যা হোক ভূমিকার বাকি অংশটুকুতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সূচনালগ্নে সিভিল সার্ভিস ও পাবলিক সেক্টরভুক্ত বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সর্বোমোট সংখ্যা নির্ণয় ও পরবর্তীতে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণসহ উপস্থাপন করা হল।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর হতেই বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোট সংখ্যা নির্ণয়ের লক্ষে বিভিন্ন সময় সরকারীভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৯৭৩ সালের মে মাসে জাতীয় বেতন কমিশন (১৯৭২) একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করে যেখানে দেখানো হয় মোট ৬,৫০,৬১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী উক্ত সময়ে বাংলাদেশ সরকারের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে কর্মরত ছিল। কিন্তু এই পরিসংখ্যানে ৪৮,০০০ জন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য এবং ২,০৫,৭৭৮ জন বেসরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যারা পূর্ববর্তী সময়ে সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে গণ্য হত না। কারণ তাদের বেতন এবং ভাতাদি বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ থেকে প্রদান করা হত না। পরের ২,০৫,৭৭৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করতেন ব্যাংক, ইন্সুরেন্স কোম্পানী এবং স্বাধীনতার পর জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে। উপরিউক্ত ৬,৫০,৬১৫ জন কর্মকর্তা-

Dhaka University Institutional Repository

কর্মচারীকে জাতীয় বেতন কমিশনের (১৯৭২) সুপারিশকৃত দশটি বেতন স্কেলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দশটি পৃথক সার্ভিস গ্রেডে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এই দশটি বেতন স্কেলের সর্বনিম্নটি ছিল টাকা ১৩০ এবং সর্বোচ্চটি ছিল টাকা ২০০০ (মাসিক)।[১] গ্রেড অনুসারে ৬,৫০,৬১৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অবস্থান সারণি ৫.১-এতে দ্রষ্টব্য।

সারণি ৫.১

ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা।

	গ্রেড										
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	মোট
১। মন্ত্রণালয়সমূহ	৭০	৩২৯	১০৮৪	১২৩৯	৮৫৯৩	১১৩৮৬	৩২০৫২	১৭২৩৯৯	১০৫২৬০	৬৪৪২৫	৩৯৬,৮৩৭
২। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় *											৪৮,০০০
৩। রেলওয়ে	১	৮	২৪	৬৫	১২৮	৩৩৩	২৭৫৫	১৪২৮০	১৯২৬১	২০৪৭১	৫৭,৮২৬
৪। স্বায়িত্বশাসিত সংস্থাসমূহ	৩৭	৪৮	২১৫	১২৩৭	১৪২২	৩০৭৯	৮৬৩৮	২৮৮২৪	১৮০৪৩	১৯৫৪৪	৮১,০৮৭
৫। ব্যাংক	৪	১৭	৭৫	১১২	১১৮৫	১৭০৪	২৪১৫	৭২৩৩	১১৫১	৩৮৬৮	১৭,৭৬৪
৬। ইন্সুরেন্স কোম্পনি	-	৪	১৯	৫৫	১২৬	২৩৫	৬৬০	৪৯৭	৬৬	২৭৫	১,৯৩৭
৭। আর্থিক প্রতিষ্ঠান	২	৪	১২	৪৫	১৩১	৩১৪	৪০২	১৬৪৪	৩৫২	৫০১	৩,৪০৭
৮। জাতীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩	২৭	৫৮	২৬০	৯০২	১০৯৭	৬৬০২	১৪৫৮৩	৩৮০৬	৮৮৪২	৩৬,১৮০
মোট	১১৭	৪৩৭	১৪৮৭	৩০১৩	১২৪৮৭	১৮১৪৮	৫৩৫২৪	২৩৯৪৬০	১৪৭৯৩৯	১১৭৯২৬	৬,৪২,৫৩৮
৯। শিক্ষা ও সংস্কৃত মন্ত্রণায়ের অধিনস্থ স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ	৬	১০৩	২৫৯	৬৪৮	৬৫৭	২০৯	৭৭৩	১৫৬০	৫০৯	৩৩৫৩	৮,০৭৭
সর্বমোট	১২৩	৫৪০	১৭৪৬	৩৬৬১	১৩১৪৪	১৮৩৫৭	৫৪২৯৭	২৪১০২০	১৪৮৪৪৮	১২১২৭৯	৬,৫০,৬১৫

* সামরিক বাহিনীর সদস্যদের গ্রেড ভিত্তিক সংখ্যা উল্লেখ করা হয় নি।

সূত্র: *Report of the National Pay Commission*, vol. I, (Main Text), Dacca, Bangladesh Government Press, 1973, p. 192, annexure V.

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন বিভাগও সরকারী অফিস এবং স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে কর্মরত মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য একটি জরিপ চালায়। জরিপের ফলাফল সম্বলিত রিপোর্টে মোট প্রায় ৪,৫৪,৪৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকার

Dhaka University Institutional Repository

কথা উল্লেখ করা হয় (সারণি ৫.২ দ্রষ্টব্য)। সারণি ৫.২-এ উল্লেখিত মোট কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে চারটি শ্রেণী অনুসারে ভাগ করা হয়েছে যা পাকিস্তান আমলে প্রচলিত ছিল। এতে দেখা যায় যে, প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল প্রায় ১১,১৩০ জন; এদের মধ্যে স্বায়ত্বশাসিত ও আধা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ৫,০০০ জনও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উপরন্তু, এই প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সাবেক পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের (সিএসপি) ১৮০ জন বাঙ্গালী অফিসার এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস বা ইপিসিএস-এর (নির্বাহী) ৭২৪ জন সদস্য ছিলেন।[২] সরকারী কর্মচারীদের অধিকাংশই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোট সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ২,৯০,৪৫০ জন কর্মরত ছিল প্রাদেশিক সচিবালয়ভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ এবং তাদের অধীনস্থ অফিসসমূহে। বাকি ১,৬৩,৬০০ জন কর্মরত ছিল স্বায়ত্বশাসিত ও আধা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে।[৩]

সারণি ৫.২

ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী অফিস, স্বায়েত্বশাসিত ও আধাস্বায়েত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা।

	সারকারী অফিসসমূহ	স্বায়িত্ব/আধাস্বায়িত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ	মোট	শতাংশ
প্রথম শ্রেণী	৬,১৩০	৫,০০০	১১,১৩০	২.৪
দ্বিতীয় শ্রেণী	৬,৩২০	৬,০০০	১২,৩২০	২.৬
তৃতীয় শ্রেণী	১৭৩,০০০	৭২,৫০০	২৪৫,৫০০	৫৪.০
চর্তুথ শ্রেণী	১০৫,৪০০	৮০,১০০	১৮৫,৫০০	৪১.০
মোট			৪৫৪,৪৫০	১০০

সূত্র: Bangladesh, Establishment Division, *Statistics on Civil Employees of the Government of Bangladesh*, Dacca, BGP, 1975, p. 2.

পরবর্তীতেও বিভিন্ন সময়ে পাবলিক সেক্টরভুক্ত সরকারী অফিস, স্বায়তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও করপোরেশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোট সংখ্যা নির্ণয়ের লক্ষে সংস্থাপন বিভাগ (১৯৯১ সাল হতে যার নামকরণ সংস্থাপন মন্ত্রণালয় করা হয়) জরিপ চালায়। ১৯৭১, ১৯৮২, ১৯৮৬, ১৯৯২, ১৯৯৬ এবং ১৯৯৭ সালে সংস্থাপন বিভাগ/মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত কর্মকর্তা-কর্মচারী গণনার উপর ভিত্তি করেই সারণি ৫.৩টি তৈরি করা হয়েছে। এই সারণিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের বিবিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তর, স্বায়িত্বশাসন প্রতিষ্ঠান ও করপোরেশনে এবং স্থানীয় পর্যায়ের সরকারী অফিসসমূহে প্রায় এক মিলিয়ন (সঠিক সংখ্যা ৯,৩০,৩৯১) কর্মকর্ত-কর্মচারী কর্মরত ছিল। উক্ত সালের এই

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যার শ্রেণীভিত্তিক বিভাজন অনুযায়ী ৮৭,৬৬৭ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা সরকারী চাকুরীতে কর্মরত ছিল; যাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রায় ৩৫,০০০ জন বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা[৪]।

এছাড়া সারণি ৫.৩টি বিশদভাবে পরীক্ষা করলে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হচ্ছে বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর তৃতীয় ও চর্তুথ শ্রেণীর কর্মচারীদের সংখ্যা ক্রমস্বয়েই বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে ১৯৭১ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সংখ্যা চারটি শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের মোট সংখ্যার ৫ শতাংশ ছিল, সেখানে ১৯৯৭ সাল এসে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সংখ্যা ৫ শতাংশ থেকে ১৪ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপরও সামগ্রিকভাবে ১৯৭১ সাল পরবর্তী ২৫ বছরে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সংখ্যা ক্রমস্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ এবং ১৯৯৭ সালে এদের সংখ্যা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোট সংখ্যার ৮০ শতাংশের উপরেই রয়ে গেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সার্থক অবদান রাখার ক্ষেত্রে কর্মচারীদের অধিকাংশই সমর্থ নয়।[৫]

সারণি ৫.৩

পাবলিক সেক্টরভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি।

	সাল					
শ্রেণী	১৯৭১	১৯৮২	১৯৮৬	১৯৯২	১৯৯৬	১৯৯৭
প্রথম	১১,১৩০	৫৬,১০০	৬০,১০৬	৭৮,৬৮৫	৮৩,৩৩৬	৮৭,৬৬৯
	(২)	(৭)	(৬)	(৮)	(৭)	(৯)
দ্বিতীয়	১২,৩২০	১৮৭,৭০০	৩২,০৪২	৩৬,৮৫৮	৩৮,০৪৬	৪৩,৭৩১
	(৩)	(২৪)	(৩)	(৪)	(৪)	(৫)
তৃতীয়	২৪৫,৫০০	৩০৮,৭০০	৫৯৪,৩০০	৫৭৯,৮৪২	৫৯৬,৭৭০	৫৯৭,১৯৫
	(৫৪)	(৪০)	(৫৫)	(৬১)	(৬৪)	(৬৪)
চতুর্থ	১৮৫,৫০০	২২৬,৫০০	৩৮৬,৪০৬	২৫১,৩৬৪	২১২,০০৮	২০১,৭৯৬
	(৪১)	(২৯)	(৩৬)	(২৭)	(২৩)	(২২)
মোট	৪৫৪,৪৫০	৭৭০,০০০	১,০৭২,৮৫৪	৯৪৬,৭৪৯	৯৩০,১৯৩	৯৩০,৩৯১
	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)

নোট: বন্ধনীর ভেতর শতাংশ দেখান হলো।

সূত্র: Syed Giasuddin Ahmed. "Public Administration in the Three Decades", in A.M. Choudhury and Fakrul Alam (eds.), *Bangladesh on the Threshold of the Twenty-first Century* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2002), p. 342.

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানী উত্তরাধিকার ও উদ্ভূত জটিলতা

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ পাকিস্তান আমলের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই উভয় পর্যায়ে কর্মরত বাঙালী সিভিল সার্ভেন্টদের উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। এদের সকলেই চারটি পৃথক শ্রেণীতে বিন্যস্ত (অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণী) চাকুরীসমূহে অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীর কেন্দ্রীয় সার্ভিসসমূহ দুটি বড় অংশে বিভক্ত ছিল, যেমন "নিখিল পাকিস্তান সার্ভিসসমূহ" এবং "সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসসমূহ"। প্রথম শ্রেণীর কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহ আবার ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার সার্ভিসে বিভক্ত ছিল। সুনির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে গঠিত ক্যাডার সার্ভিসে অনেক পদ রাখা হয়েছিল যেখানে একটি পৃথক পদসোপান এবং সোপানের প্রত্যেক স্তরের কার্যবিবরণী ছিল। ক্যাডার সার্ভিসে সাধারণত লোক নিয়োগ করা হতো পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। অন্যদিকে, নন-ক্যাডার সার্ভিস ছিল পদভিত্তিক, এতে কোন আনুভূমিক (Horizontal) এবং উল্লম্ব (Vertical) শ্রেণী বিভাজনগত কোন নির্দিষ্ট কাঠামো বা পদবিন্যাস ছিল না। ক্যাডার সার্ভিসের সদস্যরা এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে বদলী হতে পারতেন, পক্ষান্তরে নন-ক্যাডার কর্মকর্তারা শুধুমাত্র নিয়োগপ্রাপ্ত বিভাগেই চাকুরী করতেন।[৬]

কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের সার্ভিসসমূহ চারটি শ্রেণীতে (অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ) Horizontally বিভক্ত ছিল। এই শ্রেণীগত বিভাজনটি করা হয়েছিল দায়িত্ব, কাজের ধরণ (অর্থাৎ প্রশাসনিক, নির্বাহী, করনিক এবং বার্তাবাহিক), নিয়োগের প্রকৃতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে। সকল সরকারী কর্মচারীকে আবার বৃহৎ অর্থে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছিল, যেমন "গেজেটেড" এবং 'নন-গেজেটেড'। প্রথম শ্রেণীর সকল কর্মকর্তা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কিছু সংখ্যক কর্মকর্তাকে গেজেটেড অফিসার হিসেবে বিবেচনা করা হত। কারণ, তাদের নিয়োগ, পোস্টিং, বদলী, পদোন্নতি ও অবসর গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি অফিসিয়াল গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো।[৭]

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে যে অঞ্চল স্বাধীন বাংলাদেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে) ২৪টি নিয়মিতভাবে গঠিত চাকুরীসমূহের একটি কাঠামো ছিল (তৃতীয় অধ্যায়ের সারণি ৩.২ দ্রষ্টব্য)। প্রাদেশিক চাকুরী কাঠামো অনেকটা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সার্ভিস কাঠামোর মতোই ছিল, যদিও প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহের চাকুরী শর্তাবলী কেন্দ্রীয় সার্ভিসসমূহের তুলনায় নিকৃষ্ট বিবেচিত হত। প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ছিল। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সার্ভিসসমূহের মতই প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহ তিনভাগে বিভক্ত ছিল, যথা জেনারেলিস্ট-

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেস্ (ইপিসিএস এবং পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয় সার্ভিস বা ইপিএসএস), স্পেশালিস্ট সার্ভিসেস্ (যথা স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রকৌশল সার্ভিস) এবং বৃত্তীয় বা Functionalist সার্ভিসসমূহ (যথা পুলিশ এবং কর সার্ভিস)। দ্বিতীয়ত, প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহও কেন্দ্রীয় শ্রেণী বিভাগের মত চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত ছিল, যেমন প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী এবং চতুর্থ শ্রেণী। কিছু কিছু সার্ভিসে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং দ্বিতীয় শ্রেণী হতে প্রথম শ্রেণীতে পদোন্নতি পাবার সীমিত সুযোগ ছিল; কিন্তু চতুর্থ শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে পদোন্নতি পাবার কোন সুযোগই ছিল না। তৃতীয়ত, প্রাদেশিক সার্ভিসসমূহের বেশ কয়েকটির প্রত্যকটিকে আবার প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণী, 'সিনিয়র' এবং 'জুনিয়র' অথবা 'উচ্চতর' ও 'নিম্নতর' এইরূপ দুইটি ক্যাটগরিতে বিভক্ত করা হয়েছিল। চতুর্থত, প্রাদেশিক পর্যায়ে কর্মরত সিভিল সার্ভেন্টদের বেতন স্কেল কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বেতন স্কেলের তুলনায় বেশ কম ছিল। এছাড়া প্রাদেশিক সরকারে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অনুসৃত অসংখ্য বেতন স্কেল যৌক্তিক একটি বেতন কাঠামোর সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। পঞ্চমত, প্রাদেশিক পুলিশ সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মধ্যে হতে যাদেরকে যেখানে পিএসপি ক্যাডারের উর্ধ্বতন পদে নিয়োগ দান করা হতো এবং যারা পরবর্তীতে নিয়মিতভাবেই পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসের (পিএসপি) সদস্য হিসেবে গণ্য হতেন, সেখানে ইপিসিএস কর্মকর্তারদের মধ্য হতে যাদেরকে সিএসপি ক্যাডারের "তালিকাভুক্ত পদসমূহে"[৮] নিয়োগ দেয়া হতো তারা কখনই পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যপদ পেতেন না।[৯]

সাবেক পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ একটি প্রদেশকে ঘিরে প্রতিষ্ঠিতী সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত সার্ভিসসমূহের হঠাৎ সংযোজন সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রটি বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক কাঠামোকে বাজটিল করে তোলে। উপরন্তু, স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাকিস্তান আমলের সিভিল সার্ভেন্টদের সনাতনি কায়দায় প্রভুত্ব চালিয়ে যাবার জন্য মোটেই অনুকুল ছিল না। বস্তুত, পাকিস্তান আমলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নস্যাতকারী সামরিক জেনারেলদের সাথে আমলাদের ঘনিষ্ঠতা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে তাদের অবস্থান খুব সম্মানজনক ছিল না।[১০] স্বাধীনতা পরবর্তী সার্ভিস কাঠামোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ইপিসিএস এবং সিএসপি অফিসাদের মধ্যেকার দীর্ঘস্থায়ী ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইপিসিএস কর্মকর্তারা (স্বাধীনতার সময়ে যাদের সংখ্যা ছিল ৭২৪) দাবি জানায় যে, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাবের পরে ইপিসিএস-কে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একমাত্র সাধারণজ্ঞ প্রশাসনিক ক্যাডার হিসেবে বিবেচনা করা এবং সাবেক সিএসপি বাঙালী সদস্যদেরকে পদচ্যুত করে বাংলাদেশের নতুন প্রশাসনিক কাঠামোতে সম্পূর্ণ নতুনভাবে নিয়োগ করতে হবে। বিশেষ করে তারা দাবী করে যে, নব গঠিত সাধারণজ্ঞ একটি ক্যাডারে সাবেক দুই সার্ভিসের (অর্থাৎ,

Dhaka University Institutional Repository

সিএসপি এবং ইপিসিএস) অফিসারদেরকে ক্যাডারভুক্ত করার ক্ষেত্রে অতীতে তাদের স্ব স্ব সার্ভিসের মেয়াদের ভিত্তিতে পদমর্যাদা এবং inter-se জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হতে হবে।[১১]

অতীতে প্রশাসনিক সার্ভিসমূহের (সিএসপি এবং ইপিসিএস) সদস্যরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় পর্যায়ে প্রশাসনিক কাঠামোতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল এবং এই কারণে Functionalist এবং স্পেশালিষ্ট সার্ভিসসমূহের সদস্যদের মনে দীর্ঘদিন ধরেই দারুণ ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টী ছিল। উল্লেখ্য যে, বিংশ শতাব্দীর তিন দশক থেকে বর্ধিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে Functionalist এবং স্পেশালিষ্টদের সংখ্যা ক্রমবয়েই বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে Functionalist এবং স্পেশালিষ্টরা ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া সিভিল সার্ভিস কাঠামোর অনমনীয়তার অবসান ঘটিয়ে Functional বা Technical পদ থেকে প্রশাসনিক পদে যাবার দাবী জানিয়ে আসছিল। তারা সব কয়টি সিভিল সার্ভিস ক্যাডারভুক্ত সকল সদস্যদের পদমর্যাদা, অবস্থান ও বেতন এবং উচচতর পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (যা কেবল পূর্বে নির্দিষ্টভাবে সাধারণজ্ঞ প্রশাসকদের জন্য সংরক্ষিত ছিল) বিষয়ে সমতা আনার জন্য চাপ দেয়।[১২]

বাংলাদেশে সম্ভাব্য নতুন সার্ভিস কাঠামোতে আমুল পরিবর্তন আনয়ন লক্ষে Functionalist এবং স্পেশালিষ্টদের দাবীসমূহের পাশাপাশি নতুন আরো কিছু ধারণা আসতে শুরু করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে। এই ধারণাসমূহের এমনই একটি ছিল এই যে, মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে প্রশাসনিক নেতৃত্ব এবং সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষিত একটি রাজনৈতিক ক্যাডারের অস্তিত্ব। এই ধারণা প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাখ্যাত হয় বিশিষ্ট কয়েকজন অর্থনীতিবিদের তত্ত্বাবধানে রচিত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পানায় (১৯৭৩-১৯৭৮)[১৩]। বিশেষ করে অর্থনীতিবিদরা এই যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, জনগণকে দীর্ঘ দিনের উপনিবেশিক মূল্যবোধ এবং প্রথার প্রভাব থেকে মুক্ত করে বড় মাপের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপ নেবার ক্ষেত্রে সনাতন ভাবধারায় আচছন্ন আমলাদের মধ্যে রয়েছে সঠিক প্রশিক্ষণ, মুক্তচিন্তা এবং আদর্শগত দৃঢ়তার অভাব। তারা না পারত মৌলিক কোন পরিবর্তন আনতে, না পারত সামাজিক পরিবর্তনের অনুঘটক হতে। "শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক ক্যাডারের সদস্যদের দ্বারাই জনগণকে সঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে বড় মাপের কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভবপর"[১৪]। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশে ঘটমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবতর্নসমূহ নির্দেশ করে যে সনাতন ভাবধারা আচছন্ন আমলাদেরকে অবশ্যই পরিবর্তিত সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে[১৫]।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক সংস্কার উদ্যোগ

স্বাধিনতার পর পরই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কমিশন গঠিত হয়। একটি Administrative and Services Reorganization Committee বা ASRC এবং অন্যটি National Pay Commission বা NPC। এএসআরসি গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে।[১৬] পরিবর্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং জনগণের অর্থনৈতিক প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতি রেখে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সরকারী চাকরি ব্যবস্থাকে পরীক্ষা করে দেখা এবং চাকরির কাঠামোগত দোষ ও অসঙ্গতি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করাই ছিল মোজাফ্ফর কমিটির প্রধান দায়িত্ব।[১৭] পক্ষান্তরে, সাবেক সচিব আব্দুর রবের নেতৃত্বে এনপিসি গঠিত হয়েছিল জনগণের দৈনন্দিন ব্যয়ভার এবং সদ্য সৃষ্ট রাষ্ট্রের সীমিত সম্পদের প্রতি লক্ষ রেখে তৎকালীন বেতন কাঠামো পরীক্ষা করে নতুন একটি জাতীয় বেতন কাঠামো সুপারিশ করার জন্য।[১৮]

মোজাফ্ফর কমিটি ১৯৭৩ সালে তাদের পেশকৃত প্রতিবেদনে একটি একক শ্রেণীহীন ১০ গ্রেডভুক্ত সিভিল সার্ভিস কাঠামো সুপারিশ করে (১ গ্রেড থেকে ১০ গ্রেড পর্যন্ত)। সুপারিশকৃত প্রতিটি গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত পদসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় বেতনক্রম যা দক্ষতা এবং দায়িত্বের মাপকাঠিতে নির্ধারিত হতে হবে এবং বর্তমান পদসমূহকে গ্রেডভুক্ত করার পূর্বে প্রতিটি পদের ব্যাপক কর্মবিশ্লেষণ (job analysis) করার উপরও কমিটি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। এছাড়া, সম্ভাব্য একটি সিভিল সার্ভিস কাঠামো সুপারিশ করতে গিয়ে কমিটি জোর দিয়ে বলেন যে, (১) কোন বিশেষ শ্রেণী বা ক্যাডারভুক্ত সদস্যদের জন্য সচিবালয়ের পদ সংরক্ষণ রাখা যাবে না; (২) প্রত্যেক কর্মকর্তা তার প্রতিষ্ঠিত মেধার ভিত্তিতে সার্ভিস কাঠামোর শীর্ষতম পদে নিয়োগ লাভের সুযোগ পাবেন; এবং (৩) উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যারা জাতীয় প্রশাসনিক সদর দপ্তরে (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সচিবালয় বা নীতি নির্ধারণী মন্ত্রণালয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী দপ্তরসমূহ) সংস্থা প্রধান হিসেবে কর্মরত থাকবেন, তাদেরকে সময়ে সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে দপ্তরসমূহেও পাঠানো হবে - যাতে করে তারা বাস্তবভিত্তিক সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন এবং জনগণের সঙ্গে এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন।[১৯]

১৯৭৩ সালের মে মাসে জাতীয় বেতন কমিশন মোজাফ্ফর কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত দশটি সার্ভিস গ্রেড-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাশাপাশি দশটি জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করে তাদের রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন। সুপারিশকৃত এই দশটি বেতন স্কেলের সর্বনিম্নটি ছিল টাকা ১৩০ এবং সর্বোচ্চটি ছিল টাকা ২০০০ (মাসিক)।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, মোজাফ্ফর কমিটির রিপোর্ট কখনই জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয় নি। সুপারিশকৃত দশটি একক সার্ভিস গ্রেড সম্পর্কেও তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কোন বিবৃতি দেয় নি। কিন্তু এনপিসির মূল রিপোর্ট (ভলিউম-১) ১৯৭৩ সালের মে মাসে জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টটি প্রকাশের পর পরই আওয়ামী লীগ সরকার এনপিসির সুপারিশকৃত দশটি জাতীয় বেতন স্কেল সরকারীভাবে গ্রহনের একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রদান করে।[২১] ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে দশটি বেতন স্কেলের মধ্যে হতে নিম্নতর ছয়টি স্কেলের (১০ থেকে ৫) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়।[২২]

জাতীয় বেতন স্কেলের উচ্চতর চারটি স্কেল (৪ থেকে ১) বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত হাতে নেওয়া সম্ভব হয় নি। পাকিস্তান আমলে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য প্রচলিত বেতন স্কেলসমূহকে এনপিসি সুপারিশকৃত চারটি পৃথক জাতীয় বেতন স্কেলে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বেতন, পদ এবং সার্ভিস গ্রেডে বড় রকমের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়।[২৩] উপরুন্ত, ১৯৭২ সালের পর থেকে জীবনযাত্রার দৈনন্দিন ব্যয় ক্রমন্বয়েই বাড়তে থাকায় এনপিসি কর্তৃক সুপারিশকৃত বেতন কাঠামোর গ্রহণযোগ্যতা দারুণভাবে কমতে থাকে। ফলে সাবেক দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা এনপিসি সুপারিশকৃত নতুন বেতন স্কেলের ভিত্তিতে বেতন-ভাতাদি পেতে থাকেন। অন্যদিকে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তারা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী প্রবর্তিত বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন পেয়ে আসছিলেন। ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নবগঠিত সংস্কার কমিশন অর্থাৎ Pay and Services Commission (বেতন ও সার্ভিসেস কমিশন) কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশের আলোকে ১৯৭৭ সালের জুলাই মাস হতে প্রবর্তিত নতুন জাতীয় বেতন কাঠামোর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে বেতন ব্যবস্থাপনায় এক ধরনের দ্বৈত নীতি অনুসৃত হচ্ছিল।[২৩]

বেতন ও সার্ভিসেস কমিশন ১৯৭৬

১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নতুন সরকার এনপিসি সুপারিশকৃত জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়ন বন্ধ করে দেয়। এই সময়ে এক সরকারী ভাষ্যে বলা হয় যে, "ইতিমধ্যে ঘটে গেছে আর্থ-সামাজিক বিরাট পরিবর্তন এবং এরই ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অসংখ্য বেতন স্কেল এনপিসি সুপারিশকৃত মাত্র কয়েকটি স্কেলে সীমিত করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বহুবিদ সমস্যা"।[২৫] সরকার তাই ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাবেক সচিব এ. রশিদের নের্তৃত্বে Pay and Services Commission (বেতন ও সার্ভিসেস্ কমিশন) নামে নতুন একটি সংস্কার কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নবগঠিত এই কমিশনকে বলা হয় তৎকালীন সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা ও বেতন কাঠামো বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা ও কাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধান লক্ষে সুপারিশমালা যথাশীঘ্র সম্ভব সরকারের কাছে পেশ করার জন।[২৬] বেতন ও সার্ভিসেস কমিশন রশিদ কমিশন নামেও পরিচিত ছিল।

১৯৭৭ সালের মে মাসে রশিদ কমিশন কয়েক ভলিউম ও পার্ট সম্বলিত বিপুলায়তন এক রিপোর্ট পেশ করেন। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল: (১) দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ; (২) জেনারেলিস্ট-স্পেশালিস্ট দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিকের উপর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা; (৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাছাইকৃত ছাত্রদের সিভিল সার্ভিসের প্রতি মনোভাবের উপর গবেষণা প্রতিবেদন (ভলিউম-২, পার্ট-১); এবং (৪) বিভিন্ন সার্ভিস সমিতি, কর্মচারী ইউনিয়ন/সংঘ এবং অন্যান্য পেশাজীবী গ্রুপ ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে কমিশন বরাবর পেশকৃত অসংখ্য স্মারকলিপি (ভলিউম-৫, পার্ট-১)। চাকুরীসমূহের পুনর্বিন্যাস লক্ষে রশিদ কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত মৌলিক কয়েকটি নির্দেশিনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য:

১. 'সিভিল সার্ভিস' বলতে প্রতিরক্ষা সার্ভিসসমূহ ছাড়া সরকারী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত অন্যান্য সকল প্রকারের বেসামরিক চাকুরীসমূহকে নির্দেশ করে বলে বুঝতে হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাকিস্তান আমলে ও তৎপূর্ব সময়ে শুধুমাত্র সাধারণজ্ঞ সিভিল সার্ভিসসমূহকেই (উদাহরণস্বরূপ, আইসিএস, সিএসপি ও ইপিসিএস) সিভিল সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা হত।

২. জাতীয় সিভিল সার্ভিস পদসোপানভিত্তিক চারটি প্রধান চাকুরি স্তরে বিন্যস্ত হতে হবে। উদাহরণসরূপ - (ক) প্রশাসনিক উধ্বর্তন ব্যবস্থাপনা এবং বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠি; (খ) কার্যনির্বাহী ও মধ্যস্তরীয় ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠি; (গ) পরিদর্শক, করনিক, কারিগরি এবং সহায়তা প্রদানকারী গোষ্ঠী; এবং (ঘ) সংবাদবহক, নথিপত্র রক্ষক এবং দারোয়ান বা পাহারাদার।

৩. বেশ কয়েকটি কার্যভিত্তিক ক্যাডার সার্ভিস (যেমন, প্রশাসনিক, পুলিশ, স্বাস্থ, প্রকৌশল ইত্যাদি) গঠন করতে হবে এবং প্রত্যেকটি ক্যাডারভুক্ত চাকুরিসমূহকে দুইটি স্তরে (অর্থাৎ প্রশাসনিক ও নির্বাহী) বিন্যাস্ত করতে হবে।[২৭]

৪. যে কোন ক্যাডার সার্ভিসভুক্ত একজন সদস্য তার যোগ্যতা, দক্ষতা ও মেধার ভিত্তিতে উচ্চতর প্রশাসনিক পদে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

৫. সার্বিক অভিজ্ঞতা, প্রশাসনিক নেতৃত্ব এবং উচ্চ পর্যায়ে সমন্বয় সাধন দক্ষতা এবং তৎসহ যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মভিত্তিক গোষ্ঠি বা ক্যাডারভুক্ত সদস্যদের মধ্য হতে বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি উচ্চতর নীতি প্রণয়ন পুল (Superior Policy Pool) গঠিত হবে।

রশিদ কমিশন উপরি উল্লেখিত ৩নং নিদের্শনা অনুযায়ী ২৯টি কার্যভিত্তিক ক্যাডার সার্ভিস গঠনের সুপারিশ করে। এই ক্যাডার সার্ভিসসমূহের প্রত্যেকটিতে 'ক' ও 'খ' (অর্থাৎ প্রশাসনিক ও নির্বাহী) এই দুইটি স্তরভিত্তিক অংশ থাকার কথা বলা হয়েছে। সুপারিশকৃত এই ২৯টি ক্যাডার সার্ভিসের তালিকা সারণি ৫.৪-এ দেয়া হলো:

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৫.৪
রশিদ কমিশন সুপারিশকৃত ২৯টি ক্যাডার সার্ভিস।

1.	Bangladesh Administrative Service
2.	Bangladesh Agriculture Service
3.	Bangladesh Ansar Service
4.	Bangladesh Audit and Accounts Service
5.	Bangladesh Customs and Excise Service
6.	Bangladesh Defence Civil Service
7.	Bangladesh Defence Intelligence Service
8.	Bangladesh Economic Service
9.	Bangladesh Education Service (General)
10.	Bangladesh Education Service (Technical)
11.	Bangladesh Engineering Service (Public Health)
12.	Bangladesh Engineering Service (Public Works)
13.	Bangladesh Engineering Service (Roads and Highways)
14.	Bangladesh Fisheries Service
15.	Bangladesh Foreign Service
16.	Bangladesh Forest Service
17.	Bangladesh Food Service
18.	Bangladesh Health Service
19.	Bangladesh Information Service
20.	Bangladesh Judicial Service
21.	Bangladesh Livestock Service
22.	Bangladesh Military Lands and Cantonment Service
23.	Bangladesh Police Service
24.	Bangladesh Postal Service
25.	Bangladesh Railway Service
26.	Bangladesh Secretariat Service
27.	Bangladesh Statistical Service
28.	Bangladesh Taxation Service
29.	Bangladesh Trade Service

সূত্র: COB (Cabinet Division), *Report of the Pay and Services Commission: Part-I* – The Services (volume-I), (Dhaka, 1977), p. 78।

এছাড়া, রশিদ কমিশন ৫২টি বেতন স্কেল সম্বলিত নতুন একটি জাতীয় বেতন কাঠামোও প্রবর্তণের সুপারিশ করে। সুপারিশকৃত এই ৫২টি স্কেলের সর্বনিম্নটি ছিল টাকা ২৩০ এবং সর্বোচ্চটি টাকা ৪০০০ (মাসিক)।[২৮] বেতন কাঠামো সম্পর্কিত সুপারিশমালায় নিম্নোক্ত কয়েকটি মৌলিক নীতি সমুন্নত রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে:

Dhaka University Institutional Repository

১. সিভিল সার্ভিসভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি অবশ্যই সার্ভিস বহির্ভূত বাণিজ্যিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. যদিও বাংলাদেশে অদক্ষ শ্রমের যোগান যথেষ্ট পরিমানে রয়েছে, এই শ্রেণীর কর্মিদের পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যাপারটি যোগান ও চাহিদার মাপকাঠিতে নির্ধারিত না হয়ে কর্মিদের জীবনধারণ সহায়ক চাহিদার সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত।

৩. যেহেতু বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী বাংলাদেশে প্রশাসনিক এবং আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রমে জড়িত রয়েছে (যাদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় অনেক সময়ই কঠিন), সিভিল সার্ভিসে সম্পৃক্তদের বেতন-ভাতাদি সর্বক্ষেত্রে সরাসরি তাদের কর্ম-উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়।

৪. একটি জাতীয় বেতন কাঠামো এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে করে সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন স্তরভিত্তিক পদসমূহে সক্ষম এবং যোগ্যতম ব্যক্তিদেরকে আকর্ষণ করা সম্ভবপর হয়।

৫. বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ অবশ্যই যেন তাদের জীবন যাপনের ব্যয় ভারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

৬. যে সকল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকুরীপূর্ব কারিগরী এবং বৃত্তিমূলক যোগ্যতার শর্ত আরোপিত হবে সে সকল পদের বেতন-ভাতাদি স্বাভাবিক স্কেলের উর্ধ্বে নির্ধারণ অথবা নিয়োগপ্রাপ্তকে এক বা একাধিক ইনক্রিমেন্টসহ উচ্চতর বেতন প্রদান করতে হবে।[২৯]

রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদ সদস্যগণ রশিদ কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখেন। পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষে পরিষদ সদস্যদের নেতৃত্বে পাঁচটি পৃথক সাব-কমিটি গঠিত হয়। এই সাব-কমিটিসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয় কমিশনের সুপারিশমালার বিভিন্ন দিক পরীক্ষ-নিরীক্ষা করে সম্ভাব্য একটি সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা ও একটি সমন্বিত বেতন কাঠামো প্রবর্তন উদ্দেশ্যে বিস্তারিত কর্মপন্থা নির্ধারণ করার জন্য। তৎকালীন বাস্তব অবস্থা এবং পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে পেশকৃত সুপারিশসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনী সংশোধনী প্রস্তাব রাখার ব্যাপারেও কমিটিসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হয়।[৩০] অতঃপর, ১৯৭৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর সরকার এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে "Services (Grades, Pay and Allowances) Order, 1977" [সার্ভিসেস্ (গ্রেড, বেতন ও ভাতাদি) অর্ডার, ১৯৭৭] - এই শিরনামে এক আদেশ জারি করে। জারিকৃত এই আদেশ বলে ২১টি সমন্বিত সার্ভিস গ্রেড ব্যবস্থা এবং পাশাপাশি ২১টি বেতন স্কেল সম্বলিত একটি জাতীয় বেতন কাঠামো প্রবর্তন করে। প্রবর্তিত বেতন কাঠামোতে সর্বনিম্ন স্কেল টাকা ২২৫ এবং সর্বোচ্চ টাকা ৩০০০ (মাসিক) নির্ধারিত হয়[৩১] (সারণি ৫.৫ দেখুন)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৫.৫

নতুন জাতীয় সার্ভিস গ্রেড ও বেতন স্কেল ১৯৭৭

সার্ভিস গ্রেড	বেতন স্কেল
১	টাকা ৩০০০ (নির্ধারিত)
২	টাকা ২৮৫০ (নির্ধারিত)
৩	টাকা২৩৫০-১০০-২৭৫০
৪	টাকা ২১০০-১০০-২৬০০
৫	টাকা ১৮৫০-৭৫-২৩৭৫
*৬	টাকা ১৭০০-৭৫-২২২৫
*৭	টাকা ১৪০০-৭৫-২০০০
৮	টাকা ১১৫০-৬৫-১৮০০
৯	টাকা ৯০০-৫৫-১২৮৫-৬৫-১৬১০
১০	টাকা ৭৫০-৫০-৯০০-ইবি-৫৫-১২৩০-৬০-১৪৭০
১১	টাকা ৬২৫-৪৫-৯৮৫-ইবি-৫৫-১৩১৫
১২	টাকা ৪৭০-৩৫-৬৪৫-ইবি-৪৫-৯১৫-৫৫-১৩৩৫
১৩	টাকা ৪২৫-৩০-৫৭৫-ইবি-৪০-৭৩৫-৫০-১০৩৫
১৪	টাকা ৪০০-২৫-৫২৫-ইবি-২৫-৮২৫
১৫	টাকা ৩৭০-২০-৪৭০-ইবি-২৫-৭৪৫
১৬	টাকা ৩২৫-১৫-৪৩০-ইবি-২০-৬১০
১৭	টাকা ৩০০-১২-৩৯৬-ইবি-১৮-৫৪০
১৮	টাকা ২৭৫-১০-৩৭৫-ইবি-১৫-৪৮০
১৯	টাকা ২৫০-৬-২৮০-ইবি-৮-৩৬০
২০	টাকা ২৪০-৬-২৮২-ইবি-৭-৩৪৫
২১	টাকা ২২৫-৬-৩১৫

নোট: তারকা চিহ্নিত স্কেল দুটি পরবর্তীতে একত্রিত করে টাকা ১৪০০-৭৫-২২২৫ বেতন স্কেলে রূপান্তরিত করা হয়। এর ফলে একুশটি জাতীয় বেতন স্কেলের স্থলে ২০টি জাতীয় স্কেল নির্ধারিত হয়।

সূত্র: GOB, Ministry of Finance, *Introduction of New National Grades and Scales of Pay*, Dacca, BGP, 1977, p.2.

১৯৭৭ সালের সার্ভিসেস (গ্রেড, বেতন ও ভাতা) ব্যবস্থাটি ছিল একটি বেতন পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন স্তরের সার্ভিসসমূহের গ্রেডভিত্তিক শ্রেণীকরণ পদ্ধতি। প্রথমত, বেতন কাঠামোটি বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিস ও স্বায়েত্বশাসিত এবং আধাস্বায়েত্বশাসিত সকল প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণী ও পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিম্নতর হতে উচচতর ২১টি বেতন গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা। দ্বিতীয়ত, ২১টি সার্ভিস গ্রেড ব্যবস্থাটি ছিল একটি শ্রেণীকরণ পদ্ধতি যেখানে পদসোপানের প্রত্যেক গ্রেডের বিভিন্ন পদের করণীয় কার্যের প্রকৃতি ও দায়িত্বের

Dhaka University Institutional Repository

পরিধির উপর ভিত্তি করেই সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য পাবলিক সেক্টরভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল পদকে ২১টি সমন্বিত ক্রমিক গ্রেডে ভাগ করার পরিকল্পনা। কোন একটি গ্রেডভুক্ত পদসমূহে অবস্থানকারীদের সংশ্লিষ্ট গ্রেডের প্রয়োজন মাফিক শিক্ষাগত যোগ্যতা, মানসিক দৃঢ়তা এবং শারীরিক সক্ষমতার সামঞ্জস্যপূর্ণতা নির্দেশ করে। সুতরাং, সারণি ৫.৫-এ তালিকাভুক্ত সার্ভিস গ্রেডসমূহ কাজের জটিলতা ও দায়িত্বের পরিমানের ভিত্তিতেই অধঃক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। এই গ্রেডসমূহের ক্রমবিন্যাস অফিসিয়াল পদসোপানে প্রতিটি গ্রেডে অবস্থানকারীর পদমর্যাদা নির্দেশ করে।[৩২]

বাস্তবায়ন

১৯৭৭ সালের পহেলা জুলাই তারিখ হতে নতুন ২১টি সার্ভিস গ্রেড ও বেতন স্কেল ব্যবস্থাটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া মোটেই ঝঞ্ঝাটমুক্ত ছিল না। বাস্তবায়িত নতুন সার্ভিস গ্রেড এবং বেতন স্কেলে প্রতিস্থাপন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বেশীর ভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অসন্তোষ প্রকাশ করে। পূর্বের শ্রেণীকরণ নীতি অনুযায়ী সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চারটি শ্রেণীতে (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) বিভক্ত ছিল, যদিও কোন একটি শ্রেণীভুক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা বিভিন্ন বেতন স্কেলে বেতন পেতেন। সার্ভিসে তাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতার (inter-se) অবস্থান এবং প্রচলিত বেতনের বিপরীতে নতুন পদ্ধতিতে একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে দশ নম্বর গ্রেডে এবং একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে একুশ নম্বর গ্রেডে ফেলা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নতুন অবস্থান/গ্রেড মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যেহেতু তারা মনে করে যে, তাদের প্রতীকি মর্যাদাহানি (degradation) হয়েছে।

নতুন ভাবে ঠিক করা ভাতাসমূহ এবং প্রান্তিক সুবিধার (fringe benefits) ক্ষেত্রে সার্ভিসে নতুন গ্রেড বাস্তবায়নের পর আবার অনেক জটিলতার (Anomalies) সৃষ্টি হয়। পূর্বের চারটি শ্রেণী বিভাগ পদ্ধতির অধীন সংশ্লিষ্ট একটি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তারা কম বেশী সঙ্গতিপূর্ণ হারে ভাতা ও প্রান্তিক সুবিধা পেত। নতুন পদ্ধতিতে সামঞ্জস্যতা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে, কেননা পূর্বের একটি শ্রেণীবিভাগ কয়েকটি গ্রেডে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

অতএব, নতুন গ্রেড পদ্ধতি এবং বেতন স্কেল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেশির ভাগ অংশের কাছে একটি গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে ব্যর্থ হয়। এই কারণে সৃষ্ট ক্ষোভ প্রশমনের জন্য এবং অনিয়মসমূহ সংশোধনের জন্য সরকারকে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে বিপুল সংখ্যক

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষতিগ্রস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাবির প্রেক্ষিতে নতুন গ্রেডিং পদ্ধতি এবং বেতন স্কেল পরীক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা কাউন্সিলের ৩ জন সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তীকালে উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে চেয়ারম্যান করে একটি অ্যাপিলেট কমিটিও গঠন করা হয়। এর দায়িত্ব ছিল কাউন্সিল কমিটি তাদের নিরীক্ষার কাজ শেষ করার পরও থেকে যাওয়া অনিয়মসমূহ পরীক্ষা করে দেখা।[৩৩]

উত্তেজনা প্রশমনে এবং অনিয়মসমূহ দূরীকরণে উপরিউক্ত এবং অন্যান্য প্রতীকারমূলক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের পরও দেখা যায় যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষোভ ও অসোন্তষ থেকে গেছে। অবশেষে, ১৯৭৮ সালের ২২ এপ্রিল সরকার প্রবর্তিত জাতীয় বেতন স্কেলের মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে সার্ভিস গ্রেডিং পদ্ধতির বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং বেতন স্কেলের ক্ষেত্রে সামন্য রদবদল করা হয়।[৩৪] উল্লেখযোগ্য রদবদলটি ছিল ৬ নং ও ৭ নং জাতীয় স্কেল একত্রীকরণ (সারণি ৫.৫ এর 'নোট' দেখুন)।

উল্লেখ্য যে, নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ১৯৭৭-এর প্রবর্তন পরবর্তী চার থেকে আট বছর ব্যবধানে সময় সময় সরকার অবশ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি সমন্বিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ১৯৮৪ সালে গঠিত একটি বেতন কমিশন মূল বেতন দ্বিগুন করার সুপারিশ করে এবং ১৯৮৫ সাল থেকে তা কার্যকরও করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে ও ১৯৯৭ সালে বেতন বাড়ে যথক্রমে ১.৭ ও ১.৮ গুণ; তাছাড়া 'মহার্ঘ' ভাতার ক্ষেত্রেও ইতিমধ্যে কয়েকবার বৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯৯৭ সালে প্রবর্তিত বর্তমান প্রচলিত জাতীয় বেতন স্কেলের সর্বনিম্নটি হচ্ছে টাকা ১৫০০-২৪০০ এবং সর্বোচ্চটি টাকা ১৫০০০ (নির্ধারিত)।

নতুন সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা

সিনিয়র সার্ভিসেস্ পুল (Senior Services Pool)

বাংলাদেশে নতুনভাবে গঠিত সার্ভিস কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ছিল সিনিয়র সার্ভিসেস পুল (এসএসপি) প্রতিষ্ঠা (প্রাথমিক পর্যায়ে এর নামকরণ করা হয়েছিল সিনিয়র পলিসি পুল)। রশিদ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার ১লা মার্চ ১৯৭৯ সালে এই উর্ধ্বতন সার্ভিস পুল গঠন করেন। পরবর্তী সময়ে ২৩ আগস্ট ১৯৭৯ সালে এক আদেশ জারির মাধ্যমে এসএসপি-এর গঠন পুনরায় বৈধ বলে ঘোষণা করেন।[৩৫] এই আদেশ অনুসারে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পুল গঠন করার কথা বলা হয়েছে।

সচিবালয়ের সকল সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব এবং উপসচিবদের সমন্বয়ে এই পুল গঠিত হবে। তবে কিছু ব্যতিক্রমের কথাও বলা হয়েছে, যেমন (ক) উপ সচিবের শতকরা ১০ ভাগ পদ সাবেক কেন্দ্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

সচিবালয় চাকরি এবং পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয় চাকরির সদস্যদের মধ্যে থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে; (খ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব, মহাপরিচালক, পরিচালক/উপসচিব প্রভৃতি পদে শতকরা ৫০ ভাগই অত্র মন্ত্রণালয়ের অধিকর্তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে; এবং (গ) আইন মন্ত্রণালয়ের শতকরা ৫০ ভাগ উপসচিব থেকে সচিব পদ পর্যন্ত এই মন্ত্রণালয়ের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।[৩৬]

এছাড়া শতকরা ৫ ভাগ সংশ্লিষ্ট দপ্তর, স্বায়ত্ত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উর্ধ্বতন পদ এবং শতকরা ৭৫ ভাগ ডেপুটি কমিশনারের পদ-এ পুল সদস্যদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হবে। তবে এ নিয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে পদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এ ধরনের অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ এবং যোগ্যতা প্রার্থীর মধ্যে রয়েছে কিনা। যখন এ পুল সৃষ্টি করা হয় তখন এই পুলের মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬২৫; এবং বলা হয়েছিল যে সরকারের ইচ্ছানুসারে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ১৯৮৫ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় সাড়ে নয় শ'তে দাঁড়ায়।[৩৭]

সিনিয়র সার্ভিসেস্ পুল অথবা এসএসপি অর্ডার ১৯৭৯-এতে আরো বলা হয়েছে যে সরকারি কর্ম কমিশন নির্দিষ্ট প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এ পুলে নিয়োগ দান লক্ষে প্রয়েজনীয় সুপারিশ পেশ করবেন। সকল প্রথম শ্রেণীর চাকরির সদস্য যাদের বয়স ৪৫ বছরের উর্ধ্বে নয় এ পুলের সদস্যভুক্ত হওয়ার জন্য বিবেচিত হতে পারবেন। এ আদেশ অনুযায়ী যে সকল কর্মকর্তা ১লা মার্চ ১৯৭৯ সালের পূর্বে সচিবালয়ে উপসচিব, যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাঁরা পরিচালক এবং মহাপরিচালক ছিলেন তাঁরা সবাই স্বাভাবিকভাবেই ১লা মার্চ ১৯৭৯ সাল থেকে উর্ধ্বতন চাকরি পুলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য করা হবে। সরকার ৩০শে জানুয়ারী ১৯৮১ সাল পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর চাকরির যে কোন সদস্যকে কোন নির্ধারিত বয়স সীমা বা চাকরিকাল উপেক্ষা করে এবং সরকারি কর্ম কমিশনের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই এসএসপির সদস্যরূপে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন।[৩৮]

উল্লেখ্য যে, এসএসপি ব্যবস্থাটির অধীনে কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সরকারী কর্ম-কমিশন কখনই তার আইনগত ভূমিকা পালন করতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তীতে এসএসপি ব্যবস্থাটিরই অবসান ঘটানো হয়। ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে এক সরকারী আদেশ বলে এসএসপির অবলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। এবং এই সময় পর্যন্ত সরকার নিজেই এসএসপিতে কর্মকর্তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সরাসরি ভূমিকা পালন করেছে।[৩৯]

অনেক পর্যবেক্ষকই এসএসপিকে একটি 'মুক্ত কাঠামো ব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেছেন। কেননা এই ব্যবস্থার অধীন সচিবালয়ের উপসচিব থেকে শুরু করে উচ্চতর গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদসমূহ এবং সচিবালয়ের

Dhaka University Institutional Repository

বাইরে নির্বাহী সংগঠনের কতক শীর্ষ পদ ও জেলা প্রশাসকের পদ এই পুল সদস্যদের মধ্য থেকে পুরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবশ্য ১৯৮১ সালে "বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস" (বিসিএস) নামে ২৮টি ক্যাডার ও সাব-ক্যাডার সমন্বয় একীভূত নতুন সার্ভিস কাঠামো গঠিত হওয়ার পর বিধান করা হয় যে, সকল বিসিএস ক্যাডার সদস্যরা মেধার ভিত্তিতে এসএসপি অফিসার হবার সমান সুযোগ পাবেন। ফলে সাবেক সিএসপি অফিসারগণ এসব পদে একচেটিয়াভাবে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। পূর্বে উন্নয়ন-প্রয়োজন ও বিশেষায়ণের প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যগতভাবে সচিবালয়ের এবং স্থানীয় প্রশাসনের সকল উর্ধ্বতন পদ সাবেক সাধারণজ্ঞ সিএসপি অফিসারদের দ্বারা সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থাটি অযৌক্তিক বলে সমালোচিত হয়েছে।[৪০]

তবে এসএসপি গঠনের পর পর বিরূপ সমালোচনাও হয়েছিল। সাধারণজ্ঞ অফিসাররা ছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তারা মনে করেন যে, পুল আদেশ অনুযায়ী যারা স্বাভাবিকভাবেই ১লা মার্চ ১৯৭৯ সালের আগে সচিবালয়ে কর্মরত ছিলেন তারা সবাই পুল সদস্য হয়েছেন এবং এদের অধিকাংশই ছিলেন সাবেক সিএসপি এবং ইপিসিএস অফিসার। ফলে এ পুলে প্রবেশ করার সুযোগ অন্যান্য ক্যাডার সদস্যদের জন্য সীমিত হয়ে যায় এবং এ পুলে সাধারণজ্ঞ প্রশাসকদেরই প্রাধান্য এবং দৌরাত্ম বজায় থাকল। অন্যদিকে সাধারণজ্ঞ অফিসাররা মনে করেন যে পেশাভিত্তিক ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিজস্ব চাকুরীসমূহে জীবন-বৃত্তি (Career development) উন্নয়নের একটি স্তরভিত্তিক কাঠামো রয়েছে এবং সেখানে অনেক উর্ধ্বতন পদও আছে। ফলে এ সব কর্মকর্তারা যদি এসএসপি সদস্য নাও হতে পারেন তাহলে তাদের তেমন কোন পেশাভিত্তিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে না। কিন্তু সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তারা যদি পুলে না যেতে পারেন তাহলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদের উর্ধ্বে যেতে পারবেন না। এসব কারণে ১৯৮১ সালের জুলাই মাসে সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তারা একজোট হয়ে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নিকট পেশকৃত এক স্মারকলিপির মাধ্যমে সচিবালয়ের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ পদ এবং স্থানীয় প্রশাসন পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনের সকল পদ বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রখার জোর দাবী জানায় (স্মারকলিপির পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট 'ক')। সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তাদের পেশকৃত স্মারকলিপির প্রতিক্রিয়ায় বিসিএস-এর কার্যভিত্তিক ও বিশেষজ্ঞ ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তারাও সরকারের নিকট প্রতিবাদ স্বরূপ আরেকটি স্মারকলিপি পেশ করেন (স্মারকলিপির পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট 'খ')। স্মারকলিপিতে বিসিএস-এর অন্যান্য ২৩টি ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তারা প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, বিসিএস সাধারণজ্ঞ ক্যাডার কর্মকর্তারা উপনিবেশিক সিভিল সার্ভিস কাঠামোর গণতান্ত্রিকরণ চায় না এবং তারা প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে তাদের অতীতের প্রাধান্য বজায় রাখতে চান। সুতরাং তারা দাবি করেন যে, বিসিএস সাধারণজ্ঞ ক্যাডার ব্যবস্থার অবসান হওয়া উচিত এবং প্রকৃত কর্মসম্পাদন এবং দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয়ভিত্তিক সাধারণজ্ঞ প্রশাসকদের বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার এবং মহকুমা কমিশনার পদবীর পরিবর্তে ভূমি রাজস্ব অফিসার এবং ম্যাজিস্ট্রেট পদবী ধারণ করা উচিত।[৪১]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এসএসপির গঠন বস্তুত বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারে নি। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার এই পুলকে পর্যালোচনা করার নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির প্রধান ছিলেন তৎকালীন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও নৌ-বাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল সুলতান আহমেদ। পরবর্তীতে এই কমিটি কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশমালা নীতিগতভাবে রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করেন এবং বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ কমিটিকে নির্দেশ প্রদান করেন। মন্ত্রিপরিষদ কমিটি এসএসপির কাঠামো সম্পর্কিত সুলতান আহমেদ কমিটির সুপারিশ এবং বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের পদোন্নতির অপ্রতুল প্রত্যাশার সমাধান পর্যালোচনা করে সুচিন্তিত পরামর্শ প্রদানের জন্য ১৯৮৭ সালের ৩রা জুন তিন সদস্যের একটি উপকমিটি গঠন করে। এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন তৎকালীন সরকারের উপ-প্রধান মন্ত্রী ডা. এম.এ. মতিন; এ কমিটির সদস্য ছিলেন আরো দুজন মন্ত্রী। এঁরা হলেন মেজর জেনারেল (অবঃ) মোহাম্মদ আবদুল মুনীম (কৃষিমন্ত্রী) এবং আনিসুল ইসলাম মাহমুদ (পররাষ্ট্র মন্ত্রী)। এই কমিটি মতিন কমিটি নামেও পরিচিত। এ কমিটিকে সহায়তা করেন তিনজন সচিব এবং একজন মেজর জেনারেল পদমর্যাদার একজন সামরিক কর্মকর্তা। কমিটি সিনিয়র সার্ভিসেস পুল বিলুপ্তি সম্পর্কিত সুপারিশসহ ১৯৮৯ সালের ২২শে জুন তাদের চূড়ান্ত সুপারিশমালা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পেশ করে। এই সুপারিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে এই পুলের অবলুপ্তি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়।[৪২] মতিন কমিটির সুপারিশমালাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) সিনিয়র সার্ভিস পুল সম্পর্কিত এবং (খ) অপরটি বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের পদোন্নতির অপ্রতুল প্রত্যাশারা সমাধান সম্পর্কিত। নিম্নে সিনিয়র সার্ভিস পুল সম্পর্কে পেশকৃত মতিন কমিটির প্রধান প্রস্তাবনাগুলো উল্লেখ করা হলো।

সিনিয়র সার্ভিস পুল সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ

১. পুলের অবলুপ্তি এবং পুলের সকল রিজার্ভসহ যুগ্মসচিবের ১৫৯টি পদ এবং উপসচিবের ৩৭৭টি পদ সকল ক্যাডারের মধ্যে কোটা অনুযায়ী বিভাজন।

২. যুগ্মসচিব ও উপসচিবের ভিউটি পদের ১০% (যথাক্রমে ৯টি এবং ২০টি পদ) কোন কাডারের জন্য কোটা হিসেবে বরাদ্দ না করে রাষ্ট্রপতির সরাসরি নিয়োগের জন্য সংরক্ষিত রাখা। কিন্তু সচিব ও অতিরিক্ত সচিবের পদ কোন ক্যাডারের জন্য বরাদ্দ থাকবে না।

৩. সকল রিজার্ভসহ সচিবালয়ের যুগ্মসচিব ও উপ-সচিব পদের যথাক্রমে ৬০% (৯৫টি পদ) এবং ৬৫% (২২৫টি পদ) বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের জন্য কোটা হিসেবে বরাদ্দকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সচিবালয়ের সকল রিজার্ভসহ সকল যুগ্মসচিব ও উপসচিবের যথাক্রমে ১০% (১৬টি) এবং ১৫% (৫৭টি) পদ বিসিএস সচিবালয়ের জন্য বরাদ্দকরণ এবং সচিবালয়ের ২৬টি নন-পুল উপসচিবের পদও সচিবালয় ক্যাডারের জন্য বরাদ্দকরণ। বিসিএস প্রশাসন এবং বিসিএস সচিবালয় - এই দুই ক্যাডারের মধ্যে বরাদ্দ করার পর যুগ্মসচিব ও উপসচিবের যথাক্রমে ৪৮টি এবং ৭৫টি পদ বাকী ২৬টি ক্যাডারের মধ্যে বরাদ্দকরণ।

৫. বিসিএস (বিচার) ও বিসিএস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের জন্য কোন কোটা বরাদ্দ থাকবে না যেহেতু উক্ত ক্যাডারদ্বয়ের জন্য তাদের নিজস্ব মন্ত্রণালয়ের পদসমূহ সংরক্ষিত আছে।[৪৩]

বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে পদোন্নতির অপ্রতুল প্রত্যাশার সমাধান সম্পর্কিত নীতিমালা পরিশিষ্ট 'গ'-এ উল্লেখ করা হলো।

মতিন কমিটি কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশমালা বিশেষ করে বিসিএস কার্যক্রমভিত্তিক ও বিশেষজ্ঞ ক্যাডার সদস্যদের মনঃপুত হয় নি। এই ক্যাটাগরির কর্মকর্তাদের তেইশটি সার্ভিস নিয়ে গঠিত সমন্বয় কমিটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রীর কাছে ১৪ই এপ্রিল ১৯৯১ দেয়া এক স্মারকলিপিতে অবিলম্বে মতিন কমিটির সুপারিশ বাতিলের দাবি জানায় এবং একটি সম্প্রসারিত সিনিয়র সার্ভিস পুল পুনর্গঠনের জন প্রস্তাব করে। এই কমিটি মোট ১৬টি দাবি জানায়। এই দাবিগুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. মতিন কমিটির সুপারিশমালা বাতিল ঘোষণা।

২. মতিন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ক্যাডারের বেতন স্কেলের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য রয়েছে তা দূরীকরণ।

৩. সচিবালয়ের পদসমূহে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সকল অনিয়মিত ও বৈষম্যমূলক পদোন্নতি ও নিয়োগ বন্ধ করা।

৪. বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারকে বিলুপ্ত করে বিসিএস (ভূমি) এবং বিসিএস (ম্যাজিস্ট্রেসি) এ দুটি ক্যাডার সৃষ্টি করা।

৫. সচিবালয়ের পদসমূহ পূরণ করার জন্য প্রত্যেক ক্যাডারের স্ব স্ব ক্যাডার পদে এবং সচিবালয় পদসমূহে পদস্থ সম পর্যায়ের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ের পদসমূহের মধ্যে সমান্তরাল ও উল্লম্বভাবে (Horizontally) চলাচলের মাধ্যমে একটি সম্প্রসারিত সিনিয়র সার্ভিস পুল তৈরি করা[৪৪] (অন্য প্রস্তাবসমূহের জন্য পরিশিষ্ট 'ঘ' দেখা যেতে পারে)।

১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার মতিন কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়ন স্থগিত রেখে যুগ্মসচিব ও উপসচিবের পদে নিয়োগের জন্য দুটি পৃথক কমিটি গঠন করেন। প্রথম কমিটির নাম হচ্ছে 'কাউন্সিল কমিটি অব

Dhaka University Institutional Repository

সিনিয়র এপয়েন্টম্যান্ট'। মন্ত্রী পরিষদের ৮ জন সদস্য সমন্বয় গঠিত প্রথম কমিটির প্রধান ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। উপসচিব পদে নিয়োগের জন্য ৭ সদস্যের সমন্বয়ে 'সিনিয়র সিলেকশান বোর্ড' নামে দ্বিতীয় আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এ কমিটির প্রধান ছিলেন সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী এবং এর অন্যান্য সদস্য ছিলেন যথাক্রমে কেবিনেট, স্বরাষ্ট্র, সংস্থাপন ও অর্থ সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের একজন প্রতিনিধি। এই দুই কমিটিকে যথাক্রমে ৬৪টি যুগ্মসচিবের এবং ১১৫টি উপসচিবের পদে নিয়োগ ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদানের জন্য বলা হয়। এরূপ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাক্রমে শতকরা ৬০% বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (ACR) এবং শতকরা ৪০% মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে বলা হয়। ১৯৯২ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি ৬৫৪ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ৪ জন সচিব, ৩২ জন অতিরিক্ত সচিব, ১৯১ জন যুগ্মসচিব এবং ৪২৭ জন উপসচিব ছিলেন। কিন্তু এই পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় অনেক অনিয়ম ও পক্ষপাতিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিযোগের কথা শোনা গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ অনেক কর্মকর্তা আদালতেও স্মরণাপন্ন হন এবং এই কারণে এই সব পদোন্নতি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পদে পদে বাধাগ্রস্থ হতে থাকে।[৪৫]

পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সচিবালয়ের পদসমূহে পদোন্নতির নীতিমালা পর্যালোচনা করে সংশোধিত আকারে নতুন পদোন্নতি নীতিমালা প্রণীত হয় (দেখুন সারণি ৫.৬)। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, এই নতুন নীতিমালায় (১৯৯৮-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সংশোধিত বিবেচনায়) উপসচিব, যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বিসিএস 'প্রশাসন' ক্যাডার কর্মকর্তাদেরকে নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। বাকি মাত্র এক-চতুর্থাংশ পদ রাখা হয়েছে অন্যান্য ২৮টি কারিগরী (Technical) ও পেশাগত (Professional) বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য।[৫] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব পদে নিয়োগের জন্য এ পর্যন্ত কোন কোটা পদ্ধতি চালু করা হয় নি। প্রধানমন্ত্রী তার নিজস্ব বিবেচনায় ২৯টি ক্যাডার হতে বাছায়কৃতি শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে এই উচ্চ পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু কার্যত দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সচিব পদগুলোতে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণই নিয়োগ পেয়ে থাকেন। এভাবে এই পরিভাষিত কোটা সংরক্ষণের ফলে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণই 'প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র' সচিবালয়ের সিংহভাগ পদে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন।[৪৬]

400912

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৫.৬
উপসচিব ও এর উচ্চতর পদসমূহে পদোন্নতির নীতিমালা

পদ	চাকুরির অভিজ্ঞতা	বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত কোটা %	অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত কোটা %	ACR মূল্যায়ন হার
উপসচিব	সিনিয়র স্কেলে ৫ বছরেব অভিজ্ঞতাসহ মোট ১০ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা	৭৫	২৫	৮০
যুগ্মসচিব	উপসচিব পদে ৫ বছরের কাজেব অভিজ্ঞতাসহ মোট ১৫ বৎসরের চাকুরীব অভিজ্ঞতা	৭০	৩০	৮৫
অতিরিক্ত সচিব	যুগ্মসচিব পদে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ২০ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা	৭০	৩০	৮৫
সচিব	অতিরিক্ত সচিব পদে ২ বছরের অভিজ্ঞতা এবং সচিবালয়ে ৫ বছারের অভিজ্ঞতাসহ মোট ২২ বৎসরের চাকুরীব অভিজ্ঞতা	নির্ধারিত কোন কোটা নেই	নির্ধারিত কোন কোটা নেই	নাই

সূত্র: GOB, *Extraordinary Bangladesh Gazette*, Notification No. ME/SA-4/2-1/94 (Sect. 2)/29, February 1998, Dhaka: Ministry of Establishment।

একীভূত সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা

রশিদ কমিশনের সিভিল সার্ভিস পুনর্গঠন সংক্রান্ত সুপারিশ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত কমিটি বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং ১লা সেপ্টম্বর ১৯৮০ সালে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন এক সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তনের ঘোষণা দেন। 'বাংলাদেশ সিভিল সাভিস' (বিসিএস) নামকরণে নতুন এই সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থায় রয়েছে নির্দিষ্ট ১৪টি কার্যক্রম ক্ষেত্রের (Functional Area) অধীন মোট ২৮টি উপক্যাডার। সারণি ৫.৭-এ এর বিবরণ দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৫.৭

একীভূত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারসমূহ

ক্যাডার নং	প্রধান ক্যাডার	উপক্যাডার
১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসনিক)	(ক) প্রশাসনিক
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসনিক)	(খ) খাদ্য
২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি)	(ক) কৃষি
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি)	(খ) বন
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি)	(গ) মৎস্য
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি)	(ঘ) গবাদি ও পশু পালন
৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (শিক্ষা)	(ক) সাধারণ শিক্ষা
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (শিক্ষা)	(খ) কারিগরি শিক্ষা
৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অর্থঃ ও বাণিজ্য)	(ক) অর্থনৈতিক
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অর্থঃ ও বাণিজ্য)	(খ) বাণিজ্য
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অর্থঃ ও বাণিজ্য)	(গ) পরিসংখ্যান বিঃ
৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রকৌশল)	(ক) গণপূর্ত
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রকৌশল)	(খ) গণস্বাস্থ্য
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রকৌশল)	(গ) সড়ক ও মহাসড়ক
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রকৌশল)	(ঘ) টেলি যোগাযোগ
৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (আইন শৃঙ্খলা কার্যকরণ)	(ক) পুলিশ
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (আইন শৃঙ্খলা কার্যকরণ)	(খ) আনসার
৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অর্থ)	(ক) হিসাবরক্ষণ ও পরিসংখ্যান
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অর্থ)	(খ) শুল্ক ও বহি:শুল্ক
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অর্থ)	(গ) কর
৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পররাষ্ট্র)	নাই
৯.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (স্বাস্থ্য)	নাই
১০.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (তথ্য)	নাই
১১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিচার সংক্রান্ত)	নাই
১২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক বিভাগ)	নাই
১৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলপথ)	(ক) পরিসংখ্যান ও বাণিজ্যিক
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলপথ)	(খ) প্রকৌশল
১৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সচিবালয়)	নাই

সূত্র: GOB, Establishment Division, Cabinet Secretariat, Notification No. S.R.O. 1-L/81/ED/(R-II) R-70/80, 1 Janurary 1981, Published in *The Bangladesh Gazette* (Extraordinary), 1 January 1981, Schedule 1.

সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী নতুন সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা একটি শ্রেণীবিহীন আমলাতন্ত্র তৈরি করার অভিপ্রায়ে প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রধান ক্যাডার এবং উপ-ক্যাডারের মধ্যে চাকরিগত কোন বৈষম্য থাকবে না। কোন এক ক্যাডার বা ক্যাডারভুক্ত কোন সদস্য অন্য ক্যাডার বা সদস্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না যা পূর্বে সাবেক সিএসপি অফিসারদের ক্ষেত্রে আইনগতভাবে সম্ভব ছিল। প্রতিটি ক্যাডারের শীর্ষতম পদে মেধার ভিত্তিতে উন্নীত হওয়ার সুযোগ-সুবিধা সকলেরই একই রকম থাকবে। বিভিন্ন ক্যাডারে প্রথম প্রবেশ পদে সবাই একরূপ বেতন স্কেল পাবেন অর্থাৎ সকলেই পূর্বতন বেতন স্কেল টাকা ৭৫০-১৪৫০ (বর্তমান স্কেল টাকা

Dhaka University Institutional Repository

৪৩০০-৭৭৪০)-এ প্রারম্ভিক বেতন টাকা ৭৫০ (বর্তমান টাকা ৪৩০০) পাবেন। প্রতিটি ক্যাডারে প্রতিযোগিতামূলক একক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগ দান করা হবে এবং এ পরীক্ষা সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক পরিচালিত হবে। জাতীয় পর্যায়ে এ সার্ভিসে প্রবেশ করার সর্বোচ্চ বয়সসীমা হলো ২৭ এবং অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ বছর। ১৯৯১ সালে সরাকার চাকুরিতে প্রবেশের বয়স সীমা ২৭ থেকে ৩০ এ উন্নীত করেন। অবশ্য অবসর গ্রহণের বয়স পূর্বেকার ৫৭ বছর অপরিবর্তিত রাখা হয়।[৪৭]

১৯৮৬ সালে বিসিএস (সমবায়) ও বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) নামে আরো দুইটি নুতন সাব-ক্যাডার গঠন করার ফলে ঐ সময়ে ক্যাডার ও সাব-ক্যাডারের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০-এ। পরে, ১৯৮৬ সালের আগষ্ট মাসে সরকার সব সাব-ক্যাডারকে ক্যাডারে উন্নীত করার ঘোষণা দেয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে পূর্বতন সবগুলি সাব-ক্যাডার পূর্ণ ক্যাডার হিসেবে গণ্য হয়। পরবর্তিতে ১৯৯১ সালে সরকারের এক সিদ্ধান্ত অনুসারে বিসিএস (প্রশাসন) ও বিসিএস (সচিবালয়)কে একীভূত একটি ক্যাডার করা হয়। অতএব বর্তমানে বিসিএস ক্যাডারসমূহের মোট সংখ্যা ২৯।[৪৮]

মূল্যায়ন

এরকম মনে হতে পারে যে, একটি নতুন সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি বড় ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। নতুন ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি ছিল সচিবালয়ে প্রশাসনিক পদসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণজ্ঞ অফিসারদের (বিসিএস প্রশাসন) সংরক্ষিত কোন অধিকার থাকল না। সমস্ত পুনর্গঠিত ক্যাডার সার্ভিসসমূহে পদোন্নতি (prospect) সম্ভাবনা এবং বেতন স্কেলসমূহ সমান করা হয়। সাধারণজ্ঞ অফিসাররা ব্যতিত নতুন সার্ভিস কাঠামোর প্রতি কার্যক্রমভিত্তিক ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়া মোটামুটি ইতিবাচকই ছিল। এই ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার পেছনে দুটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল: প্রথমত, নতুন ব্যবস্থাতে সব ক্যাডারকে এক সমতলে এনেছে; দ্বিতীয়ত, যারা পূর্বে ক্যাডার পদ্ধতির সমালোচনা করেছিল তাদের অনেকেই নতুনভাবে তৈরী ক্যাডারের অধীন আনা হয়।[৪৯]

তারপরও 'শ্রেণীহীন আমলাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার দাবী প্রশ্নসাপেক্ষ থেকেই যায়। নতুন পদ্ধতি পাকিস্তান আমল ও তৎপূর্ববর্তী উপনিবেশিক শাসন আমলের আমলাতন্ত্রে যে শ্রেণীবিভাগ ছিল, যেমন-'সুপিরিয়র' এবং 'ইনফিরিয়র', 'গেজেটেড' এবং 'নন-গেজেটেড' এবং প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণী ইত্যাদি অবসান ঘটনার জন্য প্রবর্তণ করা হয় নি। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি ছিল এই যে, নতুন ব্যবস্থা সামগ্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর সব কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য নয়। এটি শুধু সিভিল আমলাতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এটি সত্য যে, ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসের জারিকৃত এক আদেশ অনুসারে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রথম,

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হবে না বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারের সেই উদ্যোগ পরবর্তিতে নানান কারণে কার্যকর করা যায় নি। সুতরাং সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে স্তর ভিত্তিক চারটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করার পদ্ধতি চালু রয়েছে।[৫০] আরেকটি বাস্তবতা হলো এই যে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এখনও বৃহৎ দুটি অংশে বিভক্ত; অর্থাৎ গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড। যেসব কর্মকর্তার নিয়োগ, পোস্টিং, পদোন্নতি এবং অবসর গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি সরকারী গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাদেরকে গেজেটেড কর্মকর্তা বলা হয়। তারা সাধারণত বেশী ক্ষমতা এবং দায়িত্বের অধিকারী হয় এবং চাকুরীর সুবিধাদি ভোগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে।

এ কথা সত্য যে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এই বিভক্তি ততদিন থাকবে যতদিন তাদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন, দক্ষতা, শারীরিক এবং মানসিকভাবে মানিয়ে নেবার ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য থাকবে। সুতরাং শ্রেণীহীন আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীর কোন ভিত্তি নেই। শুধু উচ্চতর আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই দাবী কিছুটা গ্রহণযোগ্য। নতুনভাবে গঠিত বিসিএস-এর সকল ক্যাডারকে আইনগতভাবে সমমানের পদমর্যাদা প্রদান করা হয়েছে; কোন একটি মাত্র ক্যাডারকে প্রধান্য দেয়া হয় নাই। তবে আইনের ভাষাই এই দাবীর স্বীকৃতি পরিলক্ষিত হয়। কেননা, ১৯৮৯ সালে সিনিয়র সার্ভিসেস পুল ব্যবস্থাটি বাতিলের পরে সচিবালয়ের পদসমূহের জন্য প্রণীত নতুন পদোন্নিত নীতিমালার আওতায় বিসিএস সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তারা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সর্বক্ষেত্রে তাদের অতীত প্রাধান্য পুনোর্দ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।[৫১]

১৯৭৯ সালে এসএসপি গঠন, সিএসপি ক্যাডারের অবলুপ্তি ঘোষণা এবং ১৯৮১ সালে কয়েকটি নির্দিষ্ট কার্যক্রমক্ষেত্রে বিসিএস ক্যাডারের প্রবর্তন দ্বারা উচচতর পর্যায়ে গতিশীলতা অনুমোদনের উদ্দেশ্যটি ছিল বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে পার্থক্য পরিহার, সম পরিমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ ও দক্ষতার সর্বোচচ ব্যবহার এবং নির্বাহী বা পরিকল্পনা প্রণয়নকারী পদগুলিতে নিয়োগের ভিত্তিটি প্রশস্ত করা। প্রশাসনিক সিভিল সার্ভিস ক্যাডার থেকে 'মেকি অভিজাতন্ত্র' (spurious elitism) উচেছদ এর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। সে যা হোক, কার্যত এসব উদ্দেশ্যের কোনটিই অর্জিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

অতএব, বাংলাদেশে নতুন সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরেও আন্তঃক্যাডার বা সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সমস্যাটি থেকেই গেল বলে মনে হচেছ।

তথ্যনির্দেশ

১। দেখুন, GOB, *Report of the National Pay Commission* vol. 1, (Main Text), Dacca, BGP, 1973, p.2।

Dhaka University Institutional Repository

২। দেখুন, GOB, Establishment Division, *Gradation List of the ex-Civil Service of Pakistan*, Dacca, BGP, 1976; GOB, *Report of the Administrative and Services Reorganization Committee*, Part IV: *The Evidence,* Dacca, 1975, p. 270 ।

৩। দেখুন, SG Ahmed, *Public Personnel Administration in Bangladesh*, Dhaka: University of Dhaka, 1986, p. 155 ।

৪। দেখুন, Mohammad Mohabbat Khan, *Administrative Reforms in Bangladesh* (Dhaka: UPL, 1998), p. 52 ।

৫। দেখুন, World Bank, *Bangladesh: Government That Works*, (Dhaka: The World Bank, 1996), p. 89 ।

৬। দেখুন, K. A. Zaman, "The Civil Service System in Bangladesh" in A. Raksansataya and H. Siedentopf (eds.), *Asian Civil Service*, Kuala Lumpur, Asian and Pacific Development Administration Centre (APDAC), 1980, p. 18 ।

৭। দেখুন, SG Ahmed, *Public Personnel Administration in Bangladesh*, Dhaka: University of Dhaka, 1986, p. 159 ।

৮। দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১ ।

৯। দেখুন, GOB, Cabinet Division, *Report of the Pay and Services Commission*, Part I - *The Service*, vol. III, 1977, pp. 169-173 ।

১০। দেখুন, M. M. Khan and H.M. Zafarullah, "Administrative Reform and Bureaucratic Intransigence in Bangladesh", in G.E. Caiden and H. Siedentopf (eds.) *Strategies for Administrative Reform*, Toronto, Lexington Books, 1982, pp. 139-141 ।

১১। দেখুন, Memorandum of the ex-EFCS (Executive, Class I) Association", in *Report of the Rashid Commission,* Part I - *The Service*, vol. III, op.cit., pp. 228-235 ।

১২। দেখুন, K. A. Zaman, "The Civil Service System in Bangladesh" in A. Raksansataya and H. Siedentopf (eds.), *Asian Civil Service*, Kuala Lumpur, Asian and Pacific Development Administration Centre (APDAC), 1980, pp. 35-42 ।

১৩। দেখুন, SG Ahmed, *Public Personnel Administration in Bangladesh*, Dhaka: University of Dhaka, 1986, p. 163 (Note: 15) ।

১৪। দেখুন, GOB, Planning Commission, *The First Five Year Plan,* 1973-1978, Dacca, 1973, p. 4 ।

১৫। দেখুন, SG Ahmed, *Public Personnel Administration in Bangladesh*, Dhaka: University of Dhaka, 1986, p. 163 (Note: 17) ।

১৬। দেখুন, SG Ahmed, *The Image of Public Service in Bangladesh*, Dacca, Centre for Administrative Studies (CENTAS), 1975, pp.28-34 ।

১৭। দেখুন, GOB, *Report of the Administrative and Services Reorganization Committee*, Part IV: *The Evidence,* Dacca, 1975, pp. i-ii ।

১৮। দেখুন, GOB, *Report of the National Pay Commission* vol. 1, (Main Text), Dacca, BGP, 1973, pp. 1-2 ।

১৯। দেখুন, GOB, *Report of the Administrative and Services Reorganization Committee*, Part I: *The Services,* paras 1.10, 3.8, 3.9, 3.10 ।

২০। দেখুন, GOB, *Report of the National Pay Commission* vol. 1, (Main Text), Dacca, BGP, 1973, pp. 76-89 ।

Dhaka University Institutional Repository

২১। দেখুন, SG Ahmed, *The Image of Public Service in Bangladesh*, Dacca, Centre for Administrative Studies (CENTAS), 1975, pp.40-41।

২২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।

২৩। প্রাগুক্ত।

২৪। দেখুন, M. Jainul Abedin, "Classification System in Bangladesh", in A. Raksataya and H. Siedentopf (eds.), *Asian Civil Services: Technical Papers*, vol. 1, Kuala Lumpur, APDAC, 1980, p. 17।

২৫। দেখুন, GOB, Cabinet Division, *Report of the Pay and Services Commission*, Part I - *The Service*, vol. I, 1977, p. 7।

২৬। দেখুন, GOB, Cabinet Division, Resolution No. 30/1/76-Rules, dated 20 February 1976, in *The Bangladesh Gazette, Extraordinary*, 20 February 1976।

২৭। দেখুন, GOB, Cabinet Division, *Report of the Pay and Services Commission*, Part I - *The Service*, vol. I, 1977, pp. 41-54।

২৮। দেখুন, GOB, Cabinet Division, *Report of the Pay and Services Commission*, Part II - *Pay and other Benefits*, vol. I, 1977, p. 55।

২৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।

৩০। দেখুন, SG Ahmed, *Public Personnel Administration in Bangladesh*, Dhaka: University of Dhaka, 1986, p. 169।

৩১। দেখুন, GOB, Implementation Division (Ministry of Finance), *Introduction of New National Grades and Scales of Pay*, Dacca, BGP, 1977, p. 2।

৩২। দেখুন, M. Jainul Abedin, "Classification System in Bangladesh", in A. Raksataya and H. Siedentopf (eds.), *Asian Civil Services: Technical Papers*, vol. 1, Kuala Lumpur, APDAC, 1980, pp. 32-34।

৩৩। দেখুন, *The Bangladesh Observer*, 8 February 1978।

৩৪। দেখুন, *The Bangladesh Observer*, 23 April 1978; E. Ahmed, *Development Administration: Bangladesh*, Dacca, CENTAS, 1981, p. 53।

৩৫। দেখুন, GOB, Establishment Division, *Senior Services Pool Order*, 1979, Dacca, BGP, 1979।

৩৬। প্রাগুক্ত, সেকশন ২।

৩৭। দেখুন, এম. শামসুর রহমান, *আধুনিক লোকপ্রশাসন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃঃ ৫২০।

৩৮। দেখুন, A M M Shawkat Ali, *Aspects of Public Administration in Bangladesh*, Dhaka: Nikhil Prakashani, 1993, p. 21।

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।

৪০। দেখুন, SG Ahmed, *Public Personnel Administration in Bangladesh*, Dhaka: University of Dhaka, 1986, p. 174।

৪১। দেখুন, SG Ahmed, *Public Personnel Administration in Bangladesh*, Dhaka: University of Dhaka, 1986, pp. 190-191।

৪২। দেখুন, A M M Shawkat Ali, *Aspects of Public Administration in Bangladesh*, Dhaka: Nikhil Prakashani, 1993, p. 33।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩। দেখুন, A M M Shawkat Ali, *Aspects of Public Administration in Bangladesh*, Dhaka: Nikhil Prakashani, 1993, p. 31।

৪৪। দেখুন, এম. শামসুর রহমান, *আধুনিক লোকপ্রশাসন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃঃ ৫২৩।

৪৫। প্রাগুক্ত।

৪৬। দেখুন, SG Ahmed, "Public Administration in the Three Decades" in A M Choudhury and Fakrul Alam (eds.), *Bangladesh on the Threshold of the Twenty First Century*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2002, p. 329।

৪৭। দেখুন, এম. শামসুর রহমান, *আধুনিক লোকপ্রশাসন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃঃ ৫২৬।

৪৮। দেখুন, A M M Shawkat Ali, *Aspects of Public Administration in Bangladesh*, Dhaka: Nikhil Prakashani, 1993, p. 26।

৪৯। দেখুন, M. Jainul Abedin, "Classification System in Bangladesh", in A. Raksataya and H. Siedentopf (eds.), *Asian Civil Services: Technical Papers*, vol. 1, Kuala Lumpur, APDAC, 1980, p. 41।

৫০। দেখুন, World Bank, *Bangladesh: Government That Works*, (Dhaka: The World Bank, 1996), p. 118।

৫১। দেখুন, SG Ahmed, "Public Administration in the Three Decades" in A M Choudhury and Fakrul Alam (eds.), *Bangladesh on the Threshold of the Twenty First Century*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2002, pp. 339-40।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশমালা

বক্ষ্যমান থিসিসের পূর্ববর্তী চারটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত বিষয় সম্পর্কিত অনুশীলন যে ধারনাটি নির্দেশ করে তা হচ্ছে, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রায় দুই শত বছর আগে থেকেই যে সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থাটি এখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তার ধরনটি বেশ উল্লেখযোগ্যভাবেই পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায়ও বহাল থেকেছে। ব্যবস্থাটির সার্ভিস কৌলীন্য, সাধারণজ্ঞ আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য, পদমর্যাদার প্রতি আকর্ষণ, কর্মকর্তাদের মধ্যে উচু-নিচু প্রভেদ এবং 'মেকি অভিজাততন্ত্র'-এর মত বৈশিষ্ট্য এখনো বহুলাংশে টিকে আছে। অনুশীলনকৃত বিষয়াবলীর মূল প্রসংগগুলি এই উপসংহার অধ্যায়ে পুনরাবৃত্তি করা হলে ধারণাটি আরো বদ্ধমূল হবে ।

বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমলে বিকাশ লাভ করা সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থারই অনুকরণে গঠিত। সত্যিকার অর্থে "Report on the Indian Civil Serivce" শিরোনামে ১৮৫৪ সালে লর্ড মেকলে নেতৃত্বাধীন কমিটি কর্তৃক পেশকৃত রিপোর্টের মাধ্যমেই ব্রিটিশ ভারতে সাধরণজ্ঞ সিভিল সার্ভিস ধারনার গোড়াপত্তন হয়। এই রিপোর্ট কোম্পানি আমলের প্রশাসন ব্যবস্থার অদক্ষতা, স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য ত্রুটিসমূহের সমালোচনা করা হয় এবং মুক্ত প্রতিযোগিতমূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী চাকুরীতে কর্মকর্তা নিয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়।[১] মেকলে রিপোর্ট উপনিবেশিক শাসন কাঠামোকে মজুবত করার লক্ষে প্রশাসনের শীর্ষ ভাগের উপর গুরুত্ব দেয় এবং এই ধরনের কাঠামোর শীর্ষ পর্যায়ের জন্য কলা ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীধারী ব্রিটিশ নাগরিকদেরকেই অতিশয় উপযুক্ত মনে করে। তবে রিপোর্টে প্রশাসকদের অধীনে কর্মরত বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য সহকারীদের প্রতি মোটেই আলোকপাত করা হয় নি।[২]

মেকলে রিপোর্টের একটি উদ্ধৃতি দ্বারা প্রশাসনের উচচ পর্যায়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ ও সাধারণ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তদের প্রতি তৎকালীন সংস্কারকদের পক্ষপাতিত্ব প্রতীয়মান হয় - "The duties of a civil servant of the East India Company are of so high a nature that in his case it is peculiarly desirable that an excellent general education, such as may enlarge and strengthen his understanding, should precede the special education which must

Dhaka University Institutional Repository

qualify him to daspatch the business of his cutcherry."[৩] মেকলে রিপোর্টের আরেক জায়গায় জোর দিয়ে বলা হয় যে, ". . . it is also desirable that he (civil servant) should have received the best, the most liberal, the most finished education that his native country affords."[৪]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি দুটি থেকে বোঝা যায় যে উপনিবেশিক শাসন আমলের সংস্কারকদের ধারণায় প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সাধারণ কলা বিষয়ে সর্বোচচ ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্ররা সর্বাধিক কাম্য। এক্ষেত্রে মেকলের রিপোর্ট প্রণেতাগণ স্বয়ং ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ট দুটি বিশ্ববিদ্যালয় যথা, অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রদের মেধার প্রসংশা করেছেন এবং এই ছাত্রদের মধ্য হতেই বাছাইকৃতদের কোম্পানি সার্ভিসে নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ও পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন।[৫]

ব্রিটিশ-ভারতে চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসে (Covenanted Civil Service) প্রবেশের সর্বোচচ বয়স সীমা ছিল ২৩ বছর এবং নির্বাচনী পরীক্ষায় ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, অংক, সাধারণ ও নৈতিক বিজ্ঞান এবং প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা মিলিয়ে আরো পাঁচটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষানবীস কর্মকর্তা হিসেবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হেইলীবারী কলেজে (Haileybury College) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হতো। দু বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ কালে - (১) ভারতীয় ইতিহাস, (২) আইন, (৩) বাণিজ্য ও অর্থনীতি, এবং (৪) ভারতীয় ভাষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। এই চারটি বিষয়ের পরীক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষানবীস কর্মকর্তাদের কোম্পানির সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হতো। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করা হতো। ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এ সকল কর্মকর্তার বয়স মধ্য চল্লিশের কোঠায় পৌঁছুলে তারা ইংল্যান্ড ফিরে গিয়ে ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী পদে আসীন হতেন। পরবর্তীতে সার্ভিসে নতুন নতুন বিশেষজ্ঞ শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিন্তু শীর্ষ স্থানীয় নীতি নির্ধারনী পদসমূহে সাধারণজ্ঞ প্রশাসকদের প্রাধান্য অক্ষুণ্নই থেকেছে।[৬]

ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস কাঠামোতে মেকলে ধ্যাণ-ধারণায় প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশিক সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সচিবালয় ছিল যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক কেন্দ্র বিন্দু। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সচিবালয়ের উচচ পর্যায়ে যথাক্রমে সিএসপি এবং ইপিসিএস ক্যাডারদ্বয়ের সাধারণজ্ঞ

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তাগণ প্রাধান্য বিস্তার করে ছিলেন।[৭] অনুরূপভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত সচিবালয় এবং সচিবালয়ের উচ্চ পর্যায়ের পদসমূহ পূরণে এখনও উপনিবেশিক পদ্ধতি কম বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।

ব্রিটিশ আমল থেকে সচিবালয়ের পদসমূহ ক্ষণকালীন পদ (tenure post) হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সচিবালয়ের উচ্চ পর্যায়ের পদসমূহ পূরণের জন্য মাঠ প্রশাসনে সম্পর্কে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতি সঠিক মনে করা হয় এই যুক্তিতে যে, যেহেতু এ সকল কর্মকর্তা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন সেহেতু স্থানীয় প্রশাসনিক পরিমণ্ডল ও জনসাধরণের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে মন্ত্রীদের সচিব হিসেবে তারা অধিকতর ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেন। অতএব এই ব্যবস্থার ধারবাহিকতায় সচিবালেয়ের সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তারা নীতি নির্ধারণে অধিক হারে ভূমিকা রাখার সুযোগ পান। তাছাড়া কোন কর্মকর্তা সচিবালয়ের দায়িত্ব পালনে অনুপযুক্ত হলে সচিবালয়ের বাইরে নির্বাহী অধিদপ্তরের শীর্ষ পদে তিনি স্থানান্তরিত হওয়ার সুযোগ পান।[৮]

এইরূপে পাকিস্তানী সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তারা একদিকে মন্ত্রণালয়সমূহে নীতি নির্ধারনী ভূমিকা পালন করেছে, অন্যদিকে মন্ত্রণালয়ের অধীনে সৃষ্ট বিভিন্ন সংযুক্ত অধিদপ্তরসমূহে (attached departments) আসীন হয়ে সরকারী নীতি বাস্তবায়নও নিয়ন্ত্রণ করেছে। সাধারণত এ সকল দপ্তরে বিশেষজ্ঞরা কাজ করেন এবং তারা নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়কে প্রায়োগিক ও বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ দান করেন।

পাকিস্তান আমলে সচিবালয় ও সচিবালয়ের সাথে সংযুক্ত অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে তিনটি বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, অধিদপ্তরসমূহে বিশেষজ্ঞগণ নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন কিন্তু নীতি নির্ধারণে অধিদপ্তরসমূহ নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ে তাদের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিলো না। দ্বিতীয়ত, সংযুক্ত অধিদপ্তরের প্রধানগণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান অর্থাৎ সচিবদের অপেক্ষা নিম্নতর প্রশাসনিক পদমর্যাদা ভোগ করতেন। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা সচিবদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। তৃতীয়ত, আর্থিক দিক থেকে সচিবালয়ের সাধারণজ্ঞ কর্মকর্তাগণ বিশেষজ্ঞদের অপেক্ষা উচ্চতর বেতনক্রম ভোগ করতেন।[৯]

বাংলাদেশে ১৯৭৭ সালে একীভূত বেতনক্রম কাঠামো (unified pay grade structure) ও ১৯৮০ সালে একীভূত সিভিল সার্ভিস কাঠামো (unified civil service structure) প্রবর্তনের মাধ্যমে সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিদ্যমান আর্থিক অসমতা দূর করার চেষ্ট করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান পদে বিশেষজ্ঞদের প্রবেশ না থাকায় পাকিস্তান আমল থেকে অদ্যবধি তারা এ পদ্ধতির সমালোচনা ও বিরোধিতা করে আসছেন। তারা মনে করেন মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালনে তাদের সুযোগ দেয়া উচিত। কারণ প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন কারিগরী ও সেবা মূলক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমানে যে ধরনের কর্যক্রম ও প্রকল্প পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে মন্ত্রীকে সহায়তা প্রদান করার দক্ষতা সাধারলণজ্ঞ কর্মকর্তাদের থাকার কথা নয়। অন্যদিকে, সাধরণজ্ঞরা বিশেষজ্ঞদের নীতি নির্ধারণী পদের জন্য অনুপযুক্ত মনে করেন। তাদের মতে বিশেষজ্ঞরা একটি বিষয়ে সম্যকভাবে ধারণা প্রাপ্ত হওয়ায় পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে সচেতন ও মনোযোগী হন এবং এ ধরনের পেশাগত সংকীর্ণতা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে না।[১০] সাধরণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ উভয়ের বক্তব্যে যৌক্তিকতা রয়েছে। এ কথা সত্য যে, কোন কোন কারিগরী মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে বিশেষজ্ঞরা অধিক উপযুক্ত হবেন। অন্যদিকে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ব্যাতীত অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থাপক নীতি নির্ধারক হিসেবে ব্যর্থও হতে পারেন।

একটি দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ গঠন ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সুযোগ প্রদানের জন্য ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে 'সিনিয়র সার্ভিসেস পুল' গঠন করা হয়। এ পুল সিভিল সার্ভিসভুক্ত একটি শীর্ষ ক্যাডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ উভয়ই এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পান। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সচিবালয়ের সকল উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিবের পদ পুলের সদস্যদের দ্বারা পূরণ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

১৯৭৯ সালের সিনিয়র সার্ভিসেস পুল অধ্যাদেশ অনুযায়ী পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য নিম্নে বর্ণিত অনুর্ধ ৪৫ বছর বয়েসের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ যোগ্য বিবেচিত হন।

(ক) স্বাধীনতা পূর্ব নিয়মিত সার্ভিসে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে সরাসরিভাবে নিযুক্ত ও বর্তমানে সিনিয়র স্কেল অথবা তদুর্ধ বেতন ক্রমে অবস্থিত সে সকল কর্মকর্তা যাদের চাকুরির মেয়াদ ১০ বছরের উর্ধ্বে ও ১৫ বছরের নিম্নে রয়েছে; (খ) জাতীয় বেতন ক্রমের ১৬৫০-৩০২০ স্কেলে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা যাদের চাকুরীর মেয়াদ ১০ বছেরর উর্ধ্বে ও ১৫ বছরের নিম্নে রয়েছে এবং যারা বর্তমানে সিনিয়র স্কেল অথবা তদুর্ধ স্কেলে অবস্থান করছেন; (গ) সে সকল কর্মকর্তা যারা (১) পদন্নোতির মাধ্যমে বর্তমান বেতনক্রমের ১৬৫০-৩০২০ স্কেল অর্জন করেছেন, (২) উক্ত পদোন্নতি প্রাপ্ত পদে ৫ বছরের অধিক সময় ধরে কাজ করছেন, (৩) বর্তমানে সিনিয়র স্কেল অথবা তদুর্ধ স্কেলে অবস্থান করছেন, ও (৪) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে অন্তত ১০ বছরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা রয়েছে।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

পুলের সদস্য হওয়ার পর একজন কর্মকর্তা সচিবালয়ের উপসচিব পদে কাজ শুরু করবেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়াও এককালীন নিয়োগের মাধ্যমে যে সকল কর্মকর্তা কোন এক সময় সচিবালয়ের উপসচিব বা তদুর্ধ পদে; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক অথবা পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেছেন তারা সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। তাছাড়া সরকার ভূতপূর্ব নিয়মিত সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা সার্ভিসের সদস্যদেরও পুলে অন্তর্ভুক্ত করেন।

সিনিয়র সার্ভিসেস পুল (এসএসপি) গঠনেরা মাধ্যমে আশা করা হয় যে, বিসিএস-এর কার্যভিত্তিক ও বিশেষজ্ঞ ক্যাডার কর্মকর্তারা এসএসপি-এর প্রায় ৫০ শতাংশ পদ লাভ করে তাদের নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়সমূহে নীত নির্ধারণী দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাবে। অর্থাৎ ৫০ শতাংশ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা সচিবালয় পর্যায়ে তাদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করার সুযোগ পাবে। আর বাকী ৫০ শতাংশ পদে সাধরণজ্ঞ কর্মকর্তারা সচিবালয়ে তাদের ধারাবাহিক নীতি নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে যেতে পারবে।

কিন্তু, ১৯৮৯ সালে সিনিয়র সার্ভিসেস পুল বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। পুল বিলুপ্ত হওয়ার ফলে তাই সচিবালয়ে বিশেষজ্ঞদের সরাসরি ভূমিকা রাখার দাবী অমীমাংসিতই থেকে গেল। সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব সমস্যাটি অবসান হল না শেষ পর্যন্ত।

আজকের দ্রুত ধাবমান, জটিল এবং পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্বে অর্থনীতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যে কোন সরকারের জন্যই নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। এর সাথে বাংলদেশে রয়েছে অতিশয় জটিল এবং বিশাল উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য অতিমানবিক ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন। বিদ্যমান ক্যাডারভিত্তিক 'রুদ্ধ-প্রবেশ' আমলাতন্ত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতার যোগান দিতে অক্ষম। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বিবিধ ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন। নীতি নির্ধারণের জন্য চাই তেমন ব্যক্তিদের যারা একটি মন্ত্রণালয়ের অধীন এলাকাকে সরকারের বৃহত্তর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংযুক্ত করতে পারবেন এবং রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। অপর পক্ষে অর্থনীতি এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষ মূল পেশাজীবীদের মত কুশলী ব্যক্তিবর্গেরও প্রয়োজন রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বিভাগে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ব্যবস্থাপনা পদে যোগ্য এবং সুপ্রশিক্ষিত কর্মকর্তার নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিচের সুপারিশগুলি বিবেচ্য।

১. **সিনিয়র সার্ভিসেস পুল পুনর্গঠন:** রাজনৈতিক নীতি নির্ধারকগন অবলুপ্ত সিনিয়র সার্ভিসেস পুল (এসএসপি) পুনরায় প্রতিষ্ঠার চিন্তা করতে পারেন। নতুন কাঠামোটির নাম সিনিয়র এ্যাকজেকিউটিভ সার্ভিসও

Dhaka University Institutional Repository

(এসইএস) হতে পারে যা সকল বিসিএস ক্যাডারভুক্ত মধ্যপর্যায়ের সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠন করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত এই সার্ভিসে বেসরকারী সেক্টরভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে পরীক্ষিত মেধাবী ও যোগ্য কিছু সংখ্যাক ব্যক্তিগণকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এদের নির্বাচন প্রক্রিয়া অবশ্যই সাংবিধানিক সংগঠন সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক সম্পন্ন হতে হবে। প্রশাসনে নেতৃত্ব পালনে দক্ষতাসহ উচচ পর্যায়ে সমন্বয়নে বহুবিধ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এসব এসএসপি বা এসইএস কর্মকর্তাগণ সচিবালয় এবং সচিবালয়ের বাইরে উভয় ক্ষেত্রে চাকুরি করতে পারেন। পুলের যে সকল সদস্যের সচিবালয়ে চাকুরীর পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই সে সকল সদস্যদের পুলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সাথে সাথে প্রশাসন ও সচিবালয় সার্ভিস সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করা প্রয়োজন।

২. **বিশেষ কর্মপরিচালনা গ্রুপ (Specialized Functional Groups) সৃষ্টি:** বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং দক্ষতা অপপ্রয়োগের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার একটি সম্ভাব্য পদক্ষেপ হতে পারে মন্ত্রণালয়সমূহকে কয়েকটি কার্যপরিচালনা গ্রুপে বিভক্ত করে 'বিশেষ উর্ধতন কর্মকর্তা পুল'ঝ (Specialized Senior Staffing Pool) (এসএসএসপি) প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মাধ্যমে কার্যপরিচালনা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা করা। প্রস্তাবিত সিনিয়র সার্ভিসেস পুল (এসএসপি) গঠন তখন প্রয়োজন নাও হতে পারে। এ পর্যায়ের কার্যপরিচালনা গুচেছ/গ্রুপে থাকতে পারে; একটি সমষ্টিক অর্থনৈতিক গ্রুপ, একটি সামাজিক খাত গ্রুপ, একটি অবকাঠামো গ্রুপ, একটি কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ গ্রুপ এবং একটি সাধারণ প্রশাসন গ্রুপ। উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন যে কোন ক্যাডারের কর্মকর্তা পেশাগত রেকর্ড এবং একটি প্রতিযোগিতমূলক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এসএসএসপির যে কোন একটি গ্রুপে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করবেন। এই পরীক্ষাগুলি হবে মাষ্টার্স স্তরের বিশেষভাবে তৈরি মডিউল, যাতে প্রতিটি বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান সন্নিবেশিত হবে। কর্মকর্তাগণ তাদের নিজ নিজ সময়মত পড়াশোনা করবেন এবং পছন্দসই একের অধিক গ্রুপে মনোনয়নের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। যুগ্মসচিব পর্যায়ে যে কোন পদে নিযুক্ত সবাইকে এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং বাংলাদেশ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্ট্রার (বিপিটিএসি)তে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। এসএসএসপি শ্রেণীর যে কোনটির জন্য নির্বাচিত একজন কর্মকর্তা পেশাজীবনের বাকি সময়টি এখানেই কাটাবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প প্রধান বা সচিবের পদ অলঙ্কৃত করবেন - যদি তার কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক হয়।[১২]

৩. **ফাস্ট স্ট্রীম এন্ট্রি ক্যাডার.** দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারও "ফাস্ট স্ট্রীম এন্ট্রি" (Fast Stream Entry) জাতীয় একটি ক্যাডার প্রবর্তণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।[১৩] এ ক্যাডারে কর্ম

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদনের মানের উপর ভিত্তি করেই ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের ইনক্রিমেন্ট ও পদোন্নতির অবকাশ থাকবে। তবে এই ধরনের একটি ক্যাডারের পাশাপাশি বর্তমান বিসিএস ক্যাডারসমূহে নিয়োগ ও পদোন্নতি ব্যবস্থা বহাল থাকবে। ফাস্ট স্ট্রীম এন্ট্রি - এই ধরনের একটি ক্যাডারে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী গ্রাজুয়েটদের আকৃষ্ট করবে। তবে এই ক্যাডারে নিয়োগ ও নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অবশ্যই সুসংহত করতে হবে। এছাড়া বেতনের সঙ্গে অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়গুলোর মধ্যে কাজের সফলতার জন্য বোনাস, বাজার সমন্বয়ের বিভিন্ন অনুষঙ্গ এবং অন্যান্য ভাতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

উপরিউক্ত কাঠামোগত সংস্কার পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াও বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থায় বিশিষ্টতা আনায়ন ও নীতি নির্ধারণে বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ নেয়া যেতে পারে:

(১) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে "প্রাসঙ্গিক যোগ্যতার" উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ কর্মকর্তাদের নিয়োগ, প্রেষণ ও বদলীকালে শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, প্রবণতা প্রভৃতির প্রাসঙ্গিকতার উপর যথা সম্ভব গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

(২) সরকারী কর্মকর্তাদের দু বছর মেয়াদী শিক্ষানবীস কালে পর্যায়ক্রমে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ (ছয় মাস ব্যাপী), পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ (এক বছর মেয়াদী) ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (৬ মাস ব্যাপী) অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ১৯৮০ সালে একীভূত ক্যাডার সার্ভিস (unified cadre service) গঠনের পরে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ বিসিএস-এর সকল ক্যাডার সদস্যদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৮২ সালে থানা পর্যায় প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ বাস্তবায়ন করার কারণে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন ক্যাডার সদস্যদের সংখ্যা ও সার্ভিসের নিয়োগ পদ্ধতির তুলনায় প্রশিক্ষণ সুবিধা অপ্রতুল হওয়ায় অপ্রশিক্ষণের জের একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপ্রশিক্ষণের জের হ্রাস করার জন্য ১৯৮৮ সাল থেকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৪ মাস থেকে ২ মাসে হ্রাস করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশাপাশি অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেমন - কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, ওটিআই প্রভৃতিকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অপ্রশিক্ষণের জের থাকা সত্ত্বেও ১৯৯২ সাল থেকে নব নিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৪ মাস মেয়াদী বুনিয়াদী কোর্স শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অপ্রশিক্ষণের জের হ্রাসের জন্য পাশাপাশি অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দু মাস মেয়াদী বুনিয়াদী কোর্স চলতে পারে। পরবর্তীতে নব নিযুক্তদের জন্য বুনিয়াদী কোর্স ৪ মাসে থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) বিসিএস-এর সকল ক্যাডারের জন্য পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

(৪) কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়নে বুনিয়াদী ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের ফলাফলকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

(৫) বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদনে কর্মকর্তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট অপেক্ষা কাজের মানকে অধিক গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে।

(৬) সকল ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক সুযোগ সুবিধা প্রদানে যথাসম্ভব সমতা আনয়নের প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে।

(৭) সিভিল সার্ভিসের বদলী নীতি জনগণ ও কর্মকর্তাদের কল্যাণে ব্যবহার করা প্রয়োজন। কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রবণতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পদে তিন থেকে পাঁচ বছর (কাজের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে) অন্তর বদলী করা যেতে পারে।[১৪]

সবশেষে, মনে রাখতে হবে সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি - প্রভৃতি ব্যতীত উপরিউক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ দ্বারা সিভিল সার্ভিসে প্রাসঙ্গিকতা ও বিশিষ্টতা আনয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশে চাকুরির স্বল্পতা ও প্রযুক্তিগত অনুন্নয়নের ফলে দেখা যাচেছ যে উচচ শিক্ষা বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ক উচচতর কারিগরী শিক্ষা কর্ম ক্ষেত্রে তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না। এ সমস্যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি ও সঠিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই হ্রাস করা সম্ভব।

তথ্যনির্দেশ

১। দেখুন, Great Britain, *Fulton Committee Report*, vol. 1(Appendix B), (London: H. N. Stataionery Office, 1968), pp. 119-28।

২। প্রাগুক্ত।

৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১।

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।

৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯-২৮।

৬। দেখুন, B. B. Misra, *The Bureaucracy in India*, (Delhi: Oxford University Press, 1980); Charles H. Kennedy, *Bureaucracy in Pakistan* (New York: Oxford University Press, 1987), pp. 1-53।

৭। দেখুন, Mohammad Mohabbat Khan, *Bureaucratic Self-Preservation*, (Dhaka: University of Dhaka, 1980), pp. 20-119।

Dhaka University Institutional Repository

৮। দেখুন, Ali Ahmed, *Role of Higher Civil Servants in Pakistan*, (Dacca: NIPA, 1968), pp. 130-50।

৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬।

১০। দেখুন, Ali Ahmed, *Basic Principles and Practices of Administrative Organization in Bangladesh*, (Dhaka: NILG, 1981), pp. 36-37।

১১। দেখুন, Syed Giasuddin Ahmed, *Public Personnel Administration in Bnagladesh*, (Dhaka: University of Dhaka, 1986), pp. 172-74।

১২। দেখুন, World Bank, *Bangladesh: Government Thats Work*, (Dhaka, 1996), p. 131।

১৩। দেখুন, Jon S.T. Quah, "Improving Efficiency and Productivity of the Singapore Civil Service" in John P. Burns (ed.), *Asian Civil Service Systems*, (Singapore: Times Academic Press, 1994), pp. 31.154।

১৪। দেখুন, কঙ্কা জামিল খান, "সাধারণী-বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা", *লোক প্রশাসন সাময়িকী*, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ১৬-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় ভাগ

পরিশিষ্টসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট 'ক'

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস

(প্রশাসনিক : প্রশসানিক)

এসোসিয়েশন ঢাকা

স্মারকলিপি

জুলাই ১৩, ১৯৮১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসনিক ঃ প্রশাসনিক) এসোসিয়েশন, ঢাকা

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,
গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ,
বঙ্গভবন, ঢাকা।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসনিক ঃ প্রশাসনিক) এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে এসোসিয়েশনের সদস্যদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া সম্পর্কিত একটি স্মারকলিপি আপনার সদয় বিবেচনার জন্য অতি বিনয়ের সহিত পেশ করিতেছি। বহুদিন যাবৎ এই অতি ন্যায় সংগত দাবীগুলি সরকার কর্তৃক বিবেচিত না হওয়ায় এই সার্ভিসের সকল স্তরের সদস্যদের মধ্যে একদিকে যেমন দারুন অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনি প্রশাসনিক যন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ায় দেশের সামগ্রীক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিতেছে ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে।

উপরোক্ত অবস্থায় স্মারকলিপিতে উল্লেখিত এই সার্ভিসের সদস্যদের ন্যূনতম তথা অতি ন্যায় সংগত দাবীগুলি আপনার সদয় বিবেচনা লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই সমস্ত দাবী বিবেচনা করিয়া এক মাসের মধ্যে সরকারের সিদ্ধান্ত এই এসোসিয়েশনকে অবহিত করার এবং এই কাজ ত্বারন্বিত করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রী পর্যায়ে এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করার কথা বিবেচনা করার জন্য আমি অতি বিনয়ের সহিত অনুরোধ জানাইতেছি।

আপনার একান্ত অনুগত,

মফিজুর রহমান
১৩/৭/৮১

(মফিজুর রহমান)
সভাপতি

ঢাকা, ১৩ই জুলাই, ১৯৮১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসনিক ঃ প্রশাসনিক) এসোসিয়েশন, ঢাকা।

স্মারকলিপি

সরকার কর্তৃক বিগত কয়েক বৎসরে প্রণীত ও অনুসৃত সরকারী চাকুরী কাঠামো এবং বেতন বিন্যাস সম্পর্কিত নীতিমালা ও অধ্যাদেশাদি পর্য্যালোচনা করিলে উহাতে নিম্নলিখিত অবিচার, বৈষম্য, অসামঞ্জস্য, অপূর্ণাংগতা ও অস্পষ্টতা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে সরকারী চাকুরীতে সকল শ্রেণীর কর্মকর্তার সমান সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে চাকুরী পুনর্বিন্যাসের যে কাঠামো প্রস্তুত করা হইয়াছে উহাতে প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনিক সার্ভিসের সদস্যদের সর্বনিম্ন সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া হইয়াছে। বলাবাহুল্য এই ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক বিঘোষিত সমতা-ভিত্তিক চাকুরী কাঠামো তৈয়ারীর আশ্বাসের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

(১) বর্তমান ব্যবস্থায় দায়িত্বের ব্যাপ্তি এবং গভীরতার সহিত বেতন ও পদমর্য্যাদার কোন সমন্বয়ই রাখা হয় নাই। সাধারণ প্রশাসনে নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সাধারন প্রশাসন বহির্ভূত অফিসারদের তুলনায় ইহাদের বেতন ও পদমর্য্যাদা আপেক্ষিকভাবে বহুগুনে হ্রাস পাইয়াছে (উল্লেখ্য যে সংস্থাপন বিভাগ অধুনাকালে বারবার ঘোষনা করিয়াছেন যে বর্তমান চাকুরী ব্যবস্থায় বেতনই পদমর্য্যাদার একমাত্র প্রতিফলক)। উদাহরনস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সহকারী কমিশনার/ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদের সাবেক স্কেল ছিল যথাক্রমে টাকা ৫০০-১০০০/-এবং টাকা ৩৭৫-১০৫০/-। একই সময়ে ইক্ষু উন্নয়ন অফিসারদের বেতনের স্কেল ছিল টাকা ৩৫০-৯২৫/-। কিন্তু নূতন জাতীয় স্কেলে সহকারী কমিশনারের স্কেল টাকা ৭৫০-১৪৭০/- অথচ ইক্ষু উন্নয়ন অফিসারের স্কেল নির্ধারিত হইয়াছে টাকা ১৪০০-২২২৫/-তে। প্রশাসনিক সার্ভিসের জেলা প্রশাসকের পদ যাহা সাবেক সি, এস, পি সিনিয়র স্কেল টাকা ৮৫০-৭৫-১৪৫০-১০০-১৬৫০/--।-মাসিক বিশেষ বেতন টাকা ১৬৫/-তে ছিল তাহা যেমন একদিকে টাকা ৩৫০-৯২৫/- সাবেক স্কেলের জেলা কৃষি অফিসার, জেলা পশুপালন অফিসার, টাকা ৮০০-১০৫০/- সাবেক স্কেলের সাব-জজ, টাকা ৫০০-১২৫০/-সাবেক স্কেলের সরকারী কলেজের সহকারী অধ্যাপক ইত্যাদি অসংখ্য পদের সমতুল্য করিয়া একই নূতন জাতীয় স্কেল টাকা ১৪০০-২২২৫/তে স্থাপন করা হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে টাকা ৯০০-১৬০০/- সাবেক স্কেলের মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকের পদ টাকা ২৩৭৫-২৭৫০/-নূতন জাতীয় স্কেলে, টাকা ৭৫০-১৫০০/সাবেক স্কেলের সরকারী কলেজের অধ্যাপকের পদ টাকা ২১০০-২৬০০/-ও টাকা ২৩৫০-২৭৫০/-নূতন জাতীয় স্কেলে, টাকা ৪৫০-১২৫০/- সাবেক স্কেলের সহকারী পরিচালক (কৃষি, পাট, পশু পালন) ইত্যাদি পদ টাকা ১৮৫০-২৩৭৫/- নূতন জাতীয় স্কেলে উন্নীত করা হইয়াছে। পরিশিষ্ট 'ক'তে বিস্তারিত বিবরন দেওয়া হইল।

Dhaka University Institutional Repository

(২) প্রশাসনিক সার্ভিসের কাঠামোভিত্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে, কিন্তু পদোন্নতির সুযোগ আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি না করিয়া পূর্বের তুলনায় মারাত্মক ভাবে কমানো হইয়াছে। সাধারন প্রশাসন বহির্ভূত সকল সার্ভিসের তুলনায় উচ্চতর পদের সংখ্যা শতকরা হিসাবে প্রশাসনিক সার্ভিসেই ন্যূনতম। মাসিক টাকা ১৮৫০-২৩৭৫/-ও তাহার উপরের স্কেলের পদসমূহ বৈদেশিক সার্ভিসে উক্ত সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত সকল পদের শতকরা ৫০ ভাগ, শুল্ক ও আবগারী সার্ভিসে শতকরা ২৮ ভাগ, অডিট ও এ্যাকাউন্টস সার্ভিসে শতকরা ২৫ ভাগ, ট্যাক্সেসশন সার্ভিসে শতকরা ২২ ভাগ, অথচ প্রশাসনিক সার্ভিসের ক্ষেত্রে উক্ত স্কেলের পদের সংখ্যা এই সার্ভিসের সকল পদের শতকরা ১ ভাগেরও কম। বিস্তারিত বিবরন পরিশিষ্ট 'খ' তে দেওয়া হইল।

(৩) তদুপরি বিগত ৪ বৎসর ধরিয়া এই সার্ভিসের অফিসারগনকে বহু উচ্চ পদ শূন্য থাকা সত্বেও পদোন্নতি দেওয়া হয় নাই, অথচ অন্য সকল সার্ভিসেই যথারীতি পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছে এবং হইতেছে। অতীতের একই পরীক্ষায় প্রশাসনিক সার্ভিসের সদস্যদের তুলনায় মেধা তালিকায় নিম্ন স্থান অধিকারী অন্যান্য সার্ভিসের সদস্যদের কোন পরীক্ষা ব্যতিরেকেই একাধিক পদোন্নয়ন দেওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ইহার ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োজিত প্রশাসনিক সার্ভিসের কোন সদস্যই এখনও টাকা ১৪০০-২২২৫/- নূতন জাতীয় বেতন স্কেলে পদোন্নতি পান নাই। অথচ একই পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োজিত পুলিশ, অডিট ইত্যাদি সার্ভিসের অধিকাংশ সদস্যই উক্ত জাতীয় বেতন স্কেলে (টাকা ১৪০০-২২২৫/-) পদোন্নতি পাইয়া পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, ডেপুটি এ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল ইত্যাদি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। এমনকি ১৯৭৭ সালে কাষ্টমস ও এ্যাকাউন্ট সার্ভিসে যোগদানকারী অনেক অফিসার ইতিমধ্যেই সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি লাভ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে ইহাদের অনেকেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মেধা তালিকায় প্রশাসনিক সার্ভিসের সদস্যদের নিম্নে স্থান পাইয়াছিলেন। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে প্রশাসনিক সার্ভিসের ১৯৬৯ সালে নিয়োজিতদের অনেকেই এবং ১৯৭০ সালে নিয়োজিত সকলেই এখনও টাকা ১৪০০-২২২৫/-স্কেলে পদোন্নতি পান নাই। চাকুরীক্ষেত্রে ইহা হইতে অধিক বেদনাদায়ক ও হতাশাব্যঞ্জক আর কি হইতে পারে?

(৪) অনুরূপভাবে প্রশাসনিক সার্ভিসের ১৯৬১ হইতে ১৯৬৯ সন পর্যন্ত ব্যাচের সিনিয়র স্কেলের অধিকাংশ অফিসারকে আজ পর্যন্তও উপ সচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় নাই, অথচ অন্যান্য সার্ভিসের ১৯৭০ সনের অফিসারদের উপ সচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে। গত ৪ বৎসর যাবৎ প্রশাসনিক সার্ভিসের অফিসারদের পদোন্নতি অন্যায়ভাবে বন্ধ রাখিয়া এখন পদোন্নতির বেলায় ১৫ বৎসর চাকুরীকাল ও ৪৫ বৎসর বয়ঃসীমার বাধানিষেধ আরোপ করায় শতাধিক অত্যন্ত সিনিয়র অফিসার ভবিষ্যত পদোন্নতি হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের নিম্নপর্য্যায়ের অফিসারদের পদোন্নতির পথ রোধ করিয়া আছেন। ফলে এই সার্ভিসের অফিসারদের মধ্যে দারুন হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে আরও উল্লেখ্য যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত অন্যান্য সার্ভিসের জুনিয়ার অফিসার ও পদোন্নতিবঞ্চিত প্রশাসনিক সার্ভিসের সিনিয়র অফিসার অনেক ক্ষেত্রে একই ষ্টেশনে কর্মরত থাকায় প্রশাসনিক নৈরাজ্য ও ব্যক্তিগত বৈরীতার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে যখন অন্যান্য সার্ভিসের সদস্যদের দশ বৎসর চাকুরীকাল পূর্ণ হওয়া মাত্রই সিনিয়র সার্ভিসেস পুলে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হইতেছে, তখন প্রশাসনিক সার্ভিসের সদস্যদের নির্ধারিত এই চাকুরীকাল অনেক আগেই পূর্ণ হওয়া সত্বেও অনুরূপ সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে। এই ক্ষেত্রে দৃশ্যতই সরকারঅনুসৃত নীতি প্রশাসনিক সার্ভিসের অফিসারদের স্বার্থ ও ন্যায়নীতির পরিপন্থী হইয়াছে।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) বিগত ১লা মার্চ, ১৯৭৯ তারিখে সিনিয়র সার্ভিসেস পুল গঠনের নামে প্রশাসনিক চাকুরীর সকল জ্যেষ্ঠ পদ, যথা উপ সচিব, যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং সচিব ছাড়াও জেলা প্রশাসক পদের শতকরা ৭৫ ভাগ প্রশাসনিক সার্ভিস হইতে অপসারণ করিয়া পুলের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে প্রশাসনিক ক্যাডারের তেইশ শতাধিক অফিসারদের জন্য বর্তমানে টাকা ১৪০০ - ২২২৫/- স্কেলের পদের উপরে তাহাদের নিজ লাইনে পদোন্নতির জন্য মাত্র বারটি পদ ছাড়া আর কোন পদ নাই (যথা অতিরিক্ত কমিশনার ৮, বিভাগীয় কমিশনার ৪)। পক্ষান্তরে, অন্য কোন সার্ভিস হইতে একটি পদও অপসারনপূর্বক সিনিয়র সার্ভিসেস পুলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। বরং উক্ত সার্ভিসসমূহে বিগত কয়েক বৎসরে বহু উর্দ্ধতন নূতন পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং নূতন জাতীয় স্কেল প্রনয়নের সময় বহু নিম্ন পদকে কয়েক ধাপ উপরে উঠানো হইয়াছে। ইহার ফলে এই সমস্ত সার্ভিসের সদস্যদের নিজ নিজ লাইনে পদোন্নতির সম্ভাবনা এবং সুযোগ বহুগুন বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপরন্তু প্রশাসনিক সার্ভিসের পদ লইয়া গঠিত সিনিয়র সার্ভিস পুলে প্রবেশেরও তাহাদের অবাধ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সেক্রেটারীয়েট সার্ভিসের জন্য উপ সচিব পদের শতকরা দশ ভাগ এবং আইন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সকল পদের শতকরা ৫০ ভাগ পদ উক্ত সার্ভিসসমূহের সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে। অথচ পুল গঠনের পূর্ব পর্যন্ত প্রশাসনিক সার্ভিসের সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত ২৯৫টি উর্দ্ধতন পদের সবগুলিই পুলভুক্ত করা হইয়াছে এবং এই সার্ভিসের সদস্যদের জন্য একটি পদও সংরক্ষন করা হয় নাই। ফলে এই সার্ভিসের বিপুল সংখ্যক সদস্যদের পদোন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

(৬) সিনিয়র সার্ভিসেস পুলের সদস্যদের সচিবালয়ের বাহিরের বিভিন্ন পদ সমূহে অনধিক শতকরা ৫ ভাগ পদে নিয়োগের বিধান রহিয়াছে। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার পদের ক্ষেত্রে শতকরা ৭৫ ভাগ পদে সিনিয়র সার্ভিসেস পুলের সদস্যদের নিয়োগের বিধান রাখা হইয়াছে। ইহাতে প্রশাসনিক ক্যাডারের সদস্যদের পদোন্নতির পথ আরও সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বর্তমানে ডেপুটি কমিশনার ও অতিরিক্ত কমিশনারের সকল পদে এবং বিভাগীয় কমিশনারের ৪ টি পদের ৪ টিতেই সিনিয়র সার্ভিসেস পুলের সদস্যরা নিয়োজিত আছেন। ইহার ফলে প্রশাসনিক ক্যাডারের সদস্যগন পদোন্নতি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

(৭) সিনিয়র সার্ভিসেস পুলে বিভিন্ন চাকুরী এবং উৎস হইতে তথাকথিত পেশাদারীত্ব বৃদ্ধির যুক্তি দিয়া প্রশাসনে অনভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়ম এবং বিধিবহির্ভূত উপায়ে উপ সচিব হইতে শুরু করিয়া সচিবের পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। এই সমস্ত বহিরাগতদের তুলনায় সিনিয়র সার্ভিসেস পুলে নিয়মিত ভাবে নিযুক্ত প্রশাসনিক সার্ভিসভুক্ত সদস্যগনের আপেক্ষিক জ্যেষ্ঠতা নির্দ্ধারনের কোন বিধি প্রনয়ন বা জারী করা হয় নাই। ফলে মেধা ও অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে পদোন্নতির নিরীক্ষিত যোগ্যতা অপ্রাসংগিক হওয়ার পর্য্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে।

(৮) একই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মেধাতালিকায় শীর্ষস্থান অধিকারী প্রশাসনিক সার্ভিসের অফিসারদের তুলনায় একই মেধা তালিকায় নিম্নস্থান অধিকারী অন্য সার্ভিসের অফিসারগনকে সিনিয়র সার্ভিসেস পুলের জন্য সৃষ্ট সিনিয়রিটির তালিকায় উল্লেখিত প্রশাসনিক সার্ভিসের অফিসারদের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তী বৎসরের মেধাতালিকায় নিম্নস্থান অধিকারী অফিসারগনও পূর্ববর্তী বৎসরসমূহের শীর্ষস্থান অধিকারী প্রশাসনিক সার্ভিসের অফিসারগনকেও ডিংগাইয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। কতক ক্ষেত্রে এই তালিকায় অন্যান্য সার্ভিস হইতে আগত অফিসারগনকে সাবেক সি.এস.পি

Dhaka University Institutional Repository

অফিসার এবং বর্তমানে প্রশাসনিক সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে, যদিও ঐ সমস্ত অফিসারদের চাকুরীজীবনই শুরু হয় প্রশাসনিক সার্ভিসের সদস্যদের পরে। স্পষ্টতই এই তালিকা তৈয়ারীর ভিত্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও সকল ন্যায় নীতির পরিপন্থী।

(৯) সরকারী চাকুরীজীবিদের আইনসিদ্ধ কর্মকে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক নিরাপত্তা দেওয়া হয় নাই। ফলে সাধারণ প্রশাসনে নিয়োজিত অফিসারদিগকে বিবেক অনুগামী আইনসিদ্ধ নিরপেক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা সংরক্ষন করার পথে অনেক ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত ও ক্ষেত্রেবিশেষে অপদস্ত হইতে হইয়াছে। ফলে দেশে সার্বিকভাবে আইনের শাসন ব্যাহত হইতেছে।

(১০) মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও সংস্থাপন বিভাগ বরাবর মন্ত্রী পরিষদ মন্ত্রনালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই মন্ত্রী পরিষদ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব সরাসরিভাবে সরকারপ্রধান (রাষ্টপতি/প্রধান মন্ত্রী)-এর উপর ন্যস্ত থাকিত। বিভিন্ন উচ্চতর সার্ভিসের অফিসারগনের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে নিরপেক্ষ, কার্যক্ষম এবং দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবার জন্য সরকারপ্রধানের প্রত্যক্ষ ভূমিকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। বর্তমান ব্যবস্থায় ইহা সম্ভব হইতেছে না। ফলে সংশ্লিষ্ট অফিসারগনের স্বার্থ সুষ্ঠভাবে সংরক্ষিত রাখা সম্ভবপর নয়।

(১১) প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত অফিসারগনকে জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করা হইয়া থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে চাকুরীর অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও মেধার ভিত্তিতে রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ কমিটির সুপারিশক্রমে পদোন্নতি দেওয়া হইত। বিগত ১৯৭৯ সন হইতে বর্তমান সরকার প্রশাসনিক ক্যাডারভুক্ত অফিসারদের মৌলিক অধিকারকে উপেক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ একটি রাজনৈতিক কমিটির সুপারিশক্রমে সিনিয়র সার্ভিসেস পুলে পদোন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলে পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিবর্তে অন্য বিষয় প্রাধান্য পাইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(১২) সরকার কর্তৃক অনুসৃত পুনর্নিয়োগ ব্যবস্থা বিঘোষিত সরকারী নীতির সহিত সামঞ্জস্যবিহীন। একদিকে প্রায় পাইকারীভাবে পুনর্নিয়োগ আর অন্যদিকে অবসর গ্রহনের বয়সে পৌছাইবার আগে বহু ক্ষেত্রে কোন কারন না দর্শাইয়া অবসর গ্রহনের আদেশ জারীর ফলে অফিসারদের মনে উদ্বেগ ও সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে।

(১৩) বেসামরিক প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদের বেতন ও আনুসংগিক সুবিধাদি (fringe benefit) অন্যান্য ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ সরকারী কাঠামোর পদ সমূহের তুলনায় অনেক কম, যদিও সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারা দেশের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মেধা প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু ধাপ পার হইবার পর এই পদে উন্নীত হন এবং বর্তমানে সুপিরিয়র সার্ভিসেস পুলের মাধ্যমে সচিব পর্যায় পর্যন্ত উন্নতি লাভের সুযোগ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদসহ সকলের জন্যই উন্মুক্ত হইয়াছে। এই ধরনের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা যুক্তিগ্রাহ্য ও ন্যায় নীতি ভিত্তিক নহে।

(১৪) বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয়ে নিযুক্ত সমস্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতা তুলনীয় দেশ সমূহের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাদের তুলনায় অনেক বেশী (কারন বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সম্পূর্ণ দায়িত্বই এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত) হওয়া সত্বেও এই সমস্ত কর্মকর্তাদের বেতন তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এই বৈষম্য উপ সচিবদের বেলায় অত্যন্ত প্রকট। স্মর্তব্য যে স্বাধীনতার পূর্বে বিশেষ বেতনসহ কেন্দ্রীয় সরকারের উপ সচিবদের বেতনের সর্বোচ্চ

Dhaka University Institutional Repository

সীমা ছিল মাসিক ২০০০/- টাকা। বর্তমান বেতন বিন্যাস ব্যবস্থায় এই পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রতি মোটেই সুবিচার করা হয় নাই এবং এই ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মদক্ষতাকে হ্রাস করিবে বলিয়া আশংকা করার সংগত কারন রহিয়াছে।

(১৫) এই সমস্ত অবিচার, অনিয়ম (irregularities) ও ব্যত্যয়ের (anomalies) ফলে দেশময় এক নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক কাঠামো ভাংগিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ফলে দক্ষ প্রশাসকগণ অসন্তোষ ও বৈষম্যের শিকার হইতেছেন এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মধ্যে প্রশাসনিক সার্ভিসে যোগদানের আগ্রহ কমিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় অচিরে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি পূরনের জন্য উপযুক্ত মেধাবী ব্যক্তির অভাব হইয়া পড়িবে এবং ফলশ্রুতি হিসাবে দেশ ও জনগনের সার্বিক কল্যান নিদারুনভাবে বিঘ্নিত হইবে।

(১৬) মাসের পর মাস সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে কর্মবিরতি পালন এবং সরকারকে নানাভাবে হুমকি প্রদান ও চ্যালেঞ্জ করা সত্বেও কতিপয় বিশেষ শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী মাসান্তে সরকারের পরোক্ষ সম্মতিসহ বেতন এবং অন্যান্য ভাতা গ্রহন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে প্রশাসনিক চাকুরীর সদস্যদের নিয়মতান্ত্রিক আবেদন এবং ন্যূনতম দাবী আদায়ের সর্বোতভাবে বৈধ প্রয়াস এ যাবৎ সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত এবং অগ্রাহ্য হইয়াছে। কার্যতঃ ইহা স্পষ্ট হইতেছে যে অবৈধভাবে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টিকারীরা আর্থিক এবং অন্যান্য ভাবে লাভবান হন। ইহাতে নিয়মতান্ত্রিক পথ অনুসরনকারী প্রশাসনিক সার্ভিসের সদস্যদের নৈরাশ্য এবং বৈধ ক্ষোভ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইয়াছে, প্রশাসনিক কাঠামো দুর্বল হইতেছে এবং সার্বিকভাবে কর্মোদ্যম ব্যাহত হইতেছে। ইহার কুফল ইতিমধ্যেই সকলে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

(১৭ উপরোল্লিখিত পটভূমিকার প্রেক্ষাপটে ইদানীংকালে প্রশাসনের সর্ব পর্যায়ে আইন-সংখলা পরিস্থিতির অভাবনীয় এবং বেদনাদায়ক অবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে এবং দেশের উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি ব্যাপকভাবে ব্যাহত হইতেছে।

(১৮) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহের কর্মকর্তাদের উপর নিয়ন্ত্রন কার্যতঃ হারাইয়া ফেলিয়াছেন, যদিও জিলার আইন-শৃংখলা রক্ষার মৌলিক দায়িত্ব তাহাদেরই। অন্যদিকে যদিও সেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তৎপরতার প্রধান দায়িত্ব মুলতঃ জেলা প্রশাসকদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, বিভিন্নভাবে তাহাদের চিরাচরিত ভাবমূর্তি এবং আইনগত ক্ষমতা খর্ব হইবার ফলে তাহাদের পক্ষে এই দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

(১৯) মেট্রোপেলিটান পুলিশ বাহিনীসহ আলাদা মেট্রোপলিটান এলাকা সৃষ্টি করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল এলাকায় পুলিশ প্রশাসনের স্তর বিন্যাসের অনুরূপ সাধারন প্রশাসন ও ম্যাজিষ্ট্রেসির কোন সুষ্ঠ স্তর বিন্যাস করা হয় নাই। ফলে ঐ সকল এলাকায় রোধন ও সমন্বয়ের (check and balance) এর অভাবে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটিয়াছে, উন্নয়নমূলক কাজ বিঘ্নিত হইয়াছে, প্রশাসনিক জটিলতা এবং ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হইয়াছে। সুষ্ঠ এবং সুষম প্রশাসনিক কাঠামোর জন্য প্রতি মেট্রোপলিটান এলাকায় একজন করিয়া মেট্রোপলিটান চীফ কমিশনারের পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যিনি সমস্ত ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহায়তায় অন্যান্য এলাকার বিভাগীয় কমিশনারের দায়িত্ব পালন করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২০) ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে নূতন জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তনের পর গত ৪ বৎসরে জীবন যাত্রার ব্যয় (cost of living) শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় সীমিত আয়ের সকল শ্রেনীর সরকারী চাকুরীজীবিদের প্রকৃত আয় (Real Income) আনুপাতিক হারে কমিয়া গিয়াছে। ফলে তাঁহাদের পক্ষে জীবন যাপন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে। অনুরূপভাবে বাড়ী-ভাড়া ও চিকিৎসা খরচ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু বর্তমানে প্রদত্ত বাড়ী-ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। এই অবস্থার আশু প্রতিকার প্রয়োজন।

২। বর্নিত অবস্থার আলোকে প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনার সুসংহতকরন ও ন্যায়নিষ্ঠ প্রশাসন ব্যবস্থার স্বার্থে নিম্নলিখিত ন্যূনতম দাবীসমূহ আশু মিটানোর জন্য সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হইতেছে।

ন্যূনতম দাবী সমূহ :

(১) দায়িত্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতার সহিত সংগতি রাখিয়া সার্ভিসের সদস্যদের বেতন ও পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই সূত্রানুযায়ী :—

(ক) দ্বিতীয় শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্তি বা সমপ্রজ্ঞাকাল অতিক্রমের সংগে সংগে সকল সহকারী কমিশনারদের টাকা ৯০০-১৬১০/- নূতন জাতীয় স্কেল প্রদান করিতে হইবে। অনুরূপভাবে প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্তি বা সমপ্রজ্ঞাকাল অতিক্রমের সংগে সংগে সকল সহকারী কমিশনারদের টাকা ১১৫০-১৮০০/- স্কেলে উন্নীত করিতে হইবে। স্মর্তব্য যে বিচার বিভাগীয় মুন্সেফগনের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই এই ধরনের নীতি গ্রহন করিয়াছেন।

(খ) মহকুমা প্রশাসক ও সমপর্য্যায়ভুক্ত যে ৩৭৯ টি পদ বর্তমানে টাকা ১১৫০-১৮০০/- স্কেলে আছে, তাহা টাকা ১৪০০-২২২৫/- স্কেলে উন্নীত করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত মহকুমা প্রশাসকগনকে বিশেষ ভাতা হিসাবে মাসিক ২৫০/-টাকা দিতে হইবে। প্রশাসনিক সার্ভিসে পদোন্নতির সুযোগ সুবিধাদি অন্যান্য চাকুরীর তুলনায় সর্বনিম্ন বিধায় এই দাবী করা হইতেছে।

(গ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও সম পর্যায়ের পদ সমূহ টাকা ১৮৫০ -২৩৭৫/- স্কেলে উন্নীত করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে বর্তমানে এই স্কেলে প্রাক্তন ক্যানটনমেন্ট সার্ভিসের পাঁচটি পদ ছাড়া প্রশাসনিক সার্ভিসে আর কোন পদ নাই। উল্লিখিত পদ সমূহের শতকরা ৫০ ভাগ টাকা ২১০০-২৬০০/- স্কেলে রাখিতে হইবে। উল্লেখ্য যে বিচার বিভাগ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের বহু পদে অনুরূপ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে।

(ঘ) জিলা প্রশাসক ও সমপর্যায়ের পদসমূহ টাকা ২৩৫০-২৭৫০/-স্কেলে উন্নীত করিতে হইবে।

(ঙ) অতিরিক্ত কমিশনারের পদসমূহ মাসিক ২৮৫০/ টাকায় ধার্য করিতে হইবে।

(চ) কমিশনার ও সমপর্য্যায়ের পদসমূহ মাসিক ৩০০০/- টাকায় নির্ধারিত করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে পুলিশ সার্ভিস, অডিট সার্ভিস ইত্যাদিতে এই স্কেলের একাধিক পদ বর্তমানে বিদ্যমান রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আই, জি, পি এবং কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের পদ উল্লেখ করা যায়। বৈদেশিক সার্ভিসেও ১১টি পদ মাসিক ৩০০০/ টাকা স্কেলে আছে।

(ছ) অন্যান্য সার্ভিসের ন্যায় প্রশাসনিক চাকুরীর পদগুলিতে শতকরা ৫ ভাগের অধিক নিয়োগ সিনিয়র সার্ভিসেস পুল অফিসারগণ কর্তৃক হইতে পারিবে না।

Dhaka University Institutional Repository

(জ) প্রশাসনিক সার্ভিস হইতে সচিবালয়ে শাখা অফিসার পদে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তাকে সহকারী সচিব (Under Secretary) নামে অভিহিত করিতে হইবে এবং টাকা ১৪০০-২২২৫/- ও টাকা ১১৫০-১৮০০/- এই উভয় স্কেলে অধিষ্ঠিত এই সার্ভিসের সদস্যদের উক্ত পদে নিয়োগের ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে।

(২) প্রশাসনিক সার্ভিসের কাঠামো সুসংহত এবং যুক্তিগ্রাহ্য করিতে হইবে। সর্বাপেক্ষা বড় কাঠামোভিত্তি লইয়া গঠিত এই সার্ভিসে উচ্চ পর্যায়ের পদ আনুপাতিকভাবে অন্যান্য যে কোন সার্ভিসের তুলনায় কম। এই অবিচার দূর করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে :—

(ক) ১৯৬৯ সন হইতে ১৯৭৩ সনের ব্যাচ পর্য্যন্ত প্রশাসনিক সার্ভিসের যে সকল অফিসারদের টাকা ১৪০০-২২২৫/- স্কেলে পদোন্নতি বন্ধ রাখা হইয়াছে, তাহাদের পদোন্নতি অনতিবিলম্বে দিতে হইবে। উল্লেখ্য যে অন্যান্য অনেক সার্ভিসের ১৯৭৭ ব্যাচের সদস্যগণ ইতিমধ্যেই বিনা পরীক্ষায় এই স্কেলে পদোন্নতি পাইয়াছেন।

সিনিয়র সার্ভিসেস পুল গঠনের নামে গত ৪ বৎসর ধরিয়া অনিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রশাসনিক সার্ভিসের ১৯৬১ হইতে ১৯৬৭ সন পর্যন্ত ব্যাচের যে বিরাট সংখ্যক অফিসারদের উপ সচিব পদে পদোন্নতি বন্ধ রাখা হইয়াছিল সম্প্রতি তাহাদের কিছু সংখ্যক অফিসারদের উপ সচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হইলেও অধিকাংশ জ্যেষ্ঠ ও যোগ্য অফিসারদের পদোন্নতি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইহাদের ডিঙ্গাইয়া অন্যান্য সার্ভিসের ১৯৭০ সনের অফিসারদের পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে এই বিরাট সংখ্যক অতি সিনিয়র ও দক্ষ অফিসারদের মধ্যে দারুন হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে এবং চাকুরীক্ষেত্রেও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হইয়াছে। ন্যায়-নীতি ও দক্ষ প্রশাসনের স্বার্থে এই সকল দক্ষ ও যোগ্য সিনিয়র অফিসারদের অনতিবিলম্বে উপ সচিব ও সম পর্য্যায়ের পদে পদোন্নতি দিতে হইবে। উপ সচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ১৫ বৎসরের চাকুরী সীমা ও ৪৫ বৎসরের বয়ঃসীমার বর্তমান বাধা অন্ততপক্ষে ১৯৮৫ সন পর্যন্ত রহিত করিতে হইবে। উপ সচিব হিসাবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত প্রশাসনিক সার্ভিসের অফিসারগণের আপেক্ষিক জ্যেষ্ঠতা ন্যায়নিষ্ঠভাবে অন্যান্য সার্ভিস হইতে আগত অফিসারগণের তুলনায় প্রশাসনিক অভিজ্ঞান, সার্বিক দক্ষতা ও মেধার ভিত্তিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(খ) প্রশাসনিক সার্ভিসের ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সনের সিনিয়র স্কেলপ্রাপ্ত অফিসারদের চাকুরী ১০ বৎসর পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সিনিয়র সার্ভিস পুলে প্রবেশের জন্য পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। অথচ অন্যান্য সার্ভিসের ১৯৭০ সনের অফিসারদের ডাকা হইয়াছে এবং উক্ত পরীক্ষার ভিত্তিতে উপ সচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে। এমতাবস্থায় প্রশাসনিক সার্ভিসের ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সনের সিনিয়র স্কেলপ্রাপ্ত অফিসারদের অনতিবিলম্বে উল্লিখিত পরীক্ষার সুযোগ দিতে হইবে এবং যোগ্য বিবেচিত অফিসারদের উপ সচিব পদে পদোন্নতি দিতে হইবে।

(গ) ইতিমধ্যে যে ২৯৫টি পদ টাকা ১৮৫০-২৩৭৫/- বা তাহার উপরের স্কেলে প্রশাসনিক সার্ভিসের আওতায় সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছেন তাহা আশু ভিত্তিতে সনাক্ত করিতে হইবে এবং সনাক্তকৃত পদসমূহ অনতিবিলম্বে পদোন্নতির মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রশাসনিক সার্ভিসের সদস্যদের দ্বারা পূরণ করিতে হইবে। উল্লেখযোগ্য যে কথিত পদগুলির মাত্র ১২ টি এ পর্যন্ত চিহ্নিত করা হইয়াছে (যথা—অতিরিক্ত কমিশনারের ৮টি এবং বিভাগীয় কমিশনারের ৪টি পদ)।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) সকল মেট্রোপলিটান এলাকায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুসংহত করার জন্য মাসিক ৩০৩০/ টাকার বেতনে প্রতি এলাকায় মেট্রোপলিটান চীফ কমিশনারের পদ সৃষ্টি করিতে হইবে।

(ঙ) বিভিন্ন উৎস হইতে সিনিয়র সার্ভিসেস পুলে আত্মীকৃত অফিসারগণের আপেক্ষিক জ্যেষ্ঠতা ন্যায়নিষ্ঠভাবে প্রশাসনিক অভিজ্ঞান, সার্বিক দক্ষতা ও মেধার ভিত্তিতে নির্ধারিত করিতে হইবে।

(চ) অতীতের ন্যায় সকল উচ্চতর পদে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সুপারিশক্রমে পদোন্নতি প্রদানের প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করিতে হইবে। পুনর্নিয়োগ এবং প্রশাসনের উর্ধতন পদসমূহে সরাসরি অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রেও এই বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হইবে। এই বোর্ডকে আরও কর্মক্ষম ও প্রতিনিধিত্বশীল করার জন্য ইহার আশু পুনর্গঠন করিতে হইবে, যাহাতে মন্ত্রী পরিষদ, সংস্থাপন ও অর্থ ইত্যাদি বিভাগের সচিব ছাড়াও সিনিয়র সার্ভিসেস পুলে অন্তর্ভুক্ত সকল ক্যাডারের সচিব পর্য্যায়ে কর্মরত প্রবীনতম অফিসারগণকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

(ছ) বিভাগীয়, স্বায়ত্বশাসিত ও আধা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহে প্রশাসনিক সার্ভিসের সদস্যদের পূর্বের ন্যায় নিয়োগের ব্যবস্থা চালু রাখিতে হইবে এবং প্রেরণে (Deputation) থাকাকালীন সময়ে এই সকল অফিসারগণকে অধিষ্ঠিত পদের বেতন (Pay of the post) দিতে হইবে।

(জ) অবসর গ্রহণোত্তর পুনর্নিয়োগ নীতিগতভাবে বন্ধ করিতে হইবে। যে দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ যাহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে সেই দেশে এই ধরণের পরিহার্য পুনর্নিয়োগ সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। বিচার বিভাগ ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে বর্তমানে নিয়োজিত ৬০ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক কর্মকর্তাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে। তবে বর্তমানে চালাও কিন্তু বৈষম্যমূলকভাবে প্রদত্ত পুনর্নিয়োগ ব্যবস্থা যদি অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনশক্তির অভাবজনিত কারণে গৃহীত হইয়া থাকে তাহা হইলে অন্যান্য তুলনীয় দেশের ন্যায় অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ বৎসর হইতে ৫৮ বৎসর বয়সে বাড়ানো উচিত যেন সব কর্মকর্তাই সমান সুযোগ পায়। সে ক্ষেত্রে ৫৮ বৎসর বয়সের পর পুনর্নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বিভিন্ন উপ-অনুচ্ছেদে যে সকল অতিরিক্ত সুবিধা দাবী করা হইয়াছে তাহা গৃহীত হইলে এই সার্ভিসের উচ্চতর পদের (টাকা ১৮৫০-২৩৭৫/- ও ইহার উপরের স্কেলের পদে) অনুপাত প্রশাসনিক সার্ভিসের ক্যাডারভুক্ত পদসংখ্যার মাত্র শতকরা ১৯ ভাগএ উন্নীত হইবে। অতীতের ও অন্যান্য সার্ভিসের তুলনায় ইহাও অতি নগন্য। পরিশিষ্ট "খ" (১) ও "খ" (২) অংশে বর্তমান ও প্রস্তাবিত অবস্থা এক নজরে দেখান হইল।

৩। প্রশাসনে দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা অর্জন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন :

(ক) বিভিন্ন মহলের চাপ ও অনুরোধ উপরোধের মুখে কোন মন্ত্রীর পক্ষে নিরপেক্ষভাবে সংস্থাপন বিভাগের দায়িত্ব পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অতএব উক্ত বিভাগকে অতীতের ন্যায় এবং অন্যান্য তুলনীয় দেশে অনুসৃত রীতি অনুযায়ী সরাসরি মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) সরকারের উর্দ্ধতন পদসমূহে নিয়োগ বা পদোন্নতির ব্যবস্থা অরাজনৈতিক এবং নিরপেক্ষ হইতে হইবে এবং এই সমস্ত ক্ষেত্র ছাড়াও সমস্ত পুনর্নিয়োগ ও বেসামরিক প্রশাসনে উর্দ্ধতন পদে সকল সরাসরি নিয়োগ সুপিরিয়র সিলেকসান বোর্ডের সুপারিশক্রমে হইতে হইবে।

(গ) সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রে সাংবিধানিক নিরাপত্তা প্রদান করিতে হইবে।

৪। (ক) যুগপ্রেক্ষিতে প্রশাসনে দক্ষতা বর্ধনের জন্য স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রশাসনিক সার্ভিসের সদস্যদের জন্য নিশ্চিত করিতে হইবে।

(খ) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট, চার্টার্ড ও কষ্ট এ্যাকাউন্টটেন্টস এসোসিয়েশন ও মেডিকেল এসোসিয়েশন প্রভৃতি সংস্থার অনুরূপ এই এসোসিয়েশনের সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশাসনিক ইনষ্টিটিউট স্থাপনের উদ্দেশ্যে সরকারী জমি ও আর্থিক অনুদান মঞ্জুর প্রদান করিতে হইবে।

(গ) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসনিকঃফুড) কে প্রশাসনিক সার্ভিসের আওতাবহির্ভূত রাখিয়া বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ফুড) নামে অভিহিত করিতে হইবে এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসনিকঃ প্রশাসনিক) কে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসনিক) নামকরন করিতে হইবে।

(ঘ) আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিশ্চিত উন্নতি সাধনকরে পুলিশ রেগুলেশন এর ১৯৭৫ সনের নভেম্বর পর্যন্ত বলবৎ পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট সম্পর্ক সংক্রান্ত সকল বিধান কার্যকরভাবে পুনঃপ্রবর্তন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করিতে হইবে।

(ঙ) দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও সুসংহত ও ত্বরান্বিত করার স্বার্থে সন্তোষজনক বিকল্প ব্যবস্থা করা সাপেক্ষে ইতিমধ্যে গৃহীত সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা প্রশাসকগণকে প্রশাসনিক পর্যায়ে উন্নয়ন সমন্বয়কারী হিসাবে ঘোষনা করিতে হইবে।

৫। (ক) সচিব ও সচিব পর্যায়ের অফিসারদের বিনা ভাড়ায় সরকারী বাড়ী ও গাড়ীর সুবিধা দিতে হইবে এবং তদসহিত বিচার বিভাগ ও সামরিক বাহিনীতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাঁহাদিগকে গাড়ীতে বিশেষ পতাকা ব্যবহারের অনুমতিসহ সমানহারে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে। উল্লেখ্য যে চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত কিছু সংখ্যক সচিব ও সচিব পর্যায়ের অফিসার বহুকাল পূর্ব হইতেই নিজস্ব বাড়ী থাকা সত্বেও সরকারী বাড়ী এবং গাড়ীর সুবিধা ভোগ করিতেছেন।

(খ) উন্নয়ন কার্য ত্বরান্বিত করা ও দেশের আইন শৃংঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সমন্বয় ব্যবস্থাকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে কেবিনেট সেক্রেটারীর পদ মর্যাদা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেক্রেটারী জেনারেলের অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে এ ব্যবস্থায় সিনিয়র সার্ভিসেস পুলের উর্দ্ধতন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সুযোগ ন্যায়সংগতভাবে বৃদ্ধি পাইবে।

(গ) সরকারের অতিরিক্ত সচিবদের বিনা ভাড়ায় সরকারী বাড়ী ও গাড়ীর সুবিধা দিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) এই সার্ভিসের যে সকল যুগ্ম সচিব ৩ বৎসরকাল যাবৎ যুগ্ম সচিব পদে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহাদিগকে অনতিবিলম্বে অতিরিক্ত সচিব হিসাবে পদোন্নতি দিতে হইবে। যদি শূন্য পদের অভাবে তাঁহাদিগকে পদোন্নতি দেওয়া সম্ভব না হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অন্ততঃ ২৮৫০/- টাকার স্কেল প্রদান করিতে হইবে।

(ঙ) সরকারের সচিব ও অতিরিক্ত সচিবগণ মাসিক টাকা ১২৫/-এর বিনিময়ে সরকারী গাড়ী ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করেন, কিন্তু মাত্র সীমিত সংখ্যক যুগ্ম সচিব এই সুবিধা পান। সরকারী কাজের সুবিধার্থে সকল যুগ্ম সচিবকে এই সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

(চ) নূতন জাতীয় স্কেলে উপ সচিবদের দায়িত্বের সহিত বেতনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার খাতিরে উক্ত পদ সমূহের বেতন টাকা ২১০০-২৬০০/- স্কেলে ধার্য্য করিতে হইবে।

৬। (ক) অন্যান্য দেশের মত বার্ষিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হারের সহিত সংগতি রাখিয়া বৎসরান্তে সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে বেতন স্কেল পুনর্নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী বেতন কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে।

(খ) ১৯৭৭ সনের তুলনায় জীবন যাত্রার ব্যয় শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন এবং দ্রুত বর্দ্ধনশীল দ্রব্যমূল্যের চাপে অতিষ্ট এবং আর্থিক ও সামাজিক ভাবে পর্য্যুদস্ত সকল শ্রেণীর কর্মচারী-দের বর্তমান অনটন তাৎক্ষনিকভাবে লাঘব এবং ভদ্র ও সৎভাবে জীবন যাপনে সহায়তা দানের জন্য সরকারী হিসাব অনুযায়ী মূল্য বৃদ্ধির আনুপাতিক হারে অথবা সরকারের আর্থিক সামর্থের সহিত সংগতি রাখিয়া সকল সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করিতে হইবে ও একই কারণে সর্বোচ্চ বার্ষিক টাকা ২৪০০/- সিলিং এর মধ্যে প্রকৃত চিকিৎসা খরচ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মহার্ঘ্য ভাতা কমপক্ষে অফিসারদের বেলায় বেতনের শতকরা ৪০ ভাগ এবং নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীদের বেলায় শতকরা ৫০ ভাগ হইতে হইবে। অনুরূপভাবে সরকারী কাজ সুসম্পন্ন করার স্বার্থে দৈনিক ও ভ্রমন ভাতাকে জীবন যাত্রার ব্যয়ের সহিত সংগতিপূর্ণ করিতে হইবে।

(গ) সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত নিশ্চিত করিতে হইবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে নিম্নলিখিত হারে বাড়ী ভাতা প্রদান করিতে হইবে :

মাসিক ১০০০/- টাকা পর্য্যন্ত বেতনের শতকরা ৫০ ভাগ—সর্বনিম্ন ২৫০/- টাকা।
,, ১০০১/- ,, বেতন হইতে ২০০০/- পর্যন্ত শতকরা ৪৫ ভাগ—সর্বনিম্ন ৬০০/- টাকা।
,, ২০০১/- ,, বেতন হইতে উপরে শতকরা ৪০ ভাগ সর্বনিম্ন ১০০০/- টাকা।

নূতন জাতীয় বেতন স্কেলে প্রশাসনিক ক্যাডার পদের সহিত অন্যান্য ক্যাডারভুক্ত পদের বেতন স্কেলের তুলনামূলক তালিকা

প্রশাসনিক ক্যাডার

পদের নাম	সাবেক স্কেল	নূতন জাতীয় স্কেল
১। সহকারী কমিশনার/ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।	টা: ৫০০-১০০০/ ৩৭৫-১০৫০	টা: ৭৫০-১৪৭০
২। মহকুমা প্রশাসক ও সমমান	ঐ + বি,বে-১২৫	টা: ১১৫০-১৮০০
১ ও ২ এর	সিলেকশন গ্রেড ১০৫০-১৩৫০	সিনিয়র স্কেল সেকশন অফিসার ১৪০০-২২২৫
৩। ডি,সি/এ, ডি, সি/ সি,এস,পি, সিনিয়র স্কেল	টা: ৮৫০-১৬৫০ + বি,বে-১৬৫	টা: ১৪০০-২২২৫
৪। উপ সচিব (সি, এস, পি সিনিয়র স্কেল)।	টা:৮৫০-১৬৫০ + বি,বে-৪৪০	টা: ১৮৫০-২৩৭৫
৫। যুগ্ম সচিব	টা: ২৩০০-২৬০০	টা: ২৩৫০-২৭৫০
৬। কমিশনার	টা: ২৩০০-২৬০০	টা: ২৮৫০

দ্রষ্টব্য : ৪ ও ৫ এর পদগুলি বর্তমানে সার্ভিস পুল ভুক্ত।

অন্যান্য সার্ভিস

	পদের নাম	সাবেক স্কেল	নূতন জাতীয় স্কেল
কৃষি	১। জেলা কৃষি অফিসার	টা: ৩৫০-৯২৫	টা: ১৪০০-২২২৫
	২। তুলা উন্নয়ন অফিসার	টা: ৩৫০-৯২৫	টা: ১৪০০-২২২৫
	৩। ইক্ষু উন্নয়ন অফিসার	টা: ৩৫০-৯২৫	টা: ১৪০০-২২২৫
	৪। ইনফরমেশন অফিসার (কৃষি)	টা: ৩৫০-৯২৫	টা: ১৪০০-২২২৫
	৫। চীফ টেক ইনফরমেশন অফিসার	টা: ৪৫০-১২৫০ + বি,বে-২০০	টা: ১৮৫০-২৩৭৫
	৬। সহকারী এগ্রোনোমিষ্ট	টা: ৪৫০-১২৫০	টা: ১৮৫০-২৩৭৫
	৭। ডেপুটি ডাইরেক্টর এগ্রিঃ	টা: ৪৫০-১২৫০	টা: ১৮৫০-২৩৭৫
	৮। ডেপুটি ডাইরেক্টর লাইভষ্টক	টা: ৪৫০-১২৫০	টা: ১৮৫০-২৩৭৫
	৯। ডাইরেক্টর লাইভষ্টক	টা: ১৪৫০-১৭৫০	টা: ২৮৫০/=
	১০। ডাইরেক্টর এগ্রিকালচার	টা: ১৭০০-২১০০	টা: ২৮৫০/=
	১১। ডাইরেক্টর সীড সার্টিফিকেশন	টা: ১৭০০-২১০০	টা: ২৮৫০/=
	১২। চীফ কনজারভেটর অব ফরেষ্ট	টা: ১৭০০-২১০০	টা: ২৮৫০/=
শিক্ষা	১৩। সঃ কলেজের সহকারী অধ্যাপক	টা: ৪৭৫-১২৭৫	টা: ১৪০০-২২২৫
	১৪। ,, ,, এসোসিয়েট ,,	টা: ৭৫০-১৫০০	টা: ১৮৫০-২৩৭৫
	১৫। ,, ,, অধ্যাপক	টা: ৭৫০-১৫০০	টা: ২১০০-২৬০০
			টা: ২৩৫০-২৭৫০ ৫০%
স্বাস্থ্য	১৬। মেডিকেল কলেজের সহঃ অধ্যাপক	টা: ৫০০-৯৫০	টা: ১৪০০-২২২৫
	১৭। ,, ,, এসোসিয়েট ,,	টা: ৭৫০-১০৫০ + টি পি ১০০	টা: ১৮৫০-২৩৭৫
			টা: ২১০০-২৬০০ ৫০%
	১৮। ,, ,, অধ্যাপক	টা: ৯০০-১৬০০	টা: ২৩৫০-২৭১০
বিবিধ	১৯। সাব জজ	টা: ৮০০-১০৫০	টা: ১৪০০-২২২৫
	২০। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার	টা: ৭০০-১২৫০ + টি পি ১০০	টা: ১৪০০-২২২৫
	২১। সুপারিনটেনডিং ,,	টা: ১৩০০-১৭০০	টা: ২১০০-২৬০০

বিভিন্ন সার্ভিসে বিভিন্ন স্কেলে পদের সংখ্যা অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট "খ"

নূতন জাতীয় বেতন স্কেলে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারভুক্ত পদের সংখ্যা ও তাহার শতকরা হিসাব

(নির্বাচিত অ-কারিগরী ক্যাডারসমূহ)

বর্তমান অবস্থা

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	মোট পদের সংখ্যা	লিভ রিজার্ভ		৭৫০-১৪৭০		৯০০-১৬১০		১১৫০-১৮০০		১৪০০-২২২৫		১৮৫০-২৩৭৫		২১০০-২১০০		২৩৫০-২৭৫০		২৮৫০		৩০০০		টা: ১৪০০-২২২৫ এর উর্ধে অনির্দ্ধারিত পদের সংখ্যা	
			সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১।	বৈদেশিক সার্ভিস	২৫২	X	X	৫৪	২১	,,	,,	X	X	৭২	২৯	৫৯	২৩	—	—	৩৯	১৫	১৭	৭	১১	৪·৩৭		
২।	কাষ্টম ও এক্সাইজ	১১৮	৭	৬	৪০	৩৪	,,	,,	,,	,,	৩৯	৩৩	১১	৯	১২	১০	৯	৮	৩	২·৫	—	—		
৩।	অডিট ও এ্যাকাউন্টস	১৩২	৩	২	৩২	২৮	,,	,,	,,	,,	৬২	৪৬	১৬	১২	২	১·৫	১৩	১০	৩	২	১	০·৭৫		
৪।	ট্যাক্সেসন	২৫৩	৬	২	৬২	২৪	,,	,,	,,	,,	১২৮	৫১	২৬	১০	১৮	৭	১১	৪	২	৮	—	—		
৫।	পোষ্টাল	১৫৯	১০	৬	১০১	৬৩	,,	,,	,,	,,	১৬	১০	১১	৭	৯	৬	১১	৭	১	০·৬	—	—		
৬।	বিচার বিভাগ	২১৩	১৩	৬	৬৪	৩০	,,	,,	৬৫	৩০	৫০	২৩	১৬	৮	,,	,,	,,	,,	৫	২	—	—		
৭।	রেলওয়ে (টি ও টি)	৬১	৪	৭	৪১	৬৭	,,	,,	,,	,,	১১	১৮	,,	,,	২	৩	২	৩	১	১·৬৩	—	—		
৮।	পুলিশ	৪৪২	১৮	৪	১৮৯	৪৩	,,	,,	১০২	২৩	১১৭	২৬	,,	,,	,,	,,	১২	৩	৩	০·৭	১	০·২		
৯।	প্রশাসনিক	২৩৩৪	১৬৪	৭	১১৮০	৫১	৬৪	৩	৩৭৯	১৬	২৩৬	১০	৫	০·২৪	৮	০·৩৯	—	—	৪	০·২	—	—	২৮৩	১২
	সিনিয়র সার্ভিসেস পুল	৬২৫	—										৩৮২	৬১	,,	,,	১৬৮	২৭	২৫	৪	৫০	৮		
	এসোসিয়েশনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে প্রশাসনিক ক্যাডারের পদের সংখ্যা ও তাহার শতকরা হিসাব	২৩৩৪	১৬৪	৭	৬০০	২৬	১৫০	৬	৪৯৪	২১	৪৭৯	২০	৫৮ + ২৮৩	২ ১২	৫৮	২	২৫	১	৮	০·৩৪	৪	০·১৭		

"খ" (১) সংক্ষেপ (বর্তমান অবস্থা)

ক্রমিক সংখ্যা	ক্যাডারের নাম	মোট পদের সংখ্যা	টা: ১৪০০-২২২৫ এর উর্ধে পদের সংখ্যা ও শতকরা হার	
			সংখ্যা	%
১।	বৈদেশিক সার্ভিস	২৫২	১২৫	৫০
২।	কাষ্টম ও এক্সাইজ	১১৮	৩৩	২৮
৩।	অডিট ও এ্যাকাউন্টস	১৩২	৩২	২৫
৪।	ট্যাক্সেসন	২৫৩	৫৭	২২
৫।	পোষ্টাল	১৫৯	২৯	১৮
৬।	বিচার বিভাগ	২১৩	২১	১০
৭।	রেলওয়ে (টি ও টি)	৬১	৫	৮
৮।	পুলিশ	৪৪২	১৬	৪
৯।	প্রশাসনিক	২৩৩৪	২৯৫	১৩
	সিনিয়র সার্ভিসেস পুল	৬২৫	৬২৫	১০০

"খ" (২) সংক্ষেপ (এসোসিয়েশনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে যে অবস্থায় দাঁড়াবে)

ক্রমিক সংখ্যা	ক্যাডারের নাম	মোট পদের সংখ্যা	টা: ১৪০০-২২২৫ এর উর্ধে পদের সংখ্যা ও শতকরা হার	
			সংখ্যা	%
১।	বৈদেশিক সার্ভিস	২৫২	১২৫	৫০
২।	কাষ্টম ও এক্সাইজ	১১৮	৩৩	২৮
৩।	অডিট ও এ্যাকাউন্টস	১৩২	৩২	২৫
৪।	ট্যাক্সেসন	২৫৩	৫৭	২২
৫।	পোষ্টাল	১৫৯	২৯	১৮
৬।	বিচার বিভাগ	২১৩	২১	১০
৭।	রেলওয়ে (টি ও টি)	৬১	৫	৮
৮।	পুলিশ	৪৪২	১৬	৪
৯।	প্রশাসনিক	২৩৩৪	৪৩৬	১৯
	সিনিয়র সার্ভিসেস পুল	৬২৫	৬২৫	১০০

বি: দ্র: বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসনিক : প্রশাসনিক) ক্যাডার ভুক্ত টা: ১৪০০-২২২৫ উর্ধে অনির্দ্দিষ্ট ২৮৩ টি পদের কোনটিতেই বর্তমানে উক্ত সার্ভিসের কোন অফিসারকে পদোন্নতি দেওয়া হইতেছে না। ফলে বর্তমানে উক্ত সার্ভিসের অফিসারদের উল্লিখিত গ্রেডের উর্ধে পদোন্নতির সম্ভাবনা ০·৭৩% এ নামিয়া আসিয়াছে। অন্যান্য নিয়মিত ক্যাডারভুক্ত অফিসারদের পদোন্নতির তুলনায় ইহার মান সর্বনিম্ন।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট 'খ'

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস সমন্বিত কমিটি, ঢাকা

স্মারকলিপি

মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশকৃত

অক্টোবর, ১৯৮১

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বিত কমিটির সদস্য সাব-ক্যাডারসমূহ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বন)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (মৎস্য)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পশুপালন)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (শিক্ষা)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কারিগরী শিক্ষ)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ইকনমিক)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ট্রেড)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (গণ-পূর্ত)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (জনস্বাস্থ্য)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সড়ক ও জনপদ)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (টেলিকমুইনিকেশন)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অডিট এন্ড একাউন্টস)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কাস্টমস এন্ড একসাইড)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ট্যাক্সেসন)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পুলিশ)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পোষ্টাল)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে ট্রান্সপোর্টেশন এন্ড কমার্শিয়াল)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সেক্রেটারিয়েট)
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ইনফরমেশন)

Dhaka University Institutional Repository

মাহমান্য রাষ্ট্রপতি,

শতাব্দীর ঔপনিবেশিত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে একটি উন্নয়নকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম এমনটি দক্ষ প্রশাসন যন্ত্র নির্মাণের প্রয়াসে চাকুরী কাঠামোর বৈপ্লবিক পুনর্বিন্যাস নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু এই ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছাতে হলে প্রচলিত ধ্যান ধারণায়ও কার্যকরভাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে যেন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নীতি ও সামাগ্রিক দৃষ্টিভংগীতে তার প্রতিফলন হয়। একটি সুন্দর জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার প্রত্যাশায় সুপ্রশাসন সকলেরই একান্তভাবে কাম্য এবং তার জন্য চাই একটি ধারণা যার ফলশ্রুতিতে প্রশাসন ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পেশাদার ও কুশলী কর্মকর্তাদের একটি সংগঠিত সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হবে যেখানে প্রতিটি কর্মকর্তা হবেন দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন ও সমষ্টিগত লোকস্বার্থের সেবায় উদ্বুদ্ধ এবং যার জন্যে তাঁরা সংগঠনের কাছে হয়ে উঠবেন অনন্য ও অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে আরও যা প্রয়োজন তা হ'ল সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতিভাকে কাজে লাগানো যাতে করে তাদের অন্তর্নিহিত গঠনমূলক চিন্তাধারা, সৃজনী-শক্তি ও দূরদর্শিতার বিকাশ ঘটে।

সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে সরকারের বর্তমান প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের নীতি এমনি একটি প্রশাসন যন্ত্র নিশ্চিত করতে সক্ষম কিন্তু তা সম্ভব হবে যদি এই নীতির বাস্তবায়নের সংগে সংগে সামগ্রিক দৃষ্টিভংগীতেও আমূল পরিবর্তন আসে অন্যথায় নয়। একথা বলাই বাহুল্য যে, প্রচলিত ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা এই নীতির বাস্তবায়নে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করছে এবং করবেও। সেই কারণে সমতার ভিত্তিতে সার্ভিসসমূহের বিন্যাস ও একত্রীকরণ সকল পর্যায়ে সমাদৃত হলেও একটি বিশেষ সাব-ক্যাডার অর্থাৎ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসনিক ঃ প্রশাসনিক বিগত ১৬ই ও ১৭ই জুলাই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তকর তথ্যের অপ্রচার চালিয়ে সার্ভিসসমূহের মধ্যে সূচিত সুষ্ঠু পরিবেশকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে প্রকারান্তরে সেই সেই পুরানো, পরিত্যক্ত শাসন ব্যবস্থা কায়েমের দিকেই দিক নির্দেশ করেছেন। এমন কি তাঁদের অযৌক্তিক দাবী-দাওয়া মেনে নিতে সরকারকে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে তাঁরা একের পর এক চরমপত্র দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের এবং অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বনের হুমকি দিতেও দ্বিধা করেন নি। অথচ প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ অন্যান্য সাব-ক্যাডারের সদস্যগণের সমন্বিত প্রচেষ্টায় যখন এই চাক্রান্ত সৃষ্টির অপকৌশল সর্বসমক্ষে উন্মোচিত হয়েছে তখন তাঁরাই তাঁদের বিগত ২৪শে আগষ্টের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সমতাভিত্তিক একীভূত চাকুরী কাঠামোতে তাঁদের বিশ্বাসের ধূয়া তুলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করতে বিলম্ব করেন নি। বিলম্বিত হলেও তাঁদের এই স্বীকারোক্তি এটাই প্রমাণ করে যে চাকুরী কাঠামোর এই বৈপ্লবিক পুনর্বিন্যাস একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বার্থে কেবলমাত্র অপরিহার্য এবং অবশ্যম্ভাবীই নয় এবং অলঙ্ঘনীয়ও বটে।

অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই সকল প্রতিকূলতাকে ছাপিয়ে দায়িত্ব সচেতন অন্যান্য সাব-ক্যাডারের সদস্যগণ পুনর্বিন্যাসের বাস্তবায়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকারকে তাঁদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন এবং সেই যুগোপযোগী পদক্ষেপের স্বপক্ষে জনমতেরও দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে। অপ্রত্যাশিত হলেও তাঁদের এই অপপ্রয়াসের নেপথ্যে যেসব পদ্ধতিগত ভুল-ত্রুটি, পরিকল্পিত অনিয়ম ও অব্যবস্থা শক্তি যুগিয়েছে সেসব ভুল-ত্রুটি, অনিয়ম ও অব্যবস্থা দিবালোকের মত উন্মোচিত হয়ে চাকুরী কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের বাস্তবায়নে প্রধান অন্তরায়গুলিকে এক এক করে চিহ্নিত করেছে। আমরা মনে করি এই সকল অন্তরায়গুলির নিরসন না হলে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান থেকে যাবে যার ফলে এই নীতির বাস্তবে রূপ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি ভুল-ত্রুটি অনিয়ম ও অব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করলে এটাই প্রমাণিত হবে যে নীতি প্রণেতাগণের দৃষ্টিকে সুপরিকল্পিতভাবে এড়িয়ে সরকারের এই মহতী প্রচেষ্টাকে ব্যানচাল করার উদ্দেশ্যেই একটি বিশেষ গোষ্ঠি কর্তৃক এসব মূলনীতি বিরোধী কার্যকলাপ পরিচালিত হয়েছে:

১। সরকারের পুনর্বিন্যস্ত চাকুরী কাঠামোতে কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী ভিত্তিক শ্রেণীকরণের নীতি একটি বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খলও ব্যবস্থিত করেছে। এর ফলে একই ধরনের সকল পদকে একটি সমধর্মী শ্রেণীভুক্ত করে এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকে এক একটি ক্যাডার সার্ভিসে রূপ দেওয়া হয়েছে। সরকার এই নীতি অনুযায়ী সমস্ত প্রশাসনকে ২৮টি শ্রেণী বা সাব-ক্যাডারে বিভক্ত করেছেন ঠিকই কিন্তু একটি বিশেষ শ্রেণী বা সাব-ক্যাডারকে এবং সেই শ্রেণীভুক্ত সদস্যদেরকে বিভ্রান্তিকর ও ছদ্ম পদবীর আবরণে ঢেকে রেখে এই শ্রেণী বিন্যাসকে অর্থহীন করে তোলা হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে, এই বিশেষ সাব-ক্যাডারটির নাম "বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসনিক ঃ প্রশাসনিক)" এবং এই শ্রেণীভুক্ত কর্মকর্তাদের পদবী "জেলা প্রশাসক" এবং "বিভাগীয় কমিশনার"। এখানে বাকী ২৭টি সাব-ক্যাডার যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিত্তিতে সম্পৃক্ত সেখানে এই বিশেষ সাব-ক্যাডারকে নির্ধারিত দায়িত্ব এবং কর্তব্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের

Dhaka University Institutional Repository

অধীনস্ত বিভাগগুলির সংগে সম্পৃক্ত করা হয় নি এবং এই শ্রেণীভুক্ত কর্মকর্তাদেও কর্তব্য ও দায়িত্বভিত্তিক সাধারণভাবে প্রযোজ্য পদবীও দেওয়া হয় নি। ফলে সাধারণের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, এই বিশেষ সাব-ক্যাডাব সদস্যগণ স্বাধীন বাংলাদেশের আপমর জনগণের এবং সবার উপর কর্তৃত্ব করাই তাঁদের একমাত্র কাজ। বর্তমানে সমতাভিত্তিক পুনর্বিন্যস্ত চাকুরী কাঠামোতে এই ধরণের প্রশাসকের যে কোন স্থান নেই তা কারো অজানা নেই অতএব অন্য সাব-ক্যাডারের মত নির্ধাররিত সার্ভিস বা সেবামূলক কোন কর্তব্য এবং দায়িত্বের সংগে যদি এই সাব-ক্যাডারের সদস্যগণ সম্পৃক্ত হতে ব্যর্থ হন তা হলে এটাই প্রমাণিত হবে যে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চাকুরী কাঠামোতে এই গোষ্ঠিটি অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয়।

২। বলা বাহুল্য যে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্তুপের ওপর রচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্বিন্যস্ত চাকুরী কাঠামোতে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা ও ভিন্ন ধর্মী মানসিকতার বশবর্তী হয়ে নিতান্ত অযৌক্তিকভাবেই এই বিশেষ সাব-ক্যাডারের সদস্যগণ নিজেদেরকে 'প্রশাসক' বলে চিহ্নিত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছেন। তা না হলে স্বাধীন দেশে ডেপুটি কমিশনারের বাংলা 'জেলা প্রশাসক' না হয়ে অন্য কিছু হত। প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক প্রথায় ভূমি ব্যবস্থা, ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ ও নিম্ন আদালতে বিচার আচারকে কেন্দ্র করেই জেলা কালেকটরী সর্বস্ব বিদেশী শাসনামলে এই পদগুলির সৃষ্টি হয়েছিল যা এখন স্বাধীন দেশের প্রেক্ষাপটে ভূমি সংস্কার ও ভূমি প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি, যেমন প্রস্তাবিত ভূমি রাজস্ব বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ এবং নিম্ন আদালতে ম্যাজিস্ট্রেসীতে সীমাবদ্ধ।

অতএব নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী শ্রেণীভিত্তিক পুনর্বিন্যস্ত চাকুরী কাঠামোর পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য যা প্রথমেই প্রয়োজন তা হলো অন্যান্য ২৭টি সাব-ক্যাডারের মতো এই সাব-ক্যাডারের জন্য একটি নির্দিষ্ট কক্ষ নির্ধারণ করা এবং সেই কক্ষের চতুর্দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না করা হলে এর আত্মঘাতী ফলাফল সরকারকেও ভোগ করতে হবে। আমরা প্রস্তাব করি যে, এই বিশেষ সাব-ক্যাডারকে তাঁদের দায়িত্বের সংগে সম্পর্কিত ভূমি সংক্রান্ত বিভাগগুলির সংগে সংযুক্ত করা হোক এবং কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার ইত্যাদি পদগুলির সংজ্ঞাও তাঁদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব অনুযায়ী সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হোক। আমরা মনে করি যে, তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর ভিত্তি করে তাঁদেওকে ডেপুটি কমিশনার, ভূমি সংস্কার ও ম্যাজিস্ট্রেসী এবং কমিশনার ও এসডিওকে ও তদনুরূপভাবে চিহ্নিত করা আশু প্রয়োজন যে ভাবে কমিশনার/ডেপুটি কমিশনার (পুলিশ), কমিশনার/ডেপুটি কমিশনার (কর)কে নির্দিষ্ট দায়িত্বের গণ্ডিতে চিহ্নিত করা হয়েছে, জেলা বা বিভাগীয় প্রশাসক হিসেবে নয়।

৩। দেশের বর্তমান প্রশাসনের ধারা অনুযায়ী সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী কার্যক্রম স্ব স্ব মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্দেশিত পথে পরিচালিত ও সম্পাদিত হচ্ছে। এই অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে বিভিন্ন প্রকার কর্মকাণ্ডের তত্ত্বধান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরই অধীনে রয়েছে। সেখানে প্রগতি পরিপন্থী ঔপনিবেশিক ধারায় লালনে অন্য কোন সাব-ক্যাডারের অযৌক্তিক এবং অবাঞ্ছিত কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপ সমগ্র প্রশাসনেব স্বাভাবিক প্রবাহকে প্রতিহত করবে এবং সেই সংগে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে স্বীয় নির্ধারিত দায়িত্ব এবং কর্তব্যেও সংগে সম্পর্কবিহীন এই প্রশাসনিক ঃ প্রশাসনিক সাব-ক্যাডারের সদস্যগণ প্রশাসনের নামে অন্যান্য সাব-ক্যাডারের সদস্যদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের লক্ষ্যে নীতি বহির্ভূতভাবে এই সাব-ক্যাডাওে প্রয়োজনেব অতিরিক্ত বহুল সংখ্যক পদের সৃষ্টি করেছেন। ফলে এখানে নির্দিষ্ট দায়িত্ব, ব্যয় ও কার্য সমাধার মধ্যে কোন ভারসাম্য থাকে নি। দেশের বৃহত্তর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যেখানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্ত বিভাগগুলির ওপর ২১০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পিত সেখানে অধুনালুপ্ত নগর শুল্কের মত ৭ কোটি টাকা নীট রাজস্ব আদায়কারী ভূমি রাজস্ব অফিসারগণ নিজেদেরকে জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) হিসেবে চিহ্নিত করে দেশের রাজস্ব প্রশাসন সম্বন্ধে বিকৃত ও অবাস্তব চিত্র উপস্থাপিত করছেন। দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম যেখানে কৃষি, বন, মৎস, পশু পালন, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প, পূর্ত ও সেচ, সমাজকল্যাণ, জনসংখ্যা পরিকল্পনা, যোগাযোগ ও পরিবহণ ইত্যাদি খাতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি কর্তৃক পরিচালিত ও সম্পাদিত হচ্ছে সেখানে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সাব-ক্যাডারের চাকুরী কাঠামোতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন) বা সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এর পদ সৃষ্টি করে প্রকৃত দায়িত্বে নিয়োজিত বিভাগুলির সমপর্যায়ভুক্ত অফিসারদের উপর অহেতুক প্রশাসকের কর্তৃত্ব কায়েম করে তাঁদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ, নৈরাশ্য ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা হচ্ছে যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে সুদূরপরাহত করবে। একইভাবে গণশিক্ষার নামে এই বিশেষ গোষ্ঠির সদস্যদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ম্যাস লিটারেসী) পদবী দিয়ে এই সাব-ক্যাডারে অপ্রযোজ্য ২০টি পদের সংযোজন হয়েছে, কিন্তু দেশের সামগ্রিক শিক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বে পরিচালিত ও সম্পাদিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অন্যথায় এই ধরনের নিত্য নতুন সংশ্লিষ্ট বিভাগ বহির্ভূত পদ সৃষ্টি দারুণ অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। উল্লেখ্য যে, সংস্থাপন বিভাগ, মন্ত্রী পরিষদ ও রাষ্ট্রপতির সচিবালয় এই গোষ্ঠির পূর্ণ আধিপত্য থাকায় সরকারের নিকট উল্লিখিত অব্যবস্থার দিকটি তুলে ধরা হয় নি বরং যা প্রকট করে তুলে ধরা হয়েছে তা হলো শুধুমাত্র একটি বিশেষ গোষ্ঠীর পদোন্নতির জন্য নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং যে কোন প্রকারেই হোক এই সাব-ক্যাডারের সদস্যদেরকে পদোন্নতি দিতে হবে। সম্পূর্ণ এক ভয়ঙ্কর এবং নীতি বহির্ভূতভাবে এই সাব-ক্যাডারে পদ সৃষ্টি করায় আর একটি নজীর হল সচিবালয়ের ১০০টি সেকশন অফিসারের পদ এই সাব-ক্যাডারে সামিল করা। তাই বর্তমানে এই সাব-ক্যাডারটিতে যে কৃত্রিম সংখ্যাধিক্য প্রদর্শন করা হচ্ছে তা বিপুল অপচয়, অপব্যয় ও অসংগতিরই সমষ্টিগত ফল। শুধু তাই নয় এই কৃত্রিম সংখ্যার আনুপাতিক হারে এই সাব-ক্যাডারে কৃত্রিম লিভরিজার্ভ ও ডেপুটেশন রিজার্ভের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চারশত মতো যা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাব-ক্যাডারের সমষ্টিগত সদস্য সংখ্যার চারগুণ এবং সমগ্র দেশের পুলিশ সাব-ক্যাডারের সমষ্টিগত সদস্য সংখ্যার সমান। প্রকৃতপক্ষে চাকুরী কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের নীতির বিরোধিতা করে এর বাস্তবায়নকে প্রতিহত করার লক্ষ্যেই এই বিশেষ সাব-ক্যাডারের সদস্যগণ সচিবালয় থেকে শুরু করে থানা পর্যন্ত নিজেদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করার উলঙ্গ বাসনার বশবর্তী হয়ে এই সাব-ক্যাডারটিকে একটি নীতি ও দিকভ্রষ্ট গোষ্ঠিতে পরিণত করেছেন। এই বিশেষ সাব-ক্যাডার অন্য সাব-ক্যাডারের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করার লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক শাসনামলের "পুলিশ রেগুলেশন ৭৫-এ"কে পুনরুজ্জীবিত করার দাবী তুলেছেন এবং পুলিশের স্বাভাবিক কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদনায় বিভিন্ন অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন অথচ একটি সভ্য দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমন মূলত পুলিশেরই দায়িত্ব এবং কোন স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুলিশের নিজস্ব প্রশাসনিক কার্যে অন্য কোন প্রশাসনিক শাখার নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা মনে করি জেলা পর্যায়ে অযৌক্তিকভাবে সৃষ্ট ব্যয়বহুল কর্মকর্তাসর্বস্ব অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (উন্নয়ন), (প্রকল্প), (নিরক্ষরতা দূরীকরণ) এবং অনুরূপ অধস্তন পদসমূহের অবিলম্বে বিলোপ সাধন করা হোক এবং এসব পদেও কার্যসমূহ এবং দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সংস্থার ওপর ন্যস্ত করা হোক। সেক্রেটারীয়েটের ১০০টি সেকশন অফিসারের পদ এই সাব-ক্যাডারের আওতা বহির্ভূত করে এবং জেলায় ও থানায় উপরে বর্ণিত পদসমূহের বিলোপ সাধন করে শুধুমাত্র এই সাব-ক্যাডারটির নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রেক্ষাপটে দায়িত্ব, ব্যয় ও কার্য সমাধার নিরিখে প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী এই সাব-ক্যাডারের সত্যিকার সদস্য সংখ্যা যুক্তিসংগতভাবে নিরূপণ করা হোক। এই অযথার্থ পদগুলির বিলুপ্তি সাধন সরকারের ঘোষিত ব্যয় সংকোচ নীতিরই সম্পূরক।

৪। আমরা আগেই বলেছি যে, বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির কার্য সম্পাদন, তৎপরতা ও কার্যক্রমসমূহের সুষ্ঠু তার ও সমন্বয়ের স্বার্থে বিভাগীয় ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ে ব্যাপক পরিকল্পনা, নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা বর্তমান। এরূপ পরিকল্পিত বাস্তবায়নে বিভাগীয় নিম্ন ও উর্দ্ধ উভয় স্তরের কর্মকর্তা জড়িত আছেন এবং সেই সংগে সমন্বয় প্রক্রিয়াও অব্যাহত আছে। লোক প্রশাসনের সংজ্ঞা অনুযায়ী সমন্বয় হচ্ছে সংগঠনের প্রতিটি অংগের পারস্পরিক সামঞ্জস্য এবং ঐসব অংগের সঠিক সময়ে এমনভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠাকে বোঝায় যাতে উল্লিখিত প্রতিটি অংগ একটি পূর্ণাঙ্গ কোন কিছুর উৎপাদনে সর্বাধিক অবদান রাখতে পারে। অতএব প্রশাসনের সফল পর্যায়ে সমন্বয় শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পারস্পারিক আদান-প্রদানের মাধ্যমেই সম্ভব অন্য কারো মাধ্যমে নয়। বর্তমানে সমন্বয়ের নামে যা চলছে তা শুধু একটি বিশেষ সাব-ক্যাডার কর্তৃক অন্যান্য সাব-ক্যাডারগুলির উপর কর্তৃত্ব ফলানোর প্রচেষ্টা। এরূপ কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপ চলতে থাকলে তা মারাত্মক প্রশাসনিক জটিলতা ও অব্যবস্থারই সৃষ্টি করবে এবং তাতে দেশের সামগ্রিক প্রশাসন অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অতএব আমরা প্রস্তাব করি যে, বর্তমানের সমন্বয়ের নামে কর্তৃত্ব ও আনুষ্ঠানিকতার বিলোপ সাধন করা হোক এবং স্বীকৃত প্রশাসনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা হোক।

৫। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের শীর্ষ নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত রয়েছে। তাছাড়া তিনি সশস্ত্র বাহীনির সর্বাধিনায়ক। তিনি যাতে প্রশাসন পদ্ধতির প্রবৃত্তি ও উৎকর্ষ নির্ধারণে সুবিবেচনাপ্রসুতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তার জন্য তাকে নিরপেক্ষভাবে সার্ভিস বিষয়াদি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত করা প্রয়োজন। একথা সর্ব স্বীকৃত যে কোন দেশের রাষ্ট্রপতির পক্ষেই সরকারের প্রত্যন্ত কার্যক্রমের তদারক করা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তুলনামূলকভাবে প্রশাসনিক কর্ম তৎপরতার প্রতি যাঁরা বেশি মনোযোগী হতে পারেন তাঁরা হলেন মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ। অতএব সার্ভিস বিষয়ে ন্যায্য ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির সচিবালয়কে কোন বিশেষ সার্ভিসের একদেশদর্শী প্রভাব থেকে যেমন মুক্ত করার প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন প্রধান নির্বাহীর মূল্যবান সময় বাঁচিয়ে সার্ভিস বিষয়াদি একজন জনপ্রতিনিধির মাধ্যমেই নির্বাহিত ও বাস্তবায়ন করা। এই কারণেই এই সংস্থাপন বিভাগ একজন মন্ত্রীর অধীনে রাখা হয়েছে এবং এই ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন যুক্তিসংগত হবে না। তাছাড়া সংস্থাপন বিভাগ যেহেতু বর্তমান সার্ভিস কাঠামোর ২৮টি শ্রেণীরই স্নায়ু-কেন্দ্র অতএব এই বিভাগে অবিলম্বে প্রতিটি সাব-ক্যাডার সার্ভিসের সদস্যদের নিয়োগ করে প্রশাসনের বিভিন্ন শিরা-উপশিরা এবং তন্ত্রীর সংগে প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সংযোগ স্থাপন না করলে সরকারের সংস্থাপন বিভাগ একটি বিশেষ সাব-ক্যাডারেরই প্রতিনিধিত্ব করবে এবং এই বিভাগ কখনই দেশের সামগ্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে চিহ্নিত হবে না। তাছাড়া প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ-নির্বাহীকে নিয়েই যেখানে মন্ত্রী পরিষদ গঠিত সেখানে এই মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সাব-ক্যাডার সার্ভিসের সদস্যদের সমভাবে নিয়োগ না করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে পারে না। তাছাড়া সার্ভিস বিষয়াদি এমন কি দেশের প্রশাসনিক রূপরেখা নির্ধারণে মন্ত্রী পরিষদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে আমাদের বিশ্বাস এবং তা প্রায় সবক্ষেত্রেই একটি সাব-ক্যাডারের অন্যায় প্রধান্য ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। অতএব মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত সমূহের সঠিক ও সার্থক রূপায়নের জন্য মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে প্রত্যেক সাব-ক্যাডারের সদস্যদেও নিয়োগ করা একান্তভাবে প্রয়োজন।

৬। বর্তমানে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে যে 'সিনিয়র সার্ভিস পুল' সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে চাকুরী কাঠামোর বিদ্যমান ২৮টি সাব-ক্যাডারের সদস্যদেরই প্রবেশের অধিকার রয়েছে। কিন্তু এই পুলে প্রবেশের প্রথম পূর্ব শর্তই হল অতীতে বিদ্যমান, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত অসমমানের পদ সমষ্টিগুলির মধ্যে জ্যেষ্ঠত্বের ব্যবধান নিরুপণ করা এবং তদনুযায়ী পারস্পরিক জ্যেষ্ঠত্বের নীতিমালা বা ইকুইসি সিনিয়রিটি রুলস তৈরী করা। এরূপ সিনিয়রিটি রুলস তৈরি হলেই ক্যাডার সার্ভিস কর্মকর্তাদের স্ব স্ব জ্যেষ্ঠত্বের মাপকাঠিতে সার্ভিস পুলে প্রবেশের বিষয় বিবেচ্য হবে। অথচ এই অপরিহার্য পূর্ব শর্তকে নির্বিঘ্নে ধামাচাপা দিয়ে ১৯৬৯ সালের তদানীন্তন প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের অফিসারগণ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এবং অন্যান্য সার্ভিসের সিনিয়র সদস্যদেরকে বঞ্চিত করে এই সার্ভিস পুলে অনুপ্রবেশ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাক্তন সিএসপিদের সংগে ৭/৮ বছরের জ্যেষ্ঠত্বের ব্যবধান রেখে এই শ্রেণীর অফিসারদের নিজস্ব গ্রেডেশন তালিকাও প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রাক্তন সিএসপি এবং সমপর্যায়ের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সার্ভিসের সদস্যদেও বেলায় যদি উপসচিব পদে প্রবেশের জন্য ন্যূনপক্ষে ১০ বছর চাকুরীকালের প্রয়োজন হয় তা হলে প্রাক্তন সিএসপিদের সংগে ৭/৮ বছরের জ্যেষ্ঠত্বের ব্যবধান যোগ করলে প্রাক্তন প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের অফিসারদের উপসচিবের পদে প্রবেশের জন্য চাকুরীকাল অংকের হিসাব অনুযায়ী অন্ততঃ ১৭ থেকে ১৮ বছর হওয়া উচিত। অতএব একথা কারো বোধগম্য নয় যে এই তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান সার্ভিসের ১৯৬৯ সালের অফিসারগণ কোন নীতির ভিত্তিতে সিনিয়র সার্ভিস পুলে অনুপ্রবেশ করলেন। এনরূপ ন্যায়নীতি বহির্ভূতভাবে এবং চাকুরী ক্ষেত্রে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এই সার্ভিসের ৪০০ জন অফিসারকে সুপরিকল্পিত চক্রান্তের মাধ্যমে এই সার্ভিস পুলে অন্তর্ভুক্ত করান হয়েছে যে কারণে "সিনিয়র সার্ভিস পুল" এখন "ইুনিয়র সার্ভিস পুলে" পরিণত হতে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সচিবালয় যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সচিবালয় এবং এই সচিবালয়ের কর্মকর্তা নির্বাচনে যে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তা নির্বাচনের মানদণ্ড প্রযোজ্য হওয়া উচিত একথা অনুধাবন করলে সিনিয়র সার্ভিস পুলের এই অবমূল্যায়ন এবং ভারসাম্যহীনতা ঘটত না। আমরা মনে করি উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে এই পুলের সঠিক মূল্যায়ন ও একে ন্যায়সংগত ভিত্তিতে সুসংহত করে এই পুলে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টির পুনর্বিবেচনা করলে বর্তমানের ভারসাম্যহীনতা অনেকাংশে দূর হবে। সেই সংগে একক্যালীন প্রবেশ বা ওয়ানটাইম এন্ট্রির সময় সীমাবদ্ধিক করে অন্যান্য সার্ভিস থেকে উপযুক্ত প্রবীন সদস্যদেরকে এই পুলে নিয়োগ করলে এই পুলের যেমন মান উন্নীত হবে তেমনি সচিবালয়ের কর্ম দক্ষতাও বৃদ্ধি পেয়ে যে কোন দেশের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের তুলনীয় পর্যায়ে পৌঁছবে।

৭। ইতিমধ্যে এই অরাজকতা ও ভারসাম্যহীনতাকে প্রকট করে তোলার উদ্দেশ্যে সিনিয়র সার্ভিস পুলে অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের গ্রেডেশন তালিকা নতুন করে প্রণয়ন করার খবর শোনা যাচ্ছে অথচ অন্যান্য সার্ভিসের সংগে জ্যেষ্ঠত্ব নির্ধারণের নীতিমালাই যেখানে নেই সেখানে এই ধরনের নিত্য নতুন তালিকা প্রস্তুত দুর্ভাগ্যজনক। তাছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্বিন্যস্ত চাকুরী কাঠামোতে স্কেল অনুযায়ী পদ বিন্যাসকরণকে উপেক্ষা করে ৯৩ জন এসডিও এবং অতিরিক্ত এসডিওকে কোন পদে পদোন্নতি করা হল তা প্রদর্শন না করেই উচ্চতর বেতনের স্কেলে উন্নীত করা হয়েছে এবং আদেশের তারিখ থেকেই উচ্চতর স্কেলে তাদেরকে সিনিয়রিটি দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের আদেশ-প্রত্যাদেশ অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক যা সমস্ত প্রশাসনিক পরিবেশকে বিষাক্ত করছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, এই সাব-ক্যাডারের সদস্যগণ এখনও টাঃ ১৪০০-২২২৫ স্কেলে নির্ধারিত পদসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি পদ দখল করে আছেন তা ছাড়া এই সাব-ক্যাডারে টাঃ ১১৫০-১৮০০ স্কেলে ৩৭৯টি ও টাঃ ৯০০-১৬১০ স্কেলে ৬৪টি পদ অনুরূপভাবে সৃষ্টি এবং দখল হওয়ায় অন্য সাব-ক্যাডারগুলির সংগে এই সাব-ক্যাডারের সমতা সম্পূর্ণরূপে বিঘ্নিত হয়েছে।

৮। পুনর্বিন্যস্ত চাকুরী কাঠামোতে ২৮টি সাব-ক্যাডার থাকলেও অনেক সাব-ক্যাডারের সঠিক সদস্য সংখ্যা এখনও নির্ভুলভাবে নিরূপন করা হয় নি। তা ছাড়া অনেক সাব-ক্যাডারের সমশ্রেণীর সমপর্যায়ের অনেক অফিসারকে ক্যাডারভুক্ত করা হয় নি। অতএব আমরা প্রস্তাব করি যে, ঐ ধরনের সাব-ক্যাডারগুলি শ্রেণী অনুযায়ী পূর্ণরূপ দেওয়া হোক।

উপরোক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে একথা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে যেহেতু একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অতএব এর প্রশাসনের বহুমুখী কর্মকাণ্ডকেও একটি উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনার উপযোগী করেই গড়ে তুলতে হবে এবং তা করতে হলে অবিলম্বে সব ভুল-ত্রুটি, অনিয়ম ও অব্যবস্থানিরসনের জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণকরা প্রয়োজন। আমরা মনে করি সরকার কর্তৃক ঘোষিত চাকুরী কাঠামোও বেতনের পুনর্বিন্যাসের যৌক্তিকনীতির সঠিক ও পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হলে নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ অনতিবিলম্বে গ্রহণ করা অপরিহার্য।

ন্যূনতম ন্যায়সংগত প্রস্তাবসমূহ

ক। প্রশাসনিক: প্রশাসনিক সাব-ক্যাডারের নাম পরিবর্তন করে 'জেলা প্রশাসক' ও 'মহকুমা প্রশাসক' পদবী প্রত্যাহার করে এই সাব-ক্যাডারকে তার সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব সম্বলিত বিভাগ এবং নিয়ন্ত্রক মন্ত্রণালয়ের সংগে সংযুক্ত করা প্রত্যেক সাব-ক্যাডার সার্ভিসের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণের ও যৌক্তিকীকরণের স্বার্থে অবিলম্বে প্রয়োজন। আমরা প্রস্তাব করি যে, এই সাব-ক্যাডারের নাম বিসিএস (ভূমি সংস্কার ও ম্যাজিস্ট্রেসী) রাখা হোক এবং স্বাধীন দেশের জন্মলগ্নের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এই সার্ভিসের মহকুমা, জেলা এবং বিভাগীয় অফিসারদের পদবী যথাক্রমে মহকুমা অফিসার (ভূমি সংস্কার ও ম্যাজিস্ট্রেসী) ডেপুটি কমিশনার (ভূমি সংস্কার ও ম্যাজিস্ট্রেসী) এবং কমিশনার (ভূমি সংস্কার ও ম্যাজিস্ট্রেসী) করা হোক।

খ। বর্তমানের প্রশাসনিক: প্রশাসনিক সাব-ক্যাডারের নতুন নামকরণের সংগে সংগে এই সার্ভিসের সদস্য সংখ্যা বাস্তব প্রয়োজনের নিরিখে যুক্তিযুক্তভাবে নতুন করে নির্ণয় করে এই সাব-ক্যাডারের কলেবরকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা নতুন চাকুরী কাঠামোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক করার স্বার্থে একান্তভাবে প্রয়োজন। এই সংগে সচিবালয়ে যে ১০০টি সেকশন অফিসারের পদ এই সাব-ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেই পদগুলিকে অবিলম্বে এই সাব-ক্যাডার থেকে অপসারণ করা হোক। অন্য যে সমস্ত ক্যাডার সার্ভিসের সদস্য সংখ্যাসঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয় নি এবং যে সকল সাব-ক্যাডারকে এখনও পূর্ণরূপ দেওয়া হয় নি সেই সকল ক্যাডারকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন কওে ক্যাডারের পূর্ণ মর্যাদায় উন্নীত করা হোক। ঠিক একইভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকৌশলী, চিকীৎসক ও কৃষিবিদদেরকে তাঁদের সমপর্যায়ের ক্যাডারভুক্ত সদস্যদের মত ক্যাডার সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন। এই সংগে প্রকৌশলী, চিকীৎসক ও কৃষিবিদদের সাব-ক্যাডারসমূহের বিষয়ে সরকারের পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হোক।

গ। সরকারের ঘোষিত নীতি অনুসারে বর্তমান বেতনই পদমর্যাদার একমাত্র মানদণ্ড। উপরোল্লিখিত সরকারের ঘোষিত ও গৃহীত নীতির প্রকৃত ও যথার্থ বাস্তবায়ন করার জন্য স্কেল অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাডার ও সাব-ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদবী সম্বলিত একটি নির্ভরযোগ্য "ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স" প্রণয়ন করা হোক। এই সংগে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে যে সব বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য রয়েছে তা অনতিবিলম্বে দূর করা হোক।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন বিভাগ ও রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের পদগুলিতে সর্বস্তরে অন্যান্য সকল সাব-ক্যাডারের সদস্যদের নিয়োগের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। আমরা প্রস্তাব করি যে, এই সকল বিভাগের ন্যূনতম শতকরা ৯৫ ভাগ পদ অন্যান্য সাব-ক্যাডারের সদস্যদের দ্বারা পূরণ করা হোক।

ঙ। প্রতিটি ক্যাডার ও সাব-ক্যাডারে লাইন অনুযায়ী পুল বহির্ভূত সর্বোচ্চ পদসমূহকে সর্বোচ্চ বেতন স্কেল প্রদান করা হোক। যে সকল ক্যাডার বা সাব-ক্যাডারে এই ধরণের পুল বর্হিভূত পদ নেই সেখানে এনরূপ পদের সংস্থান করা হোক।

চ। পুনর্বিন্যস্ত চাকুরী ও বেতন কাঠামো বাস্তবায়নে ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রত্যেক সাব-ক্যাডার থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি চাকুরী কাঠামো বাস্তবায়ন উপদেষ্টা কমিটি গঠন করাই সুবিবেচিত ও ন্যায়নীতিভিত্তিক পদক্ষেপ হবে। আমরা প্রস্তাব করি যে, এই কমিটির সংগে আলোচনার মাধ্যমে এই সংযুক্ত স্মারকলিপি ও প্রত্যেক সাব-ক্যাডার/ক্যাডার কর্তৃক পৃথকভাবে পেশকৃত অন্য সকল স্মারকলিপির বিচার, বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে আমাদের প্রস্তাবসমূহ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা হোক। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আমরা প্রস্তাব করি যে, এই বিচার, বিশ্লেষণ ও বিবেচনার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটিকে সহায়তা করবার জন্য কোন পর্যায়েই কোন প্রকার পরীক্ষ-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের একক দায়িত্ব যেন এককভাবে সংস্থাপন বা মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে কর্মরত প্রশাসনিক : প্রশাসনিক সাব-ক্যাডারের সদস্যদের উপর অর্পিত না হয়, কারণ তাতে অতীতের ন্যায় প্রকৃত তথ্য কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরা হবে না এবং সেই কারণে সুবিবেচনা, সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হবে।

ছ। প্রশাসনিক: প্রশাসনিক সাব-ক্যাডারের জেলা পর্যায়ে অযৌক্তিকভাবে সৃষ্ট অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (উন্নয়ন), এডিসি (প্রকল্প), এডিসি (লিটারেসী) এবং অনুরূপ অধঃস্তন পদসমূহ অবিলম্বে বিলোপ করা হোক এবং এ সব পদের কার্যসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সংস্থার ওপর ন্যস্ত করা হোক।

জ। ক্যাডার সার্ভিসের বেতন স্কেলই যেখানে পদমর্যাদার একমাত্র নির্ণায়ক সেখানে এই বিঘোষিত নীতিকে উপেক্ষা করে অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন স্কেলের বা সমমানের কর্মকর্তাদেরকে সমপর্যায়ের বা উচ্চতর স্কেলের ক্যাডার সার্ভিস সদস্যদের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হচ্ছে। এই সমস্ত অসামঞ্জস্য অবিলম্বে দূর করতে হবে এবং বর্তমানে সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে এই নীতির বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঝ। বিভিন্ন সাব-ক্যাডারের মধ্যে পরস্পর বিদ্যমান অন্তর্বর্তীকালীন স্কেলের ব্যবধান অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন। যদি সরকার কোন ক্ষেত্রে কোন পদ বা পদসমূহের যে কোন একটি স্কেলকে উন্নীত করেন তা হলে সকল সাব-ক্যাডারের সকল সমমানের ও সম্পর্কযুক্ত পদসমূহের স্কেলকে অনুরূপভাবে উন্নীত করতে হবে।

ঞ। সিনিয়র সার্ভিস পুলে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ একটি সাব-ক্যাডারের সংগে অন্যান্য সাব-ক্যাডারের সদস্যদের সংখ্যায় ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে তা অবিলম্বে দূর করতে হবে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য এককালীন প্রবেশের (ওয়ান টাইম এন্ট্রি) সময়সীমা এমনভাবে বর্দ্ধিত করা হোক যেন সেই সময়সীমার মধ্যে অন্যান্য সাব-ক্যাডারের সদস্যগণ পুলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই ভারসাম্যহীনতা দূর করতে পারেন।

ট। সম্প্রতি নিয়ম বর্হিভূতভাবে ইস্যুকৃত ৯৩ জন এসডিও এবং অতিরিক্ত এসডিওর পদোন্নতির আদেশ এবং সেই সংগে প্রশাসনিক ঃ প্রশাসনিক সাব-ক্যাডারের সদস্যদেরকে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অতীতে ইস্যুকৃত অন্যান্য সকল অনিয়মিত এবং নিয়ম বহির্ভূত আদেশ-প্রত্যাদেশ এবং ব্যবস্থাদি বাতিল করা হোক।

ঠ। সিনিয়র সার্ভিস পুলে বিভিন্ন সাব-ক্যাডারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির পূর্ব শর্ত হিসেবে বিভিন্ন সাব-ক্যাডারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক জ্যেষ্ঠত্বের নীতিমালা বা ইন্টার সিনিয়রিটি রুলস তৈরি করা হোক এবং এই নীতিমালা পুলে অন্তর্ভুক্ত সকল সাব-ক্যাডারের সকল সদস্যের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং পুলে অন্তর্ভুক্তির বৈধতার প্রশ্নেও প্রযোজ্য ও কার্যকর করা হোক। আমরা প্রস্তাব করি যে, নীতিমালা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত যে সকল প্রাক্তন ইপিসিএস অফিসারদের চাকুরীকাল ১৮ বছরের অনুর্দ্ধ তাঁদের সিনিয়র সার্ভিস পুলে নিয়োগের আদেশ স্থগিত রাখা হোক।

Dhaka University Institutional Repository

ড। দেশে ও বিদেশে ক্যাডার বহির্ভূত পদসমূহে ডেপুটেশন প্রদানের সময় সকল সাব-ক্যাডারের সদস্যদের ন্যায়সংগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। কৃত্রিম ও অবাস্তব সংখ্যা প্রদর্শন করে প্রশাসনিক ঃ প্রশাসনিক সাব-ক্যাডার কিভাবে তাঁদের ডেপুটেশন রিজার্ভ সংখ্যাকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে স্ফীত করেছে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সর্ব সমক্ষে উন্মোচিত হয়েছে। অতএব অসমীচীন পন্থায় একতরফাভাবে ডেপুটেশনে প্রেরিত প্রশাসনিক : প্রশাসনিক সাব-ক্যাডারের তথাকথিত ডেপুটেশন রিজার্ভ সদস্যদেরকে অবিলম্বে তাঁদের নিজস্ব সাব-ক্যাডারের তথাকথিত ডেপুটেশন রিজার্ভ সদস্যদেরকে অবিলম্বে তাদের নিজস্ব সাব-ক্যাডারে ফিরিয়ে আনা হোক এবং এই সকল পদের ন্যায়সংগত অংশীদার অন্যান্য সাব-ক্যাডারের সদস্যদেরকে নিয়োগ করা হোক।

পরিশেষে আমাদের সবিনয় নিবেদন সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে স্বাধীন দেশের অনাগত ভবিষ্যতের নাগরিকদের সার্বিক কল্যাণের ব্রত নিয়ে রচিত বর্তমান পুনর্বিন্যস্ত চাকুরী কাঠামোর নীতিকে সমুন্নত রেখে এ দেশের প্রশাসনিক ধ্যান-ধারণাকে সৎ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে স্থাপিত করা হোক। আমরা বিশ্বাস করি বর্তমানের বিবর্তনের ধারায় গণতান্ত্রিক চেতনাবোধই একমাত্র গ্রহণযোগ্য নীতির ভিত্তি সে নীতির প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক প্রশাসন এর বিকাশ ত্বরান্বিত করবে। আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করছি যে কোন বিশেষ গোষ্ঠি সরকারী পদসমূহকে তাদের 'সম্পত্তি বিশেষ' মনে করে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির সংকীর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যয়বহুল বেপরোয়া অপপ্রচারের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক বিবেককে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করতে উদ্যত হয়েছেন। এরূপ প্রগতি বিরুদ্ধ প্রতিকূল অনুভূতি এবং সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতাকে ভেংগে গুঁড়িয়ে দেওয়া ছাড়া সমষ্টি কথা জন-কল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের আর কোন বিকল্প নেই।

শতাব্দীর সঞ্চিত কুসংস্কার আর অভ্যাসের ফাঁদে যাদের উপলব্ধির মৃত্যু ঘটেছে তাঁরা এই সহজ-সরল সত্য আত্মস্থ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন যে বাংলাদেশ এখন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং এদেশের প্রশাসনিক কার্য-পরিচালনায় নিয়োজিত "বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস" আটাশটি শ্রেণী বা সাব-ক্যাডারের একটি সমষ্টি। তাঁরা এই সত্যও মেনে নিতে ব্যর্থ হচ্ছেন যে এদেশের প্রশাসনের পাদপীঠ বাংলাদেশ সচিবালয় "বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের" ২৮টি সাব-ক্যাডারেরই কেন্দ্রীয় কার্যালয় অতএব এই সচিবালয়ের পদসমূহে আটাশের একাংশের কোন অগ্রাধিকার বা মালিকানা স্বত্ব থাকতে পারে না। স্বাধীনতা উত্তরকালে অর্থাৎ এর জন্মলগ্ন থেকেই এই সচিবালয়কে একটি নিম্নমানের সচিবালয় রূপে চিরস্থায়ী করার চক্রান্ত চলে যার ফলে এখানে নিয়োগ ও পদোন্নতি একটি প্রহসনে পর্যবসিত হয়। এই অনাচার, অবিচার, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটে যুগোপযোগী ও পুনর্বিন্যস্ত চাকুরী কাঠামোর সঠিক বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিতে। কিন্তু বাস্তবায়নের শুরুতেই ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা পুষ্ট একটি বিশেষ গোষ্ঠির চক্রান্তের ফলে সিনিয়র সার্ভিস পুলে যে ভারসাম্যহীনতা ঘটেছে এবং যে সব বাস্তব ও পদ্ধতিগত ভুলভ্রান্তি ঘটেছে তার অপনোদনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। অতএব দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পুনর্বিন্যস্ত চাকুরী কাঠামোকে সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ আপনার সদয় বিবেচনা ও আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সশ্রদ্ধ আনুগত্য ও বিনয়ের সংগে উপস্থাপিত হল।

আপনার একান্ত অনুগত

সমন্বিত কমিটির পক্ষে

(ম,ফ,আ, ছিদ্দিকী)

আহবায়ক

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট 'গ'

মতিন কমিটির সুপারিশমালা*

ক) সিনিয়র সার্ভিস পুলের কাঠামো পর্যালোচনা

১. বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে পদোন্নতির অগ্রতুল প্রত্যাশার সমাধান করার জন্য এবং বিভিন্ন ক্যাডারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পুলকে অবলুপ্ত করা প্রয়োজন বলে উপ-কমিটি মনে করে। সুতরাং বর্তমান পুলকে অবলুপ্ত করে পুলের সকল রিজার্ভসহ যুগ্ম-সচিবের (১৫৯টি পদ) এবং উপ-সচিবের (৩৭৭টি পদ) পদ সকল ক্যাডারের মধ্যে কোটা অনুযায়ী বিভাজন করা যেতে পারে। প্রতিটি ক্যাডারের জনশক্তি, কাজের প্রকৃতি, উচ্চতর বেতন স্কেলে পদোন্নতির এবং নিজস্ব ক্যাডারে উচ্চতর স্কেলে পদ সৃষ্টির সুযোগ বিবেচনা করে আলোচ্য কোটা নির্ধারণ করা যেতে পারে। সচিবালয়ের পদে বিভিন্ন ক্যাডারের কোটা নির্ধারণের মাধ্যমে সচিবালয়কে আরও প্রতিনিধিত্বশীল করা সম্ভব হবে। বর্তমান পুল আদেশের বিধান অনুযায়ী সচিবালয়ের উপ-সচিব থেকে সচিব পর্যন্ত ডিউটি পদের ১০% এর বিপরীতে চুক্তিতে/প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির যে এখতিয়ার আছে তা পূর্ণ অবলুপ্তির পরও বহাল রাখা যেতে পারে। সুতরাং যুগ্মসচিব ও উপসচিবে ডিউটি পদের ১০% (যথাক্রমে ৯টি এবং ২০টি পদ) কোন ক্যাডারের জন্য কোটা হিসেবে বরাদ্দ না করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরাসরি নিয়োগের জন্য সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে। সচিব ও অতিরিক্ত সচিবের পদ কোটা হিসেবে কোন ক্যাডারের জন্য বরাদ্দ করা হবে না।

২. সকল রিজার্ভসহ সচিবালয়ের যুগ্মসচিব ও উপসচিব পদের যথাক্রমে ৬০% (৯৫টি পদ) এবং ৬৫% (২০৫টি পদ) বিসিএস (প্র% ক্যাডারের জন্য কোটা হিসেবে বরাদ্দ করা যেতে পারে। সচিবালয়ের সকল রিজার্ভসহ সকল যুগ্মসচিব ও উপসচিবের যথাক্রমে ১০% (১৬টি) এবং ১৫% (৫৭টি) পদ বিসিএস (সচিঃ) ক্যাডারের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং সচিবালয় ক্যাডারে বর্তমানে যে ২৬টি নন পুল উপসচিবের পদ রয়েছে তা উক্ত ক্যাডারের জন্য বহাল রাখা যেতে পারে। বিসিএস (প্রঃ) ও বিসিএস (সচিঃ) ক্যাডারের জন্য যুগ্ম সচিব ও উপসচিবের উপরোক্ত কোটা বরাদ্দ করা হলে যুগ্মসচিব ও উপসচিব যথাক্রমে ৪৮টি এবং ৭৫টি পদ অবশিষ্ট থাকবে (মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগের জন্য ডিউটি পদেও ১০% ব্যতীত) যা বাকী ২৬টি ক্যাডারের মধ্যে (সংলগ্নী-৬ অনুযায়ী) কোটা হিসেবে বরাদ্দ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য বিসিএস (পররাষ্ট্র) ও বিসিএস (বিচার) ক্যাডারের জন্য ভিন্নভাবে সচিবালয়ের পদের কোটা বরাদ্দের প্রয়োজন নেই। কারণ উক্ত ক্যাডারদ্বয়ের জন্য বর্তমানে সচিবালয়ের পদ সংরক্ষিত আছে।

৩. পুল অবলুপ্তির পর যুগ্মসচিব ও উপসচিবের রিজার্ভসহ সকল পদ প্রস্তাবিত কোটা অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাডারের পদ হিসেবে প্রদর্শিত হবে।

খ) বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিস পদোন্নতির অগ্রতুল প্রত্যাশার সমাধান

১. বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে পদোন্নতির অগ্রতুল প্রত্যাশার সমাধান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির প্রতিবেদন বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনান্তে মন্ত্রীপরিষদ - কমিটি এ মর্মে সুপারিশ করে যে, পুল ব্যতীত ৩৩টি ক্যাডারের মধ্যে যে ১৮টি ক্যাডারে বর্তমানে সিনিয়র স্কেলের উর্ধ্বে (এমএনএস- ৩, ৪ ও ৫) পদের সংখ্যা ক্যাডারের মোট জনশক্তি ১২% এর কম, সে ১৮টি ক্যাডারে (সংলগ্নী-৭) সিনিয়র স্কেলের উর্ধ্বে পদের সংখ্যা ক্যাডারে জনশক্তির ন্যূনতম ১২% করার জন্য রিজার্ভসহ যুগ্ম সচিব ও উপসচিবের পদের কোটা হিসেবে উক্ত ক্যাডারকে বরাদ্দ করার পর এমএনএস - ৩, ৪ ও ৫-এ অতিরিক্ত যে পদের প্রয়োজন হয় তা সংশ্লিষ্ট ক্যাডারসমূহে বর্তমানে যে যে পদেও বেতন স্কেল উন্নীত করা সম্ভব, সে সকল পদের বেতন স্কেলের উন্নীত করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে নতুন পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিভিন্ন ক্যাডারে এমএনএস- ১ ও ২ এ বর্তমানে যে পদ আছে তা বহাল রাখা যেতে পারে। সিনিয়র স্কেলের উর্ধ্বে এমএনএস- ৩, ৪ ও ৫-এ প্রস্তাবিত ১২টি পদের মধ্যে ৩% থাকবে এমএনএস-৩ এ এবং অবশিষ্ট ৯% থাকবে এমএনএস- ৪ ও ৫-এ। তবে

---

* এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন এরশাদ সরকারের উপপ্রধানমন্ত্রী ডাঃ এম, এ, মতিন এবং অন্যান্য সদস্য ছিলেন মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল মুনএম কৃষি মন্ত্রী এবং ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম পররাষ্ট্র মন্ত্রী, তাঁরা ১৯৮৯ সালে জুন মাসে এ প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ক্যাডারের প্রবৃত্তি বিবেচনা কওে এমএনএস- ৩, ৪ ও ৫ এর মধ্যে ১২% পদের প্রস্তাবিত বিভাজন পরিবর্তন করা যেতে পারে।

২. প্রতিটি ক্যাডারে সকল পর্যায়ে উচ্চতর পদে পদোন্নতির যুক্তিসংগত সুযোগ রাখার উদ্দেশ্যে ক্যাডারের প্রবৃত্তি, গঠন কাঠামো ও কাজ বিবেচনা করে সিনিয়র স্কেল ও ইহার নিম্নের বেতন স্কেলেও পদ সংখ্যার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে।

৩. যে ১২টি ক্যাডারে বর্তমানে সিনিয়র স্কেলের উর্ধ্ব ক্যাডারের জনশক্তির ১২% এর বেশি পদ বিদ্যমান আছে, সে সকল ক্যাডারে বর্তমানে পদোন্নতির সুযোগ অক্ষুণ্ন রাখা যেতে পারে। সচিবালয়কে প্রতিনিধিত্বশীল করার উদ্দেশ্যে এই সকল ক্যাডারের জন্য সচিবালয়ের যুগ্মসচিব ও উপসচিব পদেও যুক্তিসংগত কোটা বরাদ্দ করা হবে।

৪. যে ১৮টি ক্যাডারে বর্তমানে সিনিয়র স্কেলের উর্ধ্বে পদ সংখ্যা ক্যাডারের জনশক্তির ১২% এর কম, তাদের মধ্যে বিসিএস (বন), বিসিএস (পরিসংখ্যান) এবং বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডারে বর্তমান পুল পদসমূহ কোটার ভিত্তিতে বিভাজন করার পর অতিরিক্ত কোন পদ সৃষ্টির প্রয়োজন হবে না। বিসিএস (সচিঃ) ক্যাডারে সচিবালয়ের বাহিরে কোন বাহিরে কোন লাইন পদ নাই। সুতরাং সচিবালয় ক্যাডারের জন্য পুলপদের কোটা সংরক্ষণ করার পর অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির প্রয়োজন হবে না। পুল পদের কোটা প্রদানেব পর অবশিষ্ট ১৪টি ক্যাডারে মোট ১১০৯ টি পদ পদ সৃষ্টি করতে হবে যার জন্য ১০৪৫টি হবে বেতন স্কেল উন্নীত করার মাধ্যমে এবং ৬৪টি পদ হবে সিনিয়র স্কেলের উর্ধ্বে নতুন পদ। তবে নতুন ৬৪টি পদ সৃষ্টির কারণে ক্যাডারের জন শক্তি বৃদ্ধি পাবে না। কারণ নিম্নতর বেতন স্কেলের পদসংখ্যা সমানুপাতিক হারে হ্রাস করে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হবে। অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির জন্য বার্ষিক অতিরিক্ত ব্যয় হবে প্রায় ৪.৫০ কোটি টাকা।

৫. সকল ক্যাডার সার্ভিসে পদোন্নতির প্রত্যাশার ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ক্যাডারের জনশক্তির ন্যূনতম ১২% পদ সিনিয়র স্কেলের উর্ধ্বে যাতে সর্বদা বিদ্যমান থাকে সে উদ্দেশ্যে প্রতিটি ক্যাডারে নতুন পদ সৃষ্টির সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। প্রতিটি ক্যাডারে কোন বেতন স্কেলে কতটি পদ থাকা প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করার সময় ক্যাডারের স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য, কাজের প্রকৃতি ইত্যাদিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

৬. যেহেতু কিছু কিছু ক্যাডারের জনশক্তির পরিবর্তন বর্তমানে প্রস্তাবাকারে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় অথবা নিয়ন্ত্রণশারী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে, সেহেতু সে সকল ক্যাডারের প্রস্তাবিত জনশক্তির ভিত্তিতে সিনিয়র স্কেলের উর্ধ্বে ন্যূনতমি ১২% পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়েছে। এ সকল ক্যাডারের ক্ষেত্রে ক্যাডারের জনশক্তি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন হওয়ার পর সিনিয়র স্কেলের উর্ধ্বে জনশক্তির ন্যূনতম ১২% পদ বহাল রাখার নীতি অনুসরণ করে উক্ত স্কেলসমূহে প্রয়োজনীয় পদবিন্যাস করতে হবে। যে সকল ক্যাডারের জনশক্তি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর, প্রয়োজনবোধে সংশোধন সাপেক্ষে বর্তমানে প্রস্তাবিত পদবিন্যাস বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৭. বর্তমানে মাত্র কতিপয় ক্যাডারের জন্য প্রেষণ, প্রশিক্ষণ ও ছুটিজনিত রিজার্ভ পদ অনুমোদিত রয়েছে। ঐ সকল ক্যাডারের রিজার্ভ পদসহ ক্যাডারের জনসংখ্যা গুনা করে সিনিয়র স্কেলের উর্ধ্বে ন্যূনতম ১২% পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। অন্যান্য ক্যাডারের জন্য প্রেষণ, প্রশিক্ষণ ও ছুটিজনিত রিজার্ভ পদ অনুমোদিত হলে রিজার্ভ পদসহ ক্যাডারের জনশক্তি গুনা উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে সিনিয়র স্কেলের উর্ধ্বে পদ সৃষ্টি ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

গ) সচিবালয়ের পদে এবং বিভিন্ন ক্যাডারের সিনিয়র স্কেলের উর্ধ্বে পদে পদোন্নতি/নিয়োগের নীতিমালা

১. সচিব পদে কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বিষয় বিবেচনা করার জন্য সচিবালয়ের এবং সচিবালয়ের বাইরে/ক্যাডাওে এমএনএস-২ এর পদে চাকুরির দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নিরূপণ সাপেক্ষে কর্মকর্তাদের চাকুরি রেকর্ড ও সার্বিকভাবে উপযুক্ততা মূল্যায়ন করে উর্ধ্বতন নিয়োগ, পদোন্নতি ও চাকুরি কাঠামো সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করবে।

২. অতিরিক্ত সচিব পদে কর্মকর্তাদের পদোন্নতি বিবেচনা করার জন্য সচিবালয়ের এবং সচিবালয়ের বাইরের বিভিন্ন ক্যাডারের এমএনএস-৩ পদে চাকুরির দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে উর্ধ্বতন নিয়োগ, পদোন্নতি ও চাকুরি কাঠামো বিষয়ক মন্ত্রিপরিষদ কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করবে। এ

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে প্রতিটি পদের জন্য এমএনএস-৩ এর চাকুরির জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী ৫ জন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য কর্মকর্তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা সুপরিয়র সিলেকশন বোর্ড কর্তৃক সার্ভিস রেকর্ড মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৩. সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পদে কর্মকর্তাদেও পদোন্নতি বিবেচনা করার পূর্বে সচিবালয়ের বাইরে বিভিন্ন ক্যাডারে যথাক্রমে এমএনএস-১ ও২ এর পদে কর্মরত কোন কর্মকর্তাকে বদলির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব কিনা তা সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪. কোটার বিপরীতে সচিবালয়ের যুগ্মসচিব ও উপসচিব পদে বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ করা যেতে পারে।

৫. সচিবালয়ের বাইরে কোন ক্যাডারে এমএনএস-১ এর পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের যোগ্য কর্মকর্তাদের সার্ভিস রেকর্ড ও সাবিকভাবে উপযুক্ততা বিবেচনা করে উর্ধ্বতন নিয়োগ, পদোন্নতি ও চাকুরি কাঠামো বিষয়ক মন্ত্রীপরিষদ কমিটি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করবে।

৬. সচিবালয়েব বাইরে বিভিন্ন ক্যাডারের এমএনএস-২ এবং এমএনএস-৩ এর পদে এবং সচিবালয়ের যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতির জন্য কর্মকর্তাদের চাকুরি রেকর্ড মূল্যায়ন করে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড যোগ্য কর্মকর্তাদেব একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উর্ধ্বতন নিয়োগ, পদোন্নতি ও চাকুরি কাঠামো সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ কমিটিতে পেশ করবে। উর্ধ্বতন নিয়োগ, পদোন্নতি ও চাকুরি কাঠামো সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ কমিটি কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ পূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করবে।

৭. সচিবালয়ের এবং সচিবালয়ের বাইরে সকল ক্যাডারের এমএনএস ৪ ও ৫ এর পদে কর্মকর্তাদের পদোন্নতির প্রস্তাব সার্ভিস রেকর্ডের ভিত্তিতে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড কর্তৃক বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা যেতে পারে।

ঘ) পুল অবলুপ্তির পর যে প্রাসংগিক সমস্যার সৃষ্টি হবে তার সমাধান

১. সিনিয়র সার্ভিসের পুল দীর্ঘ ১০ বছর পর অবলুপ্ত করা হলে যে সমস্যার সৃষ্টি হবে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো বিভিন্ন ক্যাডারের যে সকল কর্মকর্তা বর্তমানে পুল পদে কর্মরত আছেন তাঁদের অবস্থান নিয়ে। বর্তমানে প্রস্তাবিত কোটার অতিরিক্ত যে সকল ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ পুলের যুগ্মসচিব ও উপসচিব পদে কর্মরত আছেন তাঁদের বর্তমান পদে বহাল রাখা যেতে পারে। যুক্তিসংগত কারণে কোটার অতিরিক্ত হিসেবে পুল পদে কর্মকর্তা কোন কর্মকর্তাকে নিজস্ব ক্যাডারে প্রত্যাবর্তন করানো সম্ভব হলে তা বিবেচনা করা যেতে পারে। পুল অবলুপ্তির পর পুলে কর্মরত কর্মকর্তাগণ তাঁদের নিজস্ব ক্যাডারের জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী সেই ক্যাডারের কর্মকর্তাদেও তালিকাভুক্ত হবেন এবং তাঁরা সচিবালয়ের পদে নিযুক্ত থাকলেও তাঁদেও নিজস্ব ক্যাডারের তালিকাভুক্ত হবেন এবং তাঁরা সচিবালয়ের পদে নিযুক্ত থাকলেও তাঁদেও নিজস্ব ক্যাডারের পদেও পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হতে পারবেন। সচিবালয়ের পদে প্রস্তাবিত কোটার অতিরিক্ত হিসেবে যে সকল ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ নিয়োজিত থাকবেন সচিবালয়ের উচ্চতর পদে কোটার কারণে তাঁদের পদোন্নতির সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম থাকলে এবং তাঁদের নিজস্ব ক্যাডারে তাঁদের কনিষ্ঠ কর্মকর্তাগণ ইতোমধ্যে উচ্চতর পদে পদোন্নতি পেয়ে থাকলে কনিষ্ঠের পদোন্নতির তারিখ থেকে জ্যেষ্ঠতাপেক্ষভাবে পদোন্নতি দিয়ে তাঁদের নিজস্ব ক্যাডারে প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে উচ্চতর পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত তাঁদের কনিষ্ঠ কর্মকর্তাগণকে পদের অভাবে পদাবনত না করে প্রয়োজন বোধে তাঁদের জন্য সুপারনিউমেরারী পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

২. যে ১৮টি ক্যাডারে বর্তমান সিনিয়র স্কেলের উর্ধ্বে পদেও সংখ্যা ক্যাডারের জনশক্তির ১২% এর কম এবং বাকী যে ১২ ক্যাডারে উক্ত পদের সংখ্যা ১২% এর বেশি, সেই সকল ক্যাডারের জন্য বর্তমান পুল যুগ্মসচিব ও উপসচিবের যে কোটা প্রস্তাব করা হয়েছে, সে অনুযায়ী সচিবালয়ের পদে এখনই কর্মকর্তা নিয়োগ করা সম্ভব হবে না। কারণ কতিপয় ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ প্রস্তাবিত কোটার অতিরিক্ত পদে বর্তমানে সবিচালয়ে কর্মরত আছেন। যেহেতু পুল পদেও কোটসহ ১৮টি ক্যাডারের উচ্চতর পদে পদোন্নতির প্র্যাশা ন্যূনতম ১২% এ উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে, সেহেতু উক্ত কোটা অনুযায়ী সচিবালয়ের পদে নিয়োগরে সুগো না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের পদের কোট ছাড়াও নিজস্ব ক্যাডারে যেত স্কেল উন্নীত করার মাধ্যমে উচ্চতর স্কেলে অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে, তাঁদরে ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি হলে পদোন্নতির

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ অবিলম্বে যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে ৩০ টি ক্যাডারে সিনিয়র স্কেলের উর্ধ্বে পদোন্নতির সুযোগ কি আছে, কোটা নির্বিশেষে বিভিন্ন ক্যাডারের যে সকল কর্মকর্তা পুলে যুগ্ম সচিব ও উপসচিব পদে কর্মরত আছেন তাঁদের নিজস্ব দে বঞ্চাল রেখে ক্যাডারে (যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন) অতিরিক্ত পদ অনুয়ায়ী বিভিন্ন ক্যাডারে কর্মকর্তা যখন সচিবালয়ের যুগ্মসচিব ও উপসচিব পদে নিয়োগের সুযোগ লাভ করবেন, তখন চূড়ান্তভাবে পদোন্নতির প্রত্যাশা কি হবে সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন সংলগ্নী-১২ এ প্রদর্শন করা হল।

৩. সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব ও উপসচিব পদে প্রাপ্য কোটা অনুযায়ী সকল ক্যাডারের কর্মকর্তা পদের অভাবে এখনই উক্ত পদে নিয়োগের সুযোগ পাবেন না, সেই সকল ক্যাডারের মধ্যে, নিজস্ব ক্যাডারে পদ সৃষ্টির পরও যাদেও পদোন্নতির সুযোগ সর্বাপেক্ষা কম থাকবে তাঁরা সচিবলয়ের পদ শূন্য হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উক্ত নিয়োগের সুযোগ পাবে। এই নীতির ভিত্তিতে সচিবালয়ের যুগ্মসচিব পদে উপসচিব পদে কোটার বিপরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্যাডারের অগ্রাধিকারের ক্রম অনুযায়ী সংলগ্নী-১২ এ পদর্শিত তালিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

উৎসঃ এম, শামসুর রহমান, *আধুনিক লোকপ্রশাসন,*
ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩,
পৃঃ ৭১৮-৭২৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট 'ঘ'

বিসিএস সমন্বয় কমিটির সুপারিশমালা*

১. সচিবালয়ের সংক্রান্ত তথাকথিত মতিন কমিটির সকল প্রস্তাব বাতিল করতে হবে এবং এই প্রস্তাব অনুসারে বা অন্য কোন পন্থায় কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকলে তাও বাতিল ঘোষিত হবে।

২. তথাকথিত মতিন কমিটির রিপোর্টে বিভিন্ন ক্যাডারের বেতন স্কেলের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা দূরীকরণের জন্য সমপর্যায়ের অন্য সকল সার্ভিস ক্যাডারে সকল সমমানের ও সম্পর্কযুক্ত পদসমূহের বেতন স্কেল ও একইভাবে উন্নীত করে ১৯৭৭-৭৮ সালের জাতীয় বেতন স্কেলের মাধ্যমে সৃষ্ট সমতা পুনর্বহাল করা হোক।

৩. বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারকে বিলুপ্ত করে বিসিএস (ভূমি) এবং বিসিএস (ম্যাজিস্ট্রেসি) ক্যাডার সৃষ্টি করা হোক এবং এই ক্যাডারসমূহের মাঠপর্যায়ে কৃত্যভিত্তিক কর্মসম্পাদনের জন্য যে লোকবলের প্রয়োজন সেই অনুযায়ী ক্যাডার সংখ্যা নির্ধারণ করা হোক। এর ফলে বিসিএস (প্রশাসন) নামকরণের ফলে যে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার নিরসন হবে।

৪. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রশাসন পুনর্গঠন করা হোক এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জেলা কাউন্সিল ও উপজেলা কাউন্সিল এর নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণের দ্বারা নেতৃত্ব প্রদান ও সমন্বয়করণ প্রতিষ্ঠিত করা হোক।

৫. স্থানীয় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে চেয়ারম্যানগণের অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটি গঠন করে প্রতিটি উপজেলা ও জেলায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাকে কমিটির সদস্য-সচিব করা হোক।

৬. সচিবালয়ের পদসমূহে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সকল অনিয়মিত ও বৈষম্যমূলক পদোন্নতি ও নিয়োগ বন্ধ করা হোক এবং সচিবালয়ে এই ক্যাডারের সঙ্গে অন্যান্য ক্যাডারসমূহের বিরাজমান বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত এই ক্যাডারের সদস্যদের নিয়োগ ও পদোন্নতি স্থগিত রাখা হোক।

৭. সচিবালয়ের পদসমূহ পূরণ করার জন্য প্রত্যেক ক্যাডারের স্ব স্ব ক্যাডার পদে এবং সচিবালয়ের পদসমূহে পদস্থ সমপর্যায়ের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও মাঠপর্যায়ের পদসমূহের মধ্যে Horizontal ও Vertical movement-এর ভিত্তিতে একটি সম্প্রসারিত সিনিয়র সার্ভিস পুল তৈরি করা হোক। এত মাঠপর্যায়ে ক্যাডার সার্ভিস সদস্যরা যেমন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রপতির/প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে যেতে পারবেন, তেমনি সচিবালয়ের ভিতর থেকেও সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের সদস্যগণ তাঁদের স্ব স্ব ক্যাডারের সমপর্যায়ের পদসমূহে পদস্থ হতে পারবেন। এতে মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে যেমন সচিবালয়ের পদসমূহে সমৃদ্ধ হবে, তেমনি সচিবালয়ের অভিজ্ঞতা মাঠপর্যায়েও প্রসারিত হবে। সেই সঙ্গে বিসিএস (সচিবালয়) এর জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হতে সচিব পদ পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ করা যেতে পারে। যে সকল মন্ত্রণালয়ের অধীনে কোন ক্যাডার সৃষ্টি করা হয় নাই, সে সকল মন্ত্রণালয়ের অধীনে সচিবালয়ের পদসমূহে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/বিভাগ এর সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচিবালয়ে অনুরূপভাবে পদস্থ করা হোক এবং বিসিএস ক্যাডারসমূহে সমঅধিকারের ভিত্তিতে একটি নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় প্রবেশের ব্যবস্থা করা হোক।

৮. সাম্প্রতিককালে ১৯টি অতিরিক্ত সচিবের পদসহ সচিব ও যুগ্মসচিব পদে যে সকল পদোন্নতি দেয়া হয়েছে, তা বাতিল করে যুগ্ম-অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে অন্য সকল সার্ভিস ক্যাডারের সমমানের ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক জ্যেষ্ঠত্ব সম্পন্ন কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও পদোন্নতি দেয়া হোক। ১৯৮১ সালে যে নীতির ভিত্তিতে পুল কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ কার হয়েছিল, সেই নীতির অবলম্বনে অথবা অতীতের ইকনোমিক পুল এর নীতি অনুসরণে এখন একটি সার্বিক জ্যেষ্ঠতা তালিকা তৈরি করে সেই ভিত্তিতে সচিবালয়ের উচ্চ পদসমূহ পূরণ করা হোক।

---

* এ কমিটি ১৪ই এপ্রিল ১৯৯১, প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। সমন্বয় কমিটি ২৩ ক্যাডার চাকুরির সদস্য নিয়ে গঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

৯. প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ নির্বাহীকে নিয়ে গঠিত পরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব ও উপসচিব পদসমূহে অন্য সকল ক্যাডারের সদস্যদেও নিয়োগের ব্যবস্থা করা হোক। এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত দুই দশকে পাকিস্তানে চারজন ফাইনান্স সার্ভিসের কর্মকর্তাকে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের সচিব করা হয়েছে। অতএব, একই পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং একই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশের ফাইনান্স সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ বা অন্য সার্ভিস ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ এই দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করতে পারবেন।

১০. প্রতিটি ক্যাডারে ১৯৭৭ সালের সরকারি ঘোষণা সর্বোচ্চ পদসমূহকে সর্বোচ্চ বেতন স্কেল প্রদান করা হোক এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের বিভাগ বা সংস্থা প্রধান যাতে তার ওপর ন্যস্ত কাজের অন্য সরাসরি মন্ত্রীর নিকট দায়ী থাকতে পারেন এবং নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হোক।

১১. সরকারি কর্মকর্তাদের চাকুরি কাঠামোতে সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য যেমন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রবর্তন করা হয়েছে, তেমনি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও সেক্টর কর্পোরেশনে প্রকৌশলী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিসসমূহের চাকুরি কাঠামোর সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই সকল স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও সেক্টর কর্পোরেশনের অনুরূপ সার্ভিসসমূহের জন্য কৃত্যনিয়োগ নীতিমালা ও অন্যান্য শর্ত সংবলিত ক্যাডার সার্ভিস তৈরি করা হোক।

১২. পুনর্বিন্যস্ত চাকুরি কাঠামোর সঙ্গে সরকার কর্তৃক ঘোষিত মূল নীতিমালা অনুসারে বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ক্যাডার সার্ভিসে চাকুরিরত কর্মকর্তাদের বেতনই পদমর্যাদার একমাত্র মানদণ্ড। সরকারের এই ঘোষিত ও গৃহীত নীতির প্রকৃত ও যথার্থ ব্যত বায়ন করার জন্য প্রত্যেকটি বেতন স্কেলকে গ্রেড হিসেবে ঘোষণা করা হোক এবং সেই অনুযায়ী কর্মকর্তাগণ যেখানেই পদস্থ থাকুক না কেন তার গ্রেড অনুযায়ী পরিচিত হবেন। সেই সঙ্গে এই ভিত্তিতে ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স (মানক্রম) পুনর্বিন্যস্ত করা হোক।

১৩. দেশে ও বিদেশে ক্যাডার বহির্ভূত পদসমূহে ডেপুটেশন প্রদানের সময় সকল ক্যাডারের সদস্যকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। কৃত্রিম ও অবাস্তব সংখ্যা প্রদর্শন করে বিসিএস (প্রশাসন) কিভাবে তাদেও ডেপুটেশন রিজার্ভ সংখ্যাকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে স্ফীত করেছে, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অতএব, অসমীচীন পন্থায় একতরফাভাবে ডেপুটেশনে প্রেরিত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের তথাকথিত ডেপুটেশন রিজার্ভ সদস্যদেরকে অবিলম্বে তাদের নিজস্ব ক্যাডারে ফিরিয়ে আনা হোক এবং এই সকল পদের ন্যায়সংগত অংশীদার অন্যান্য ক্যাডার ও সংস্থার সদস্যকে নিয়োগ কার হোক। বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে প্রেস পদসমূহ বিসিএস (তথ্য-সাধারণ) সদস্যদের দ্বারা পূরণ করা হোক।

১৪. যে সকল ক্যাডারে বিদ্যমান সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী ক্যাডার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় নাই, তা সংশোধন করে প্রকৃত সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী ক্যাডার নির্ধারণ করা হোক।

১৫. বিভিন্ন ক্যাডার/সংস্থা/বিভাগের বিভিন্ন পদে এনাম কমিটি এবং মুরীদ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পদ সংখ্যায় যে সংকোচন, অবলুপ্তি, অবনমিত ঘটানো হয়েছে ও একই স্তরের পদের ক্ষেত্রে পদ মর্যাদার যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা অবিলম্বে বাতিল করা হোক। প্রত্যেক বিভাগ/সংস্থা কিংবা ক্যাডারের প্রকৃত চাহিদা ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকটি বিভাগ/সংস্থার বিভিন্ন স্তরের পদের সংখ্যা নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থাসমূহের পুনর্বিন্যাস করা হোক।

১৬. ১৯৮০-৮১ সালের নিয়োগবিধি উপেক্ষা করে বিসিএস (আনসার) সহ অন্য সকল ক্যাডারে অন্য সার্ভিসের সদস্যদের অনিয়মিত অনুপ্রবেশ বন্ধ করা হোক এবং বর্তমানে পদস্থ এই ধরনের কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার করা হোক।

উৎসঃ এম, শামসুর রহমান, *আধুনিক লোকপ্রশাসন,*
ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩,
পৃঃ ৭২৪-৭২৭।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ ভাগ

নির্বাচিত গ্রন্থ, রাচনা ও সরকারি প্রকাশনা

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত গ্রন্থ, রাচনা ও সরকারি প্রকাশনা

এমাজউদ্দিন আহমেদ, *বাংলাদেশ লোক প্রশাসন*, ঢাকা, (অনন্যা, ২০০২), পৃঃ ৩১৯।

কঙ্কা জামিল খান, "সাধারণী-বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: একটি তুলনামূলক পর্যালচোনা", *লোক প্রশাসন সাময়িকী*, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ১৬-১৮।

শামছুর রহমান, *আধুনিক লোক প্রশাসন* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৯৩) পৃঃ ১২০, ১২৩, ১২৭, ১৩৫।

এম. শামসুর রহমান, *আধুনিক লোকপ্রশাসন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃঃ ৫২০।

Abedin, M. Jainul, "Classification System in Bangladesh", in A. Raksataya and H. Siedentopf (eds.), *Asian Civil Services: Technical Papers*, vol. 1, Kuala Lumpur, APDAC, 1980.

Abedin, Najmul, *Local Administration and Politics in Modernising Societies: Bangladesh and Pakistan* (Dhaka: NIPA, 1973).

Ahmed, A. J. Minhaj Uddin, "Generalist-Specialist Dichotomy in Administration: An Outlook on Prokichi Movement in Bangladesh", *The Bangladesh Rural Development Studies*, vol. VI, no. 1 (1996).

Ahmed, Emajuddin, *Development Administration: Bangladesh*, Dacca, CENTAS, 1981.

Ahmed, Mustaq, *Government and Politics in Pakisatn* (Karachi, 1970).

Ahmad, Mumtaz, *Bureaucracy and Political Development in Pakistan*, (Karachi 1974).

Ahmad, Muneer, *The Civil Servants in Pakistan* (Karachi 1964).

Ahmed, Ali, *Basic Principles and Practices of Administrative Organization in Bangladesh*, (Dhaka: NILG, 1981).

Ahmed, Ali. *Role of Higher Civil Servants in Pakistan*, (Dacca 1968).

Ahmed, Syed Giasuddin. "Public Administration 1947-71", in M. Serajul Islam (ed.), *History of Bangladesh*, vol. 1 (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997).

Ahmed, Syed Giasuddin, "Public Administration in the Three Decades" in A M Choudhury and Fakrul Alam (eds.), *Bangladesh on the Threshold of the Twenty First Century*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2002.

Ahmed, Syed Giasuddin, "Public Service Commission in Pakistan", *Pakistan Administration*, vol. 31, no. 2, 1985.

Ahmed, Syed Giasuddin, *Bangladesh Public Service Commission*, (Dhaka 1990).

Ahmed, Syed Giasuddin, Government of Bangladesh (Cabinet Division), *Report of the Pay and Services Commission*, Part I - *The Services*, vol. 1 (Dhaka 1977).

Ahmed, Syed Giasuddin, *Public Personnel Administration in Bangladesh*, Dhaka: University of Dhaka, 1986.

Ahmed, Syed Giasuddin, *The Image of Public Service in Bangladesh*, Dacca, Centre for Administrative Studies (CENTAS), 1975.

Ali, A M M Shawkat, *Aspects of Public Administration in Bangladesh*, Dhaka: Nikhil Prakashani, 1993.

Anisuzzaman, Mahammed, *The Circale Officer: A Study of His Role* (Dhaka, 1963).

Dhaka University Institutional Repository

Appleby, Paul H., *Public Administration for a Welfare State*, (Bombay: Asia Publishing House, 1965).

Asaduzzaman, M., "Generalist-Specialist Controversy in Bangladesh Civil Service" in Abul Kalam (ed.), *Bangladesh: Internal Dynamics and External Linkages* (Dhaka: University Press Limited, 1996).

Baker, R.J. S., *Administrative Theory and Public Administration*, London: Hutchinson & Co. Ltd., 1972.

Banerjee, A.C. (ed.), *Indian Constitutional Documents*, vol. 1, Calcutta, 1961.

Birkhead, Guthrie S., "Introduction", in Guthrie S. Birkhead (ed.), *Administrative Reform in Pakisatn* (New York, 1966).

Blunt, Sir Ddward, *The ICS* (London: Faber and Faber Ltd., 1931).

Bradshow, J., *Sir Thomas Munro* (Oxford, 1894).

Brabanti, Ralph, "Concluding Observations", in Brahanti and Others (eds.). *Asian Bureaucratic System Emergent from the British Imperial Tradition,* (Durham 1966).

Braibanti, Ralph, "The Higher Bureaucracy of Pakistan", in Ralph Braibanti (ed.), *Asian Bureaucratic Systems Emergent from the British Imperial Tradition* (Durham, 1966).

Braibanti, Ralph, *Research on the Bureaucracy of Pakistan,* (Durham 1966).

Chanda, Anuradha, *Public Administration and Public Opinion in Bengal* (1854-4885), (Calcutta 1986).

Choudhuri, M.A., *The Civil Service in Pakistan* (Dacca: NIPA, 1969).

Civil Service Association (ex-CSPs), *Future Services Structure of Bangladesh* (Dhaka 1972).

Coupland, Reginald, *Britain and India* (London, 1941).

Dalton, Melville, "Conflicts between Staff and Line Managerial Officers" in Joseph A. Litterer, ed., *Organizations: Structure and Behavior*, (New York: John Wiley ans Sons, 1963).

Danvers, Charles, et al., *Memorials of Old Hallebury College,* (London, 1894).

Government Of Bangldesh, *Allocation of Busines Among the Different Ministries and Divison*, (Dhaka: Cabinet Division, revised up to August 2000).

Government Of Bangldesh, Cabinet Division, *Report of the Pay and Services Commission*, Part I - *The Service*, vol. I, 1977.

Government Of Bangldesh, Cabinet Division, *Report of the Pay and Services Commission*, Part I - *The Service*, vol. III, 1977.

Government Of Bangldesh, Cabinet Division, *Report of the Pay and Services Commission*, Part II - *Pay and other Benefits*, vol. I, 1977.

Government Of Bangldesh, Cabinet Division, Resolution No. 30/1/76-Rules, dated 20 February 1976, in *The Bangladesh Gazette, Extraordinary*, 20 February 1976.

Government Of Bangldesh, Establishment Division, *Gradation List of the ex-Civil Service of Pakistan*, Dacca, BGP, 1976.

Government Of Bangldesh, Establishment Division, *Senior Services Pool Order*, 1979, Dacca, BGP, 1979.

Government Of Bangldesh, *Extraordinari Gazette Notification* No. ME/SA-O/21/94 (Sect. 2/29), dated 10 February 1998 (Dhaka: Ministry of Establishment).

Government Of Bangldesh, Implementation Division (Ministry of Finance), *Introduction of New National Grades and Scales of Pay*, Dacca, BGP, 1977.

Dhaka University Institutional Repository

Government Of Bangldesh, *Manual on Upazila Administration,* vol. I (Dhaka: BGP, 1983).

Government Of Bangldesh, Planning Commission, *The First Five Year Plan,* 1973-1978, Dacca, 1973.

Government Of Bangldesh, *Report of the Administrative and Services Reorganization Committee*, Part I: *The Services.*

Government Of Bangldesh, *Report of the Administrative and Services Reorganization Committee*, Part IV: *The Evidence,* Dacca, 1975.

Government Of Bangldesh, *Report of the National Pay Commission* vol. 1, (Main Text), Dacca, BGP, 1973.

Government Of Bangldesh, *Rules of Business 1996* (Dhaka: Cabinet Division, revised up to August 2000).

Government Of Bangldesh, *Secretariat Instructions* (Dhaka: Organization and Management Division, Cabinet Secretariat, 1976).

Government of Bangldesh, *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh* (Dhaka: Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, 1998), Article 55(4).

Government of East Pakistan (Services & General Administration Department), *Census of Civil Employees 1965,* vol. 1, (Dacca 1966).

Government of India Proceedings: Home Department (Ests.). File No. 30/39 of 1939 (Bangladesh National Archives).

Government of Pakistan, *Report of the Pay and Services Commission 1959-1962* (Chairman, A.R. Cornelius) (Karachi 1969).

Government of Pakistan, *Report of the Working Group on the Reorganization of the Public Service Structure in Pakistan,* (Karachi 1969).

Hayes, C.J., *Report on the Public Service Commissions of British Commonwealth Countries* (London 1955).

Hunter, Sir W.W., *A History of British India* (London, 1899) vol.1.

Islam, Nasir, "Pakistan", in V. Subramaniam (ed.) *Public Administration in the Third World* (New York, 1990).

Islam, Nazmul, *Urban Governance in Asia* (Dhak: Centre for Urban Studies, 2000).

Kennedy, Charles H., *Bureaucracy in Pakistan* (Karachi 1987).

Khan, M. M. and Zafarullah, H.M., "Administrative Reform and Bureaucratic Intransigence in Bangladesh", in G.E. Caiden and H. Siedentopf (eds.) *Strategies for Administrative Reform,* Toronto, Lexington Books, 1982.

Khan, Mohammad Mohabbat, *Administrative Reforms in Bangladesh* (Dhaka: UPL, 1998).

Mohammad Mohabbat Khan, *Bureaucratic Self-Preservation,* (Dhaka: University of Dhaka, 1980).

Maniruzzaman, Tulukder, "Administrative Reforms and Politics within the Bureaucracy in Bangladesh", *Journal of Commonwealth and Comparative Politics,* vol. xvii, no. 1, 1979.

Memorandum of the ex-EFCS (Executive, Class I) Association", in *Report of the Rashid Commission,* Part I - *The Service,* vol. III, op.cit.

Memorandum submitted to the Services Reorganization Committee (1969) by the CSP Association (reprinted in *Administrative Science Review*, NIPA, Dacca, vol. 4, no. 1, March 1970).

Dhaka University Institutional Repository

Millett, John D., "Concepts of Organization", in F.M. Marx, ed., *Elements of Public Administration*, (Englewood Cliffs, N.S.: Prentice-Hall, 1959).

Misra, B.B., *The Bureaucracy in India, An Historical Analysis of Development upto 1947* (New Delhi, 1977).

Moir, M., *A General Guide to the India Office Records*, (The British Library, 1988).

Mooney, James D. and Reiley, Alan C., *The Principles of Organization*, (New York: Harper and Borthers, 1939).

Muhith, A.M.A., *The Deputy Commissioner in East Pakistan* (Dhaka: NIPA, 1968).

Obaidullah, A.T.M., "Generalist-Specialist Conflict in Public Service in Bangladesh: An Overview", *Bangladesh Journal of Public Administration*, vol. V, no. 1, Annual Issue, 1996.

O'Malley, L.S.S., *The Indian Cidvil service* (London: John Murray, 1931).

Panjabi, K.L., *The Civil Servant in India* (Bombay: Bharatiya Vidya Bhaban, 1965).

Pfiffner, John M. and Sherwood, Frank P., *Administrative Organization*, (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1960).

Rahman, M.A., ed. *Administrative Reforms in Pakistan* (Lahore 1969).

Report of the Administrative Reorganization Committee - 1961 (Karachi 1961) (reprinted in public edition by Efficiency O & M Wing, Establishment Division, President's Secretariat, 1963).

Report of the Royal (Islington) Commission on Public Services in India, 1913-16, Appendix Vol. IX

Siddiqui, Kamal (ed.), *Local Government in Bangladesh* (Dhaka, 1994).

Sobhan, Rehman and Ahmed, M., *Public Enterprise in an Intermediate Regime: A Study in the Political Economy of Bangladehs* (Dhaka: Bangladesh Institute of Development Studies, 1980).

The Bangladesh Observer, 23 April 1978.

The Bangladesh Observer, 8 February 1978.

The Government of Pakistan (Establishment Division), *Careers in the Pakistan Central Superior Services* (Karachi 1954).

Trevelyan, George, The Competition Wallah. (London. 1864, First published).

UNDP, *Report on Public Administration Sector Study in Bangladesh* (New York 1993).

White, Leonard D., *Introduction to the Study of Public Administration*, (New Delhi: Eurasia Publishing House, 1968).

Woodruff, Philip, *The Men Who Ruled India: The Guardians,* vol. 2 (London 1963).

World Bank, *Bangladesh: Government That Works*, (Dhaka: The World Bank, 1996).

Yusuf, F. H., *Mationalization of Industries in Bangladesh* (Dhaka: National Institue of Local Government, 1985).

Zafarullah, H.M., "Public Corporations in Bangladesh: An Assessment of their Administrative Aspects", *Indian Journal Administation* (1978), vol. 24, no. 4.

Zaman, K. A., "The Civil Service System in Bangladesh" in A. Raksansataya and H. Siedentopf (eds.), *Asian Civil Service*, Kuala Lumpur, Asian and Pacific Development Administration Centre (APDAC), 1980.